গোয়েন্দার চোখ

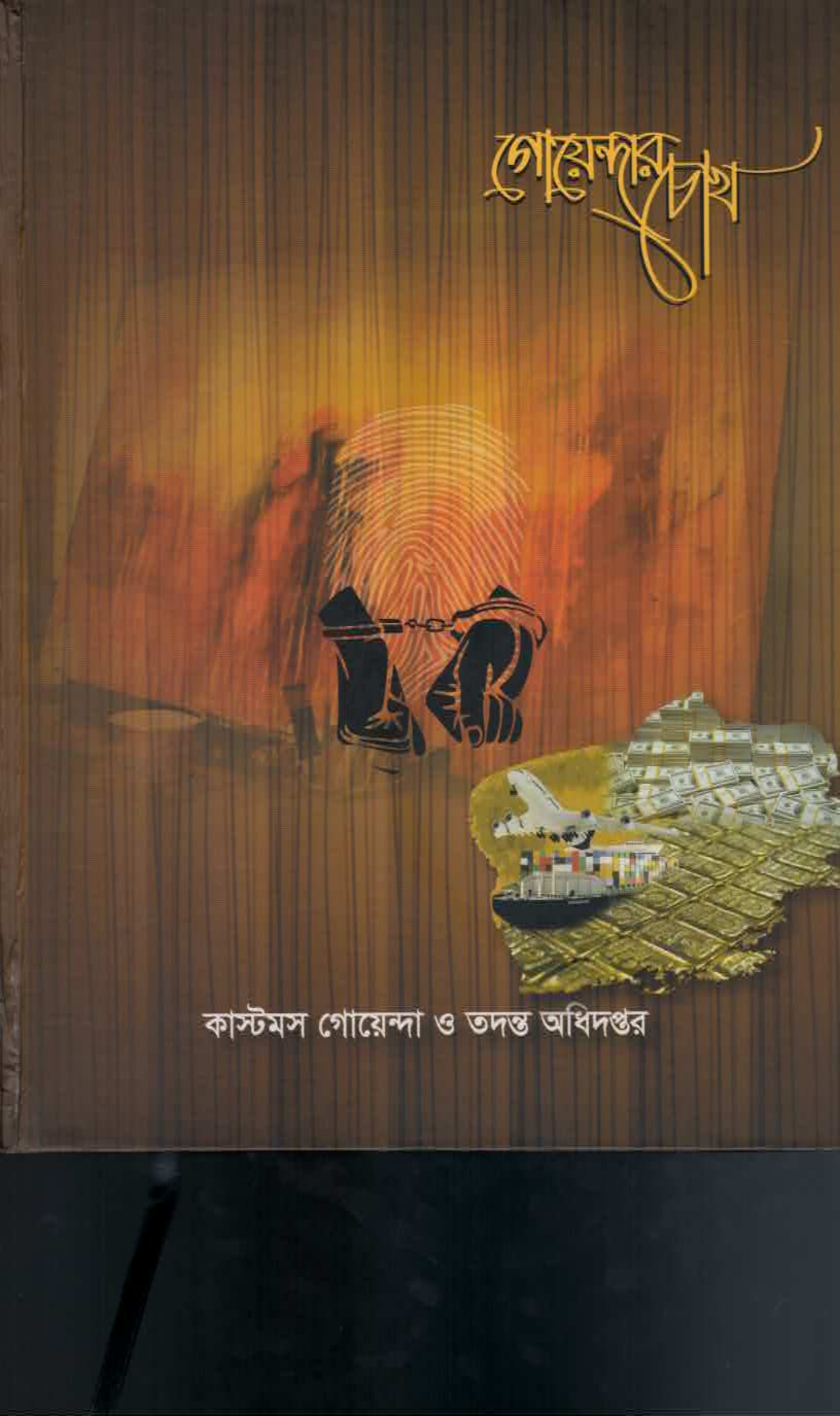

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

গোয়েন্দার চোখ

২০১৪

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

প্রকাশক ঃ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

সম্পাদনা ঃ উম্মে নাহিদা আক্তার (সহকারী পরিচালক)
ও
শেওফতা মাহজাবীন (সহকারী পরিচালক)

প্রচ্ছদ ঃ তারুণ্য, ৩১ (২য় তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৮১৮ ০৩৮২২৬, ০১৫৫৯ ৫৭৯৫৫৫

মুদ্রণ ঃ প্রিন্ট ডট, ৩১ (২য় তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০১৪।

মাননীয় মন্ত্রী
অর্থমন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরকে নান্দনিক ও পরিশীলিত একটি প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য শুভেচ্ছা জানাই।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বেশ সুনামের সাথে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে চলেছে। সুনিপুণ দক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে একটি গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে গোয়েন্দা তথ্য, তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে স্বর্ণ, মুদ্রা ও মাদকদ্রব্যের চোরাচালান আটক, গ্রেফতার ও প্রতিরোধে এ অধিদপ্তর যে ভূমিকা রেখে চলেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

বাংলাদেশ কাস্টমসের অন্যতম শাখা হিসেবে সীমান্ত চোরাচালান প্রতিরোধের পাশাপাশি রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটনেও তাদের তৎপরতা ও ভূমিকা বেশ উল্লেখযোগ্য। এই অধিদপ্তরে কর্তব্যরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে তাদের অনন্য অবদানের জন্য অভিনন্দন জানাই। একই সাথে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে ভবিষ্যতে আরও বহুদূর এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই।

[আবুল মাল আব্দুল মুহিত]

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
অর্থমন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ও তার অর্থায়নের নেপথ্যে মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। এই অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে সুসংহতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর যে নিরলস দায়িত্ব পালন করে চলেছে তার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, অক্লান্ত গোয়েন্দা কার্যক্রমের পাশাপাশি সৃজনশীল কাজেও তারা পিছিয়ে নেই। 'গোয়েন্দার চোখ' প্রকাশনাটি তারই স্বাক্ষর বহন করে।

চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি প্রতিরোধে তাদের গোয়েন্দার চোখ আরও তীক্ষ্ণ ও দৃষ্টি আরও শাণিত হোক, সেটিই কামনা করছি। যেরূপ সাফল্যের সাথে তারা এগিয়ে চলেছে, তার ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও বজায় থাকুক।

শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে।

[এম.এ.মান্নান]

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

নিজেদের ক্রমাগত সাফল্য ও উত্তরণের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে বার্ষিক প্রকাশনা 'গোয়েন্দার চোখ' প্রকাশের জন্য কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত এরকম একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশনার জন্য যেখানে মননশীল লেখার পাশাপাশি এই অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ও সাফল্যের বাস্তবচিত্রের প্রতিফলন ও সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

স্বর্ণ, মুদ্রা, ও মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের বলিষ্ঠ ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এছাড়াও শুল্ক ফাঁকি প্রতিরোধে যে কার্যকরী পদক্ষেপ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান তারা রেখে চলেছে তা সরকারের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে এ অধিদপ্তরকে চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি প্রতিরোধে আরও তৎপরতা ও দক্ষতা প্রদর্শনপূর্বক উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

[মোঃ গোলাম হোসেন]

সদস্য
কাস্টমস গোয়েন্দা ও নিরীক্ষা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়তন যেমন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও নিরাপত্তা হুমকিসমূহ। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছে। সাবলীল এই অগ্রগতি কে অক্ষুণ্ন রাখার গুরুভার বহুলাংশে অর্পিত হয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মত একটি বিশেষায়িত সংস্থার উপর । শুল্ক ফাঁকি, বাণিজ্যিক জালিয়াতি ও চোরাচালানের মত অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিহত করার পাশাপাশি বাণিজ্য-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করাও এ দপ্তরের দায়িত্ব। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের নির্ভীক ও সাহসী কর্মীবাহিনীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। যে মহান দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছে তা প্রতিপালনে এই দপ্তর সর্বদা অটল ও অবিচল থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

[সুলতান মোঃ ইকবাল]

মহাপরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা
ও
তদন্ত অধিদপ্তর

বাণী

প্রতিনিয়ত নিরলস শ্রম ও মেধা দিয়ে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আপোষহীন দায়িত্ব পালন করে চলেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে এই অধিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশের সীমারেখাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত দ্বার হিসাবে উন্মুক্ত করার এক অন্যতম অংশীদার। নির্দিষ্ট কোন আঙ্গিক থেকে নয়, কাস্টমস গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী চোখ উপর থেকে পাখির দৃষ্টির মত সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন বিষয় বা পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে। আর তাই, গোয়েন্দার চোখের দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হতে আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করতে হয় নিঃসন্দেহে। সাধারণত্বের সীমানা ছাড়িয়ে, দৃশ্যমান উপরিতলের অন্তরালে, গভীর থেকে গভীরতর প্রেক্ষাপট হতে নেপথ্য তথ্য বা সত্যের অনুসন্ধানে ব্রত এই অনুসন্ধানী দৃষ্টির যথার্থতা উপস্থাপনে এই প্রকাশনাটির নামকরণ করা হয়েছে 'গোয়েন্দার চোখ'। 'গোয়েন্দার চোখ' যুক্তিসংগতভাবে কাস্টমস গোয়েন্দার কর্ম বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করবে এই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হল এর পথচলা। অধিদপ্তরের প্রথম প্রকাশনা প্রকাশিত হওয়ার শুভলগ্নে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে নির্ভীক ও আন্তরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতীয় অর্থনৈতিক সুরক্ষায় অবদান রাখছেন। একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসাবে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তা যেমন এই প্রকাশনায় উঠে এসেছে, তেমনি এসেছে তার অর্জন ও সাফল্যসমূহ। সার্বিকভাবে যাদের লেখনী ও অবদানে এই প্রকাশনাটি বাস্তবায় হয়ে উঠেছে তাঁদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

পরিবর্তিত সময়ের সাথে নিজেদের অগ্রবর্তী রাখতে ও কাস্টমস সংক্রান্ত অপরাধ দমন ও প্রতিহত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই চলার পথকে সমুন্নত রাখতে আমরা সকলের সর্বাঙ্গীন ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

[মইনুল খান]

সম্পাদকীয়

বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে গেছে। 'গোয়েন্দার চোখ' হয়ে উঠেছে প্রতীক্ষার ফসল। একটু দেরীতে হলেও যে অবয়ব ও আঙ্গিকে এর প্রযোজনা ও উপস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে, তা আত্মতুষ্টির পাশাপাশি পাঠক সন্তুষ্টিও অর্জন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 'গোয়েন্দার চোখ' আসলে গতানুগতিক কাঠামোর আগলভাঙা একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও ব্যতিক্রম ধাঁচের সংকরায়ণ। 'সংকরায়ণ' এই অর্থে যে, সৃজনশীল সাহিত্যের একক উপযোজন না হয়ে এতে রয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মতৎপরতা, সাফল্য ও ব্যর্থতার রেখাচিত্রের সমান্তরাল সংযোজন।

রসবোধহীন দাপ্তরিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনের পরিবর্তে গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমকে উপজীব্য করে যাঁদের লেখায় জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানবিক অনুভূতির মিশেলে সাহিত্য অংশটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে, গোয়েন্দা ধর্মী লেখার বাইরে ভিন্নধর্মী সমৃদ্ধ কিছু লেখা আমাদের এই সাহিত্য অংশের বহুমাত্রায়নের অংশীদার।

'গোয়েন্দার চোখ' এর প্রথম অংশ এই অধিদপ্তরের নিজস্ব মতাদর্শ, কার্যপরিধি, কর্মতৎপরতা ও সাফল্য বিবরণী সমৃদ্ধ। দাপ্তরিক ভাবগাম্ভীর্যের পরিপূর্ণতা বজায় রেখে এখানে উঠে এসেছে আমাদের গত বছরের পথ চলার চিত্র, তুলনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ, দেশের ভেতরে ও বাইরে আমাদের ভাবমূর্তি ও কাস্টমস পরিমণ্ডলে আমাদের সক্রিয়তার স্বরূপ।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সার্বিক পরিচিতি না হলেও সম্পূরক স্মারক হিসেবে আমাদের এই প্রয়াস পাঠক জিজ্ঞাসা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশাবাদী। 'গোয়েন্দার চোখ' এর এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে ভবিষ্যতেও। প্রতি বছরই, সংশ্লিষ্ট বছরের পথ চলাকে অবলম্বন করে হাজির হবে এই প্রকাশনা। আপনাদের ভাললাগা, অনুপ্রেরণা, গঠনমূলক সমালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে আরও নিখুঁত অবয়বে 'গোয়েন্দার চোখ' আবারও আসবে আগামীতে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি।

সবাই ভাল থাকুন। সবার মঙ্গল হোক।

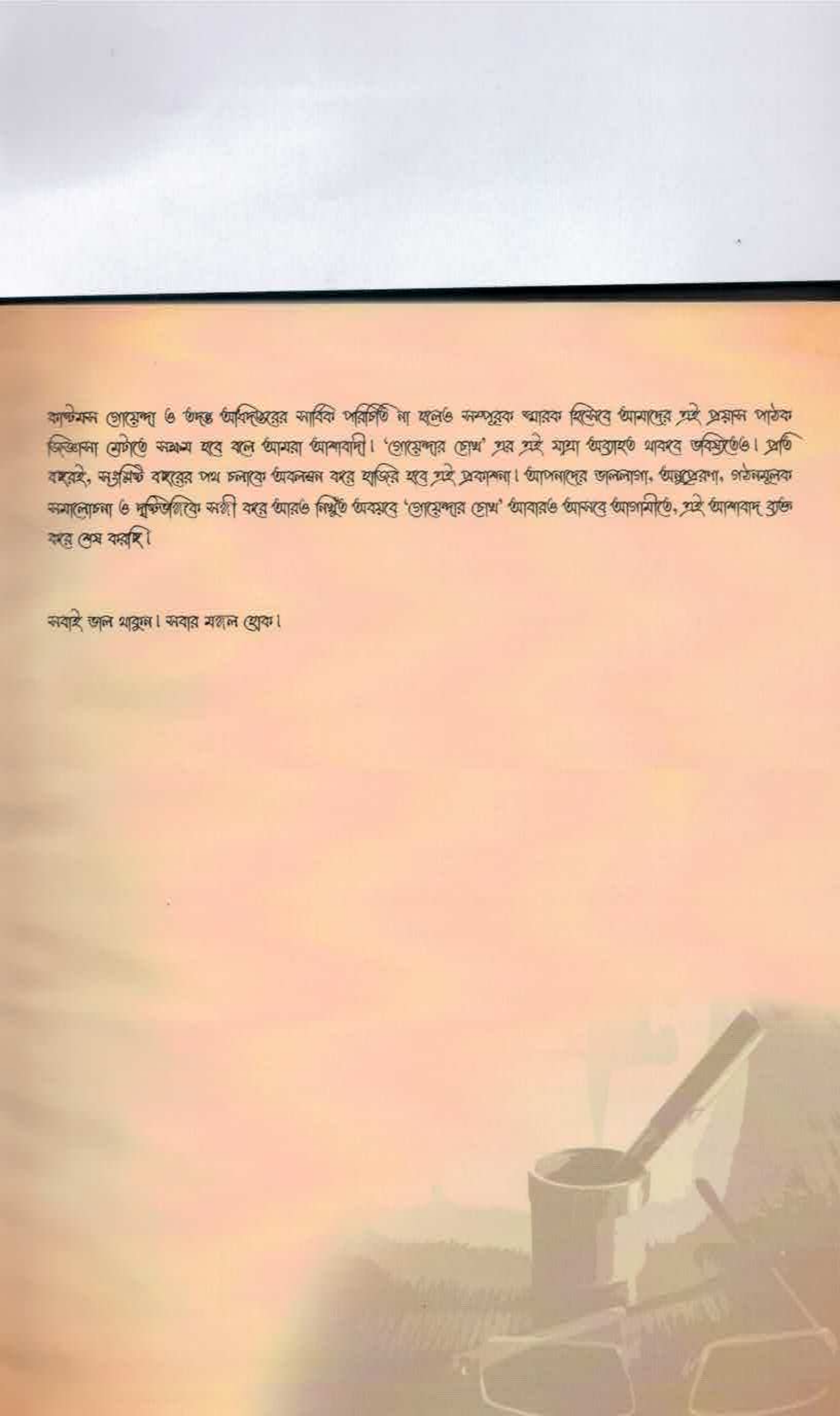

সূচি

গোয়েন্দা কার্যক্রম

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর: মিশন ও ভিশন	১৪-১৭
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রম: একটি সার্বিক তথ্য বিশ্লেষণ	১৮-২৯
Bangladesh's Country Report 2013 for RILO AP - Moinul Khan	৩০-৪১
সরকারি রাজস্ব স্বার্থে সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং সামাজিক প্রতিরক্ষণে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী- মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	৪২-৫১
RILO Reports: Reflecting Bangladesh to the WCO - Shagufta Mahjabin	৫২-৫৫
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৫৬-৫৯
সাম্প্রতিক বিশেষ অভিযান	৬০-৬৫
লেন্স অব মিডিয়া- উম্মে নাহিদা আক্তার	৬৬-৭১

গোয়েন্দা কাহিনী ও প্রবন্ধ

চোরাচালানের কিংবদন্তী "ম্যান হেরু মিয়া" - আবদুল লতিফ সিকদার	৭৪-৮১
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, চোরাচালান এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ - হায়াৎ সাইফ	৮২-৯১
খোলা মন - শেখ হাফিজুল কবির	৯২-৯৫
চোরাচালানের অর্থনীতি - ফয়জুল লতিফ চৌধুরী	৯৬-১০৫
যে গল্প লেখা হল না - মোঃ জামাল হোসেন	১০৬-১১৫
এতো সোনা যায় কোথায়? - মইনুল খান	১১৬-১২৭
Role of Customs in Protecting Intellectual Property Rights - Dr. Mohammad Abu Yusuf	১২৮-১৩৭
ইহা কোকেন! - অরুণ কুমার বিশ্বাস	১৩৮-১৪৯
মিশন ওয়ান জিরো ফাইভ - মুস্তাফিজুর রহমান	১৫০-১৫৩
গোয়েন্দার ডায়েরী থেকে - নাহিদ নওশাদ মুকুল	১৫৪-১৬৩
A Day in Custom House: a Personal Perspective... - Nusrat Jahan Shompa	১৬৪-১৬৭
এয়ারপোর্ট কড়চা - সুশান্ত পাল	১৬৮-১৭৩
গোয়েন্দার চোখ - উম্মে নাহিদা আক্তার	১৭৪-১৭৯
অভিজ্ঞতার ঋণ - ইফতেখার হোসেন	১৮০-১৮৫

সূচি

কল্পলোকের প্রভা

এক পরীর গল্প - আনোয়ার সেলিম	১৮৮-১৯৩
বিষণ্ন বন্দরে বিমর্ষ নাবিক - এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান	১৯৪-১৯৯
দুই পাগলের প্রলাপ - রাশেদুল আলম	২০০-২০৫
ঘোর - বাবুল ইকবাল	২০৬-২১৭
ঝরা শিউলি - তারেক মাহমুদ	২১৮-২২৩

কাব্যকথা

যুগলবন্দী - মারুফুল ইসলাম	২২৬
তুমি আগের মতই আছ - আব্দুল মান্নান শিকদার	২২৭
তোমার ছবি - আব্দুল মান্নান শিকদার	২২৮
ত্রিপত্র - মুনিরুস সালেহীন	২২৯
নদী বাহিত - মুশফিকুর রহমান	২৩০
বোঝাপড়া - রাহমান ওয়াহিদ	২৩১
স্পষ্টতা - মোঃ ইয়ার মেহেদী খাঁন	২৩২

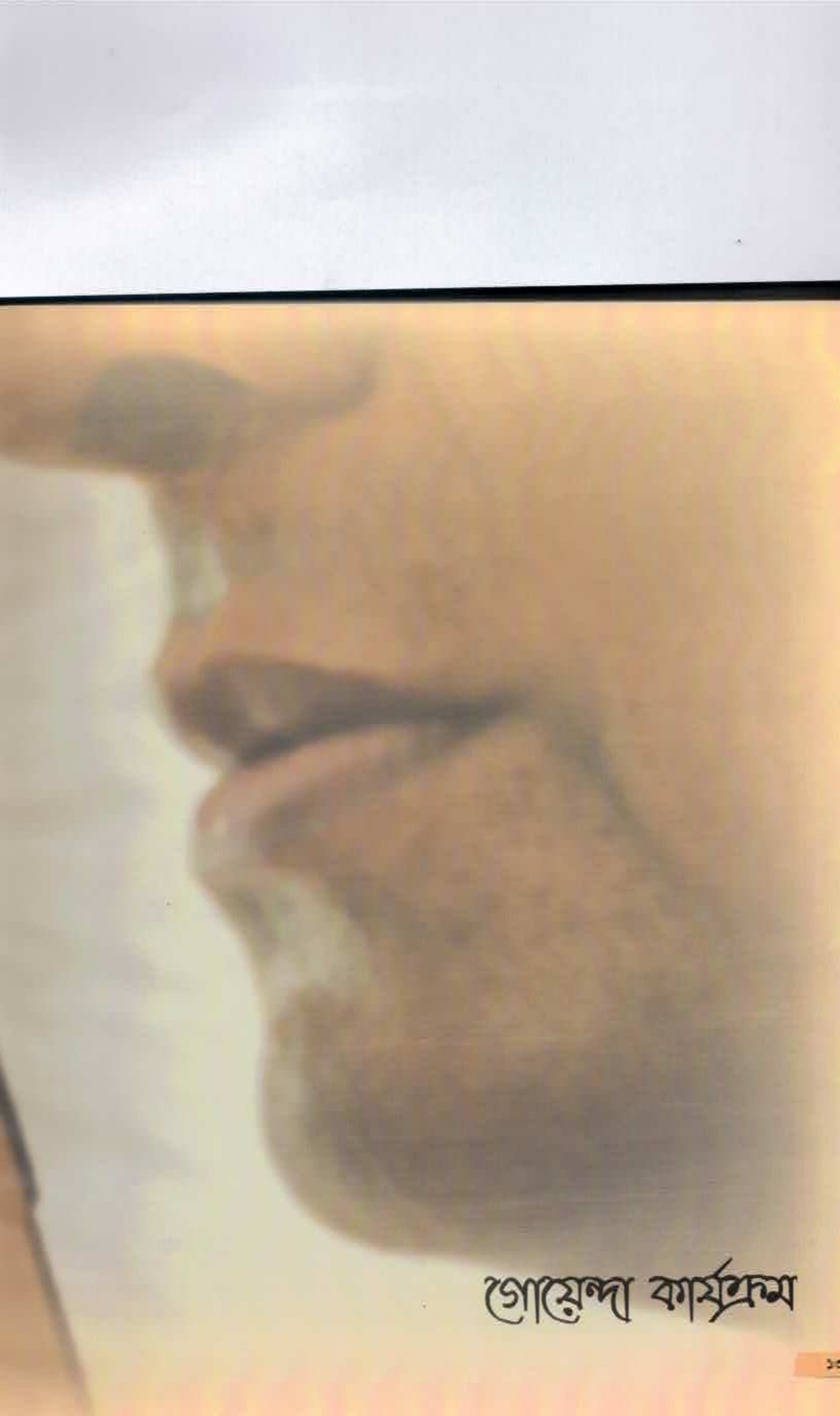
গোয়েন্দা কার্যক্রম

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মিশন ও ভিশন

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে আমরা আমাদের সীমান্ত দ্বার উন্মুক্ত করি, আবার নিরাপত্তার স্বার্থে তা রুদ্ধ করি। কেননা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থে রুদ্ধ ও উন্মুক্ত দ্বারের মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হয়। কারণ পণ্য আমদানি বা রপ্তানিযোগ্য নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনস্বার্থে প্রণীত অভ্যন্তরীণ আইন ও বিধিবিধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিধান সমুন্নত রাখার স্বার্থে বিভিন্ন দেশের কাস্টমস প্রশাসনকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। বাংলাদেশ কাস্টমস প্রশাসনও এর ব্যতিক্রম নয়।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের নামকরণের মাঝেই প্রতিফলিত হচ্ছে এর কার্যক্রমের স্বরূপ। এটি দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি বিশেষায়িত দপ্তর। কাস্টমস সংক্রান্ত যাবতীয় অপরাধ ও অপতৎপরতার মূলোৎপাটন এর মূল লক্ষ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে গোয়েন্দা অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে এর মাঠ তৎপরতা বেশ লক্ষণীয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দপ্তরের মিশন, ভিশন ও কার্যক্রমে বেশ কিছু স্ট্র্যাটেজিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে আরও আধুনিক, যুগোপযোগী ও সুসংহতভাবে মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করছে কাস্টমস গোয়েন্দা।

সময় পাল্টেছে, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অপরাধ প্রবণতা, উদ্ভব হয়েছে অপরাধের নিত্যনতুন কৌশল ও বিস্তৃত হয়েছে অপরাধের জটিলতা। ব্যবসা ও মুনাফার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে কাস্টমস অধিক্ষেত্রে এ সকল অপরাধের ব্যাপকতা ও বিচিত্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই কেবল মাত্র শুল্ক ফাঁকির কলা-কৌশল ও এই সংক্রান্ত ইনফরমেশনের পেছনে অবিরাম শ্রম ও সময় ব্যয় না করে কাস্টমস গোয়েন্দার মনোযোগ ও দৃষ্টি এখন নতুন নতুন ডাইমেনশনের দিকে।

এক্ষেত্রে, ইনফরমেশনের উপর সরাসরি ভিত্তি না করে ইনফরমেশনকে নিয়ে গবেষণা করে, বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সন্নিবেশ করে ইনফরমেশনকে ইনটিলিজেন্সে রূপান্তর করা হয়। ব্যাপারটি অনেকটা ছকের পরে ছক মিলিয়ে ধাঁধার উত্তর বের করার মত। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের স্বার্থে এই ধাঁধা মেলানোর পরিশ্রমটুকু করতেই হয়, কারণ তথ্য (Information) যতক্ষণ গোয়েন্দা তথ্যে (Intelligence) রূপান্তরিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল তথ্যের উপর ভিত্তি করে মাঠে নামলে একজন অপরাধী বা তার অপরাধকে সনাক্ত করার অজুহাতে আরও অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। এতে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ বজায় থাকেনা ও ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

কিন্তু, বাংলাদেশ কাস্টমসের মূল উদ্দেশ্য ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উত্তরোত্তর প্রসার ঘটানো। তাই শুল্ক ফাঁকি ও চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও স্থানীয় বাজারের স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী ব্যবসায়ীগণ, যারা কাস্টমসের প্রচলিত আইন মেনে ব্যবসা করছেন না তাদের নিবৃত্ত করতে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কাস্টমস গোয়েন্দাকে অর্পণ করা হয়েছে বিশেষ দায়িত্ব। এখানেই কাস্টমস গোয়েন্দা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজিয়েছে তার মূল কার্যক্রমকে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে যথাসম্ভব নিশ্চিত করতে ও ব্যবসার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর অত্যন্ত সচেষ্ট। সাধারণ তথ্যকে গোয়েন্দা তথ্যে রূপান্তরকরণ তাই প্রথম শর্ত। তারপর তাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম।

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে কাস্টমস সংক্রান্ত অনিয়ম ও কাস্টমস আইন বহির্ভূত কর্মকান্ডের প্রতি সুতীক্ষ্ণ গোয়েন্দা দৃষ্টি রাখা এবং তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মূল ভিশন।

কেবলমাত্র, শুল্ক ফাঁকি প্রতিরোধই নয়, স্বর্ণ, মুদ্রা, মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সহ যেকোন প্রকারের চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এ সকল যাবতীয় দেশাভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলেও কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখে চলেছে। National Contact Point হিসেবে আর্ন্তজাতিকভাবে গোপন সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণের মাধ্যমরূপে কাজ করছে এই দপ্তর। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন দেশ ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করে বাংলাদেশ কাস্টমসের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে আর্ন্তজাতিক কাস্টমস পরিমন্ডলে উপস্থাপনের গুরুভার বেশ দক্ষতার সাথে বহন করে চলছে।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রমগুলো হচ্ছে

১। চোরাচালান এবং অন্যান্য কাস্টমস অপরাধ ও জালিয়াতি প্রতিরোধ; আইন ভঙ্গের কারণে পণ্য আটক; বাণিজ্যিক জালিয়াতি, বাণিজ্য সংক্রান্ত মানিলন্ডারিং এবং অন্যান্য কাস্টমস আইন লঙ্ঘন এর ক্ষেত্রে তদন্ত পরিচালনা;

২। মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য, জালমুদ্রা, আইপিআর সংক্রান্ত পণ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্য, মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক পণ্য, অস্ত্র, বিস্ফোরক পণ্য পাচার রোধ এবং চোরাচালান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রোফাইলিং; তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করা;

৩। বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভায় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ; অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে বিভিন্ন সভা, কর্মশালা এবং সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা;

৪। সমন্বিত নীতিমালা প্রয়োগ ও যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য বিভিন্ন শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশন বা অন্য কোন শুল্ক এলাকায় সংঘটিত অপরাধ বা বিচ্যুতি সংক্রান্ত গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

এই কার্যক্রমসমূহ নিম্নবর্ণিত আইনের আওতায় সম্পন্ন করা হয়

- ❑ **দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯;**
- ❑ **এলাইড এ্যাক্টসঃ**
  - ❖ আর্মস এ্যাক্ট, ১৮৭৮;
  - ❖ এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স এ্যাক্ট, ১৯০৮;
  - ❖ আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) এ্যাক্ট, ১৯৫০;
  - ❖ ক্রিমিনাল আইন (সংশোধিত) ১৯৫৮;
  - ❖ Agricultural Produce Cess Act, 1940;
  - ❖ Foreign Exchange Regulation Act, 1947;
  - ❖ Wild Life Crime Prevention Act, 2012;
  - ❖ Prevention of Money Laundering Act, 2012;

এই দপ্তরের ভিশনকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে কাস্টমস সংক্রান্ত অনিয়ম ও কাস্টমস আইন বহির্ভূত কর্মকান্ডের প্রতি সুতীক্ষ্ণ গোয়েন্দা দৃষ্টি রাখা এবং তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মূল ভিশন।

আর এই ভিশনকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ দপ্তরের মিশন নিম্নরূপ

- ❑ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায়ে অন্যান্য ফাংশনাল দপ্তরকে সহায়তা প্রদান করা;
- ❑ কাস্টমস অপরাধ ও অন্যান্য অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধ ও অপরাধীদের সনাক্ত এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা;
- ❑ চোরাচালানসহ জনস্বার্থ ও জননৈতিকতা বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ করা;
- ❑ জাতীয় নিরাপত্তা (বিধ্বংসী অস্ত্র, গোলাবারুদ, পারমাণবিক বর্জ্য ইত্যাদি আমদানি প্রতিরোধ) ও সামাজিক নিরাপত্তা (সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি কোনো পণ্য আমদানি প্রতিরোধ) নিশ্চিত করা।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রম: একটি সার্বিক তথ্য বিশ্লেষণ

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। চোরাচালান ও কাস্টমস সংক্রান্ত রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি বিশেষায়িত দপ্তর। কাস্টমস গোয়েন্দার প্রধানতম কার্যক্রম হচ্ছে দুর্ধর্ষ ও সংঘবদ্ধ চোরাচালান অপচেষ্টা প্রতিহত করে এর সাথে জড়িত অপরাধীদের আইনের হাতে সোপর্দ করা এবং অপঘোষণা/মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে সরকারের মূল্যবান রাজস্ব ফাঁকি ও কাস্টমস জালিয়াতি সংক্রান্ত অনিয়ম উদ্‌ঘাটন ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কাস্টমস গোয়েন্দা তার উপর অর্পিত এই দায়িত্ব পালনে চোরাচালানী ও রাজস্ব অপরাধীদের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসিক নিরলস সংগ্রামে লিপ্ত। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে যেমন এই সমস্ত অপরাধের ধরন, পদ্ধতি ও কৌশলে এসেছে অভিনবত্ব এবং সূক্ষ্ম পরিবর্তন তেমনি কাস্টমস গোয়েন্দাও তার কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ও দক্ষতায় যুক্ত করেছে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, বাস্তবধর্মী বিচক্ষণতা ও আধুনিক উৎকর্ষতা। কাস্টমস গোয়েন্দার সদাতৎপর ও সদাজাগ্রত ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে তার অর্জন ও সাফল্যে। স্বর্ণ, মুদ্রা ও মাদক চোরাচালানসহ রাজস্ব ফাঁকি ও জালিয়াতি প্রতিরোধ এই দপ্তরের মূল কার্যক্রম তাই বিগত পাঁচ অর্থবছরের চোরাচালানকৃত পণ্যের আটকচিত্রের পাশাপাশি সরকারের মূল্যবান রাজস্ব আদায়ে এই দপ্তরের অবদানের তুলনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ উঠে এসেছে এই প্রতিবেদনে। বাংলাদেশ কাস্টমস এর অন্তর্ভুক্ত গোয়েন্দা অধিদপ্তর হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশের কাস্টম ভবনগুলোতে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি বিভিন্ন এজেন্সীর সাথে বিশেষ যৌথ অভিযানও পরিচালনা করছে কাস্টমস গোয়েন্দা।

স্বর্ণসারণী

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণচোরাচালানের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৪.৩ কেজি হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আটককৃত স্বর্ণের পরিমাণ ১৩২ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৬৫.৭৫ কেজিতে। এই অর্থ বছরের আটককৃত ৫৬৫.৭৫ কেজি স্বর্ণের অর্থমূল্য দুইশত পঞ্চান্ন কোটি একাশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত চার টাকা (২৫৫,৮১,৩৩,৯০৪/-)। বাংলাদেশ কাস্টমসের ইতিহাসে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ স্বর্ণচোরাচালান আটকের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে এ বছরই। গত ২৬ শে এপ্রিল আটককৃত ১০৫.৪ কেজি স্বর্ণের সাথে আটক করা হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি এয়ারক্রাফট। আটককৃত স্বর্ণ ও এয়ারক্রাফটের অর্থমূল্য বারশত সাতানব্বই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ দশ হাজার এক শত ষাট টাকা মাত্র (১২৯৭,৪৪,১০,১৬০/-) যা বাংলাদেশ কাস্টমসের ইতিহাসে আটককৃত সর্বোচ্চ পণ্যমূল্য।

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক স্বর্ণ আটকের তথ্য

অর্থবছর	স্বর্ণের পরিমাণ (কেজি)	স্বর্ণের মূল্য (টাকা)
২০০৯ - ২০১০	৪.৩০	১,১১,৬১,২৭৬.০০
২০১০ - ২০১১	০.৩৫	১০,৮০,০০০.০০
২০১১ - ২০১২	১.২১	৫০,৫৫,০০০.০০
২০১২ - ২০১৩	৫.৫৬	২,৪৯,১০,০০০.০০
২০১৩ - ২০১৪	৫৬৫.৭৫	২৫৫,৮১,৩৩,৯০৪.০০
সর্বমোট	৫৭৭.১৭	২৬০,০৩,৪০,১৮০.০০

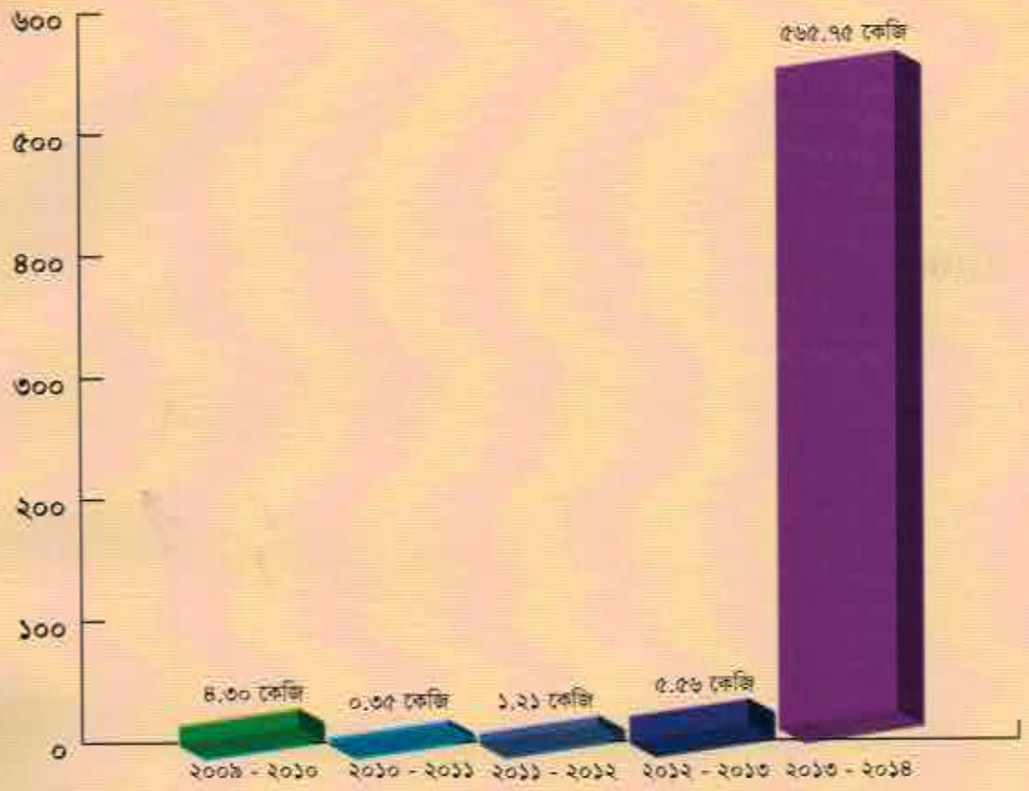

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক স্বর্ণ আটকের পরিমাণ (কেজিতে)

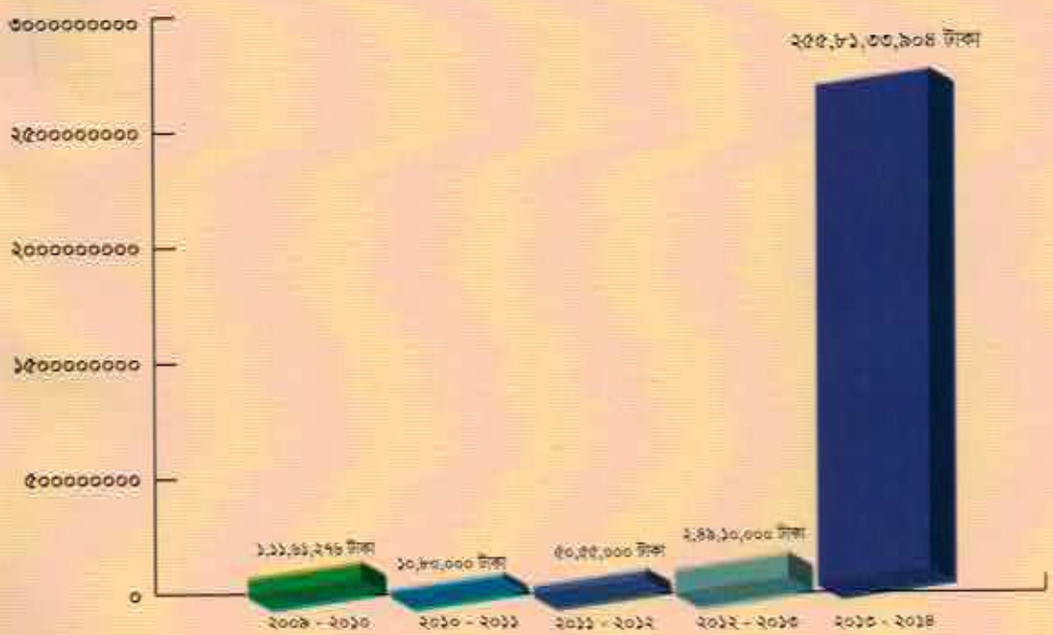

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণের মূল্যমান (টাকায়)

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আটককৃত স্বর্ণ চালান

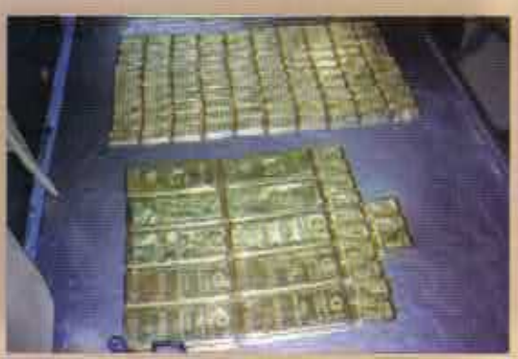

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক স্বর্ণ আটকের তথ্য (মাস ভিত্তিক)

সাল	মাস	স্বর্ণের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (টাকা)
২০১৩	জুলাই	৩৪.৩৫	১৫,৫৬,৫৮,৮৯২.০০
২০১৩	আগস্ট	২৬.২৮	১০,৯৪,৩৪,৬৮১.০০
২০১৩	সেপ্টেম্বর	১৩.৯৩	৬,২৫,০০,০০০.০০
২০১৩	অক্টোবর	৪.৫০	২,৩০,০০,০০০.০০
২০১৩	নভেম্বর	৪০.৭৩	১৭,৮১,৩৭,০০০.০০
২০১৩	ডিসেম্বর	৩১.৭৫	১৪,৬৫,৬৫,৬০০.০০
২০১৪	জানুয়ারি	৬.২৭	৮,২০,৭৬,৪০০.০০
২০১৪	ফেব্রুয়ারি	৮৮.৭৭	৩৮,১৩,৫৭,৮৭০.০০
২০১৪	মার্চ	১১৪.৮৩	৪৯,৪০,০০,০০০.০০
২০১৪	এপ্রিল	১৫৯.০৯	৭১,২৫,২১,৪৬০.০০
২০১৪	মে	২২.১২	৯,৭৮,৮৪,০০০.০০
২০১৪	জুন	২৩.০৯	১১,৫০,০০,০০০.০০
		মোট = ৫৬৫.৭৫	= ২৫৫,৮১,৩৩,৯০৪.০০

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের স্বর্ণ তথ্যসারণী ও স্তম্ভচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গত এপ্রিল মাসে স্বর্ণ আটকের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১৫৯.০৯ কেজি এবং ২য় ও ৩য় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে মার্চ, ২০১৪ ও ফেব্রুয়ারি, ২০১৪। এ অর্থবছরে আটককৃত স্বর্ণের উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিমাসে গড়ে ৪৭.১৫ কেজি স্বর্ণ আটক করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে।

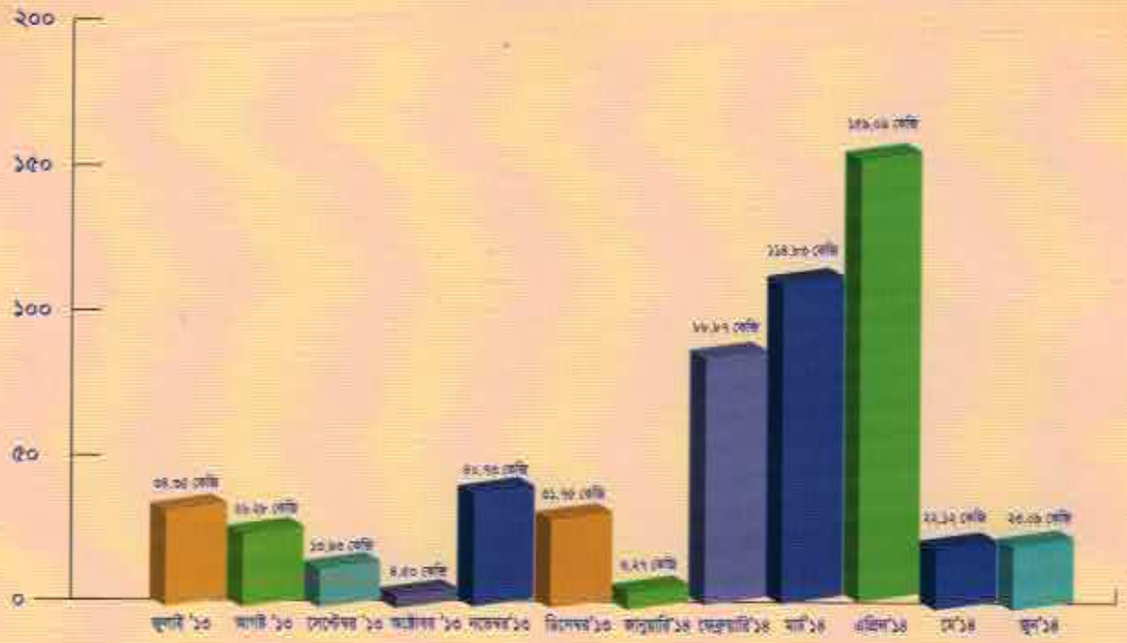

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক স্বর্ণ আটকের পরিমাণ (কেজিতে)

মুদ্রাতথ্য

স্বর্ণচোরাচালান আটকে সফলতার পাশাপাশি মুদ্রা আটকের ক্ষেত্রেও কাস্টমস গোয়েন্দা উল্লেখযোগ্য অবস্থান রেখে চলেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বমোট ২১,৭৮,৫৩,৩১৩ টাকা মূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার চালান আটক করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা।

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মুদ্রা আটকের তথ্য

অর্থবছর	আটককৃত মুদ্রার পরিমাণ (টাকায়)
২০০৯-২০১০	১০,০৪,০৩,৪৫৫.৯৪
২০১০-২০১১	৬৫,১৬,৪,৭২৯.০০
২০১১-২০১২	২,৮০,৩৩,৩৩৮.০০
২০১২-২০১৩	৭১,৬৪,১৮০.০০
২০১৩-২০১৪	২১,৭৮,৫৩,৩১৩.৫০
সর্বমোট	৪১,৮৬,১৯,০১৬.৪০

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত বৈদেশিক মুদ্রার চালান

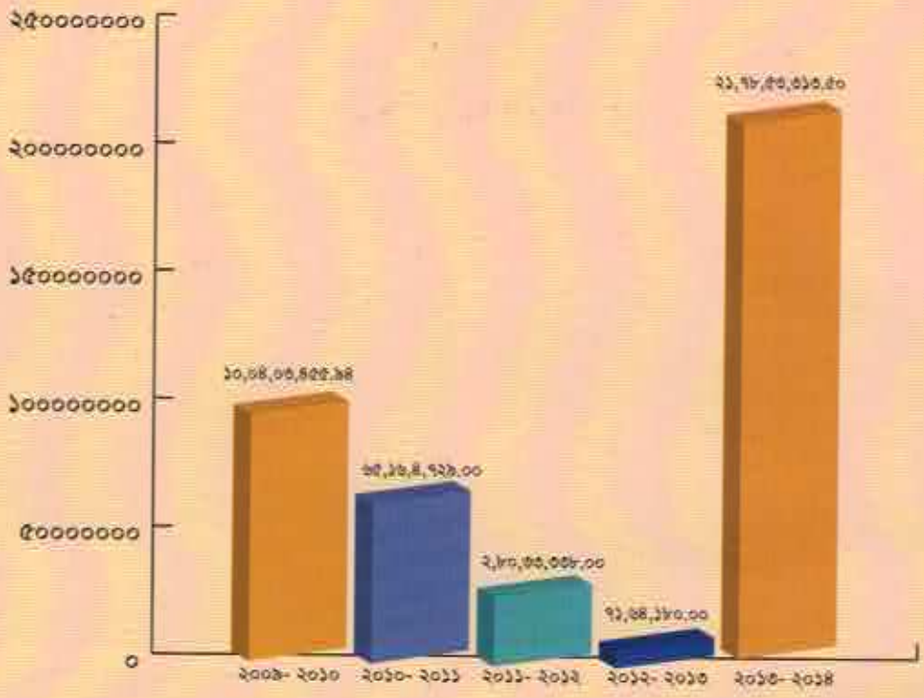

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মুদ্রা আটকের তথ্য

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মুদ্রা আটকের তথ্য (মাস ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	সাল	মাস	পরিমাণ (টাকায়)
১	২০১৩	জুলাই	-
২	২০১৩	আগষ্ট	-
৩	২০১৩	সেপ্টেম্বর	-
৪	২০১৩	অক্টোবর	১০,৬০,০০,০০০.০০
৫	২০১৩	নভেম্বর	১৫,৫৫,৪৮৫.৫০
৬	২০১৩	ডিসেম্বর	১,৯৫,৫৭,০০০.০০
৭	২০১৪	জানুয়ারি	২০,০০,০০০.০০
৮	২০১৪	ফেব্রুয়ারি	-
৯	২০১৪	মার্চ	-
১০	২০১৪	এপ্রিল	৭,৮৮,৬৬,৬৩৫.০০
১১	২০১৪	মে	৯৮,৭৪,১৯৩.০০
১২	২০১৪	জুন	-
		সর্বমোট =	২১,৭৮,৫৩,৩১৩.৫০

আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ, মাদক ও বিদেশী সিগারেট আটকচিত্র

২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত ঔষধ আটকের কোন মামলা না থাকলেও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১,৪০,৬৬,২৮০ টাকা মূল্যের আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ আটক করা হয়। এই আটককৃত চালানগুলোর ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসনের কোন পূর্বানুমতি বা অনুমোদন ছিলনা। এ সময়ে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের একটি তদন্তে উদ্‌ঘাটন হয় যে ০১-০১-২০১২ হতে ১৫-০৯-২০১৩ সময়কালে ৫৯৮ টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে ৯৩,৯৯,১০,২০৪ টাকার ইনফিউশন সেট (স্পর্শকাতর মেডিকেল ইকুইপমেন্ট) আমদানি করা হয় যার কোনটির ক্ষেত্রেই ঔষধ প্রশাসনের ছাড়পত্র নেয়া হয়নি।

জনস্বার্থের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ মাদক, সিগারেট ইত্যাদি চোরাচালান প্রতিহত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে তৎপর রয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বিশ কোটি মূল্যমানের ২০ কেজি হেরোইন ও এক কোটি আশি লক্ষ টাকা মূল্যমানের ৮০ কেজি এফিড্রিন আটকের কৃতিত্ব রয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দার। এ বছর দুই কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা মূল্যের বার হাজার তেতাল্লিশ কার্টন এবং গত বছরে তেষট্টি লক্ষ টাকা মূল্যের তিন হাজার দুইশত সাতানব্বই কার্টন বিদেশী সিগারেট আটক করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ আটকের তথ্য

অর্থ বছর	মূল্য (টাকা)
২০১৩-২০১৪	১,৪০,৬৬,২৮০.০০

২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক ও বিদেশী সিগারেট আটকের তথ্য

সাল	আটককৃত পণ্যের নাম	আটককৃত পণ্যের পরিমাণ	মূল্য
২০১০- ২০১১	হিরোইন	২০ কেজি	২০,০০,০০,০০০.০০
	এফিড্রিন	৮০ কেজি	১,৮০,০০,০০০.০০
২০১১- ২০১২	-	-	-
২০১২- ২০১৩	বিদেশী সিগারেট	৩২৯৭ কার্টন	৬৩,৭৪,০০০.০০
২০১৩- ২০১৪	বিদেশী সিগারেট	১২০৪৩ কার্টন	২,০৬,৩৩,৮০০.০০

বিভিন্ন সময়ে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ ও বিদেশী সিগারেট

বিভিন্ন সময়ে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত বাণিজ্যিক পণ্য

গোয়েন্দা কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ

বিভিন্ন কাস্টম হাউজ ও কাস্টমস স্টেশনে পরিচালিত গোয়েন্দা কার্যক্রমের ফলাফল স্বরূপ প্রতিবছর সরকারের পক্ষে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করছে কাস্টমস গোয়েন্দা। কাস্টমস ফাঁকি প্রতিরোধে ও ফাঁকিকৃত শুল্ক আদায়ে কাস্টমস গোয়েন্দার তীক্ষ্ম নজরদারি ও চৌকস কর্মতৎপরতায় গত চার বছরে অতিরিক্ত কাস্টমস আদায় হয়েছে দুইশত একুশ কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে গত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অতিরিক্ত আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টি কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা।

২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন কাস্টম ভবন/স্টেশনে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার ফলে অতিরিক্ত আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ

সাল	মামলার সংখ্যা	মালামালের মূল্য (টাকায়)	ঘোষিত শুল্ক করাদির পরিমাণ (টাকায়)	অতিরিক্ত আদায়কৃত শুল্ক করাদির পরিমাণ
২০১০-২০১১	৫৭৬	৫৮,৩৭,৮৩,৫৮২.৩১	২৭,৪৭,৪৮,০৭৪.৩২	৪৫,৯৭,১৫,০৮২.৮৪
২০১১-২০১২	৭৬০	১৩৪,৯৯,৫৪,৫১৪.২৭	১০৩,৭৩,৭৪,০৮৯.৫৯	৫৮,১৪,৩৭,৪৪৯.২৪
২০১২-২০১৩	৭০৪	১০৪২,৬৪,৪৫,১২২.৪৬	১১৭,৩৭,১৩,৯৫৯.৩৬০	৫১,৮৪,২০,৩৪২.৫৩
২০১৩-২০১৪	৭৬৫	৫৪০,৩১,৫৬,৬৪৫.৩৮	১৩৮,২৯,১৭,৬১৫.৫৫	৬৫,৩৫,৪২,৫৮১.৩৪
সর্বমোট	২৮০৫	১৭৭৬,৩৩,৩৯,৮৬৪.৪২	৩৮৬,৮৭,৫৩,৭৩৮.৮২	২২১,৩১,১৫,৪৫৫.৯৫

বিভিন্ন কাস্টম ভবন/স্টেশনে গোয়েন্দা কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত আদায়কৃত রাজস্বের সার-সংক্ষেপ
(জুলাই/২০১৩ হতে মে/২০১৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	সাল	মাস	মামলার সংখ্যা	মালামালের মূল্য (টাকায়)	ঘোষিত শুল্ক করাদির পরিমাণ (টাকায়)	অতিরিক্ত আদায়কৃত শুল্ক করাদির পরিমাণ
১	২০১৩	জুলাই	১০৪	৫৯,১৮,৮২,৯৩৯.০০	২২,৪৫,৩৫,২৮৩.১০	৭,৮৮,২৭,৫৯৮.০৩
২	২০১৩	আগস্ট	১৬৬,৯৩,০৪,৮৩৬.৩০	১৩,৮৩,৪১,৮৩৫.২৩	৭,৩৩,৮২,১৩৩.০০
৩	২০১৩	সেপ্টেম্বর	৩৯,২৮,০৪,৪১০.৩৯	১৭,৬৪,৭৬,৯৩৮.৩৩	৬,৫৯,৭০,৩২২.৯৩
৪	২০১৩	অক্টোবর	৬৩	২২,৭৮,৮৩,৬৩৪.১২	১১,২৬,০২,১৫৭.৫০	৫,১৫,৮৯,৮৮১.১৭
৫	২০১৩	নভেম্বর	৬৬	৩০,২০,২৯,০৬৫.২৯	৬,৬৭,৯৯,৯১৯.০২	৫,১২,৫৮,৪৩৭.৫৫
৬	২০১৩	ডিসেম্বর	৬২	৪৬,৯১,০৮,৬৭৫.২৫	৭,৭৬,৮৯,৫৮৯.৩৬	৪,০৬,১৩,৬৮৭.০৩
৭	২০১৪	জানুয়ারি	৬৭	১৭,৭৯,৮১,৭৭৮.৫৫	৭,৫১,২১,৬৯২.০০	৩,১৬,৮১,৫৩৪.৪২
৮	২০১৪	ফেব্রুয়ারি	৪৩	৪০,৬৪,৯০,৯৪৫.৯৭	৪,৯৪,০৯,২৬৬.৩০	২,৪০,৭১,৬১৫.১৫
৯	২০১৪	মার্চ	৭৯	৮১,১১,৬১,৪৮৫.৭১	১৫,৪৩,০৪,৯১৭.৭৫	৩,৪৪,১২,২৬২.৫৫
১০	২০১৪	এপ্রিল	৩৮	২৩,৩৩,৪২,১২৫.৪০	৬,৩০,৩৮,৭৮৫.৬৭	২,৭৯,৮৮,৩৯০.৩৯
১১	২০১৪	মে	৩৮	১২,১১,৬৬,৭৪৯.৪০	২৪,৪৫,৯৭,২৩১.২৯	১৭,৩৭,৪৬,৭১৯.১২
		সর্বমোট	৭৬৫	৫৪০,৩১,৫৬,৬৪৫.৩৮	১৩৮,২৯,১৭,৬১৫.৫৫	৬৫,৩৫,৪২,৫৮১.৩৪

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে স্বর্ণ ও মুদ্রা চোরাচালান আটকের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে ৬২টি এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৭০ জন। এখানে কাস্টমস গোয়েন্দা বিশেষ কৃতিত্ব গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা। কাস্টমস গোয়েন্দা কেবল অপরাধ নয়, অপরাধীকেও চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা

ক্রমনং-	সাল	মাস	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা	থানায় মামলার সংখ্যা	আটক মালামাল ধরন
১	২০১৩	জুলাই	৫	৫	স্বর্ণ চোরাচালান
২	২০১৩	আগষ্ট	১	১	স্বর্ণ চোরাচালান
৩	২০১৩	সেপ্টেম্বর	১	০	স্বর্ণ চোরাচালান
৪	২০১৩	অক্টোবর	২	২	স্বর্ণ চোরাচালান
৫	২০১৩	নভেম্বর	৬	২	স্বর্ণ চোরাচালান
৬	২০১৩	ডিসেম্বর	২	৩	স্বর্ণ ও মুদ্রা চোরাচালন
৭	২০১৪	জানুয়ারি	৪	৪	স্বর্ণ ও মুদ্রা চোরাচালন
৮	২০১৪	ফেব্রুয়ারি	৪	২	স্বর্ণ চোরাচালান
৯	২০১৪	মার্চ	১১	৩	স্বর্ণ চোরাচালান
১০	২০১৪	এপ্রিল	১৬	১০	স্বর্ণ ও মুদ্রা চোরাচালান
১১	২০১৪	মে	১৩	১২	স্বর্ণ ও মুদ্রা চোরাচালান
১২	২০১৪	জুন	৫	২	স্বর্ণ ও মুদ্রা চোরাচালান
			মোট = ৭০	৬২	

দেশ ও অর্থনীতির স্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশের কাস্টমস অধিক্ষেত্রে গোয়েন্দার সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি নিয়ে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে কাস্টমস গোয়েন্দা। কর্মক্ষেত্রে নিত্যনতুন যুগোপযোগী কর্মপন্থার সমাবেশ ঘটিয়ে পেশাদারিত্বের উচ্চতর ধাপে কাস্টমস গোয়েন্দার এই উত্তরণ প্রতিফলিত হয়েছে স্বর্ণ, মুদ্রা, মাদক ও অতিরিক্ত আদায়কৃত রাজস্বের তথ্যসারণীতে। দেশের অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় রাখার প্রত্যয় নিয়ে এই উত্তরণ অব্যাহত থাকবে আগামীতেও।

Bangladesh's Country Report 2013 for RILO AP

-- Moinul Khan

Bangladesh has assumed an important position in the arena of global geo-politico-economy. Strategically, it often draws an attention for its ever increasing upward and new trend of illicit trade and transaction of smuggled goods. In recent times, a high volume of cases of smuggled goods detected by various law enforcement agencies including the Customs Intelligence emphasize the fragile nature of its location and the comfort of those smugglers using it as an important route for such illicit trafficking. This report will try to highlight major trends of illicit drug trafficking and smuggling attempts.

At a Glance

Land Border	West: West Bengal North: West Bengal, Assam, Meghalaya East: Assam, Tripura, Mizoram. Length: 4156 km
Length of Border with India	West Bengal: 2262 km Assam: 264 km Meghalaya: 436 km Tripura: 874 km Mizoram: 320 km
Coastal area	South: The Bay of Bengal East-South: Myanmar (314.40 km)
Smuggling	Yaba: From Myanmar All Other drugs: From India (Phensydil, Cannabis, Heroin, Injection, others Liquid or tablet as narcotics

Bangladesh has a frontier of about 4500 kilometers with India and Myanmar.

1. Drug Trafficking

Bangladesh has a frontier of about 4500 kilometers with India and Myanmar. The Bay of Bengal is lying to the south. The country is situated in south-southeast region of Asia. The geographical location of Bangladesh is suitable to be used as a transit point by the international drug traffickers for onward dispatch mainly to Europe, USA and Far Eastern countries. Bangladesh is not far from the "Golden Triangle" in the east and the "Golden Crescent in the west. From the available sources and intelligence analysis it has been ascertained that the international drug traffickers are using the ports (both sea and air) and its huge frontiers for transportation of drugs to different destinations beyond the borders.

The Route

Bangladesh is a transit country for illegal drugs produced in neighboring countries. According to the Annual Report, 2007, by the International Narcotics Control Board (INCB), Bangladesh has become the main transit point for trafficking of heroin to Europe from Southeast Asia. The report noted that the porous borders between Bangladesh and India facilitate payment to the cross-border trafficking of narcotics. There are mainly three routes used for trafficking of heroin and other drugs into Bangladesh: by courier from Pakistan, by commercial vehicle or train from India, and by sea (Bay of Bengal) or by road from Myanmar. The river, road, rail, and air are simultaneously used in such routes along with different vehicles. According to a study by Bangladesh Narcotics Control Department, the routes used for trafficking of drugs are as follows:

Golden Triangle (Route 1)	> Bangkok-Singapore-Hong Kong>Japan> Pacific route (Air and Sea) > USA Canada-Australia.
Golden Triangle (Route-2)	> Bay of Bengal-Bangladesh-India-Pakistan > Middle East > South and South- Eastern Europe > Western Europe> USA>Canada, (Air, Sea and Land)
Golden Triangle (Route-3)	> Bay of Bengal>India>Sri Lanka > Middle East-Africa > USA>Canada (Air and Sea)
Golden Crescent (Route-1)	> Pakistan>India>Middle East>Mediterranean Region > Europe> USA > Canada. (Air, Sea and Land).
Golden Crescent (Route-2)	> Pakistan>Middle East>Africa>Europe-USA-Canada. India>Bangladesh>Middle East>Indian Ocean>Europe-USA-Canada. South America>USA>Canada>Europe (Air-Sea-Land). Central America>USA>Canada>Europe (Air-Sea-Land).

From the table, it is evident that the ultimate destinations for drugs are the European Countries, Canada, Japan and Australia through different routes. Bangladesh is used as a bridge for these routes.

Route through Bangladesh

The vast forests and terrain areas of hill tracts of Bangladesh are helpful for the traffickers who can hide their activities and operate the trafficking of smuggled goods using different routes. Very often, they use the fishing trawlers (engine operated boats) of Bangladesh, Myanmar and Thai origin for such trafficking. It is reported that heroin produced in North Myanmar, Laos, Thailand and India is generally trafficked to final destinations e.g. USA, Canada, Europe, Japan and Australia, mainly through Kolkata, Madras and Mumbai routes of India and through Thailand and Rangoon. Bangladesh becomes a safe and alternative route when those routes become tightened and risky for their illicit operation.

Along with trafficking for foreign destinations, Bangladesh has also become the market of some drugs. Among them, Phensydyl (codeine based cough syrup), Yaba, Marijuana, Heroin and other items are in the list. The porous borders with India on three sides and with Myanmar to the northeast have made the trafficking easy and available to local retailers and consumers. Recently, it has been noted the number of drug users is increasing with the spread from urban areas to rural areas. Most frequently used drugs are phensidyl, cannabis and heroin.

It is reported that on the other side of the Indian borders, there are many factories/industries of manufacturing codeine based narcotics and their products are being trafficked into Bangladesh. Since the demand has increased for those drugs, the complete check on such trafficking has become a challenge for the law enforcement agencies, particularly those working in the border areas.

Of particularly importance to note is that phensidyl liquid (bottled form) is often trafficked into Bangladesh by bus, truck or other public vehicles concealed in luggage through the border areas. Those drugs are also smuggled into by ships, fishing trawlers and by airways. Since heroin has become costly, the drug users are increasingly switching to other modes of drugs such as phensidyl, cannabis and yaba. However, for drugs such as heroin and cocaine, Bangladesh has been used as a 'transit country' through airports of Dhaka, Chittagong and the seaport of Chittagong as exit-points to connect with another route for the destinations.

As stated, to the international drug smugglers, Bangladesh is a destination and a source and a transit country at the same time. For the smuggling yaba, phensidyl, cannabis, liquor, Bangladesh is a destination country. For heroin and others psychotropic substance or precursor chemicals, Bangladesh is chiefly a transit country. Up untill now, many such consignments of drug have been seized in South America, Canada, Africa, Australia and Japan which were sent from Bangladesh through local or foreign courier services or using the air or sea routes.

Major Drug Seizure Cases by Customs

The Narcotics Control Department is the main body of enforcing laws relating to drug trafficking. Bangladesh Customs has been empowered under the Narcotics Control Act 1990 to seize goods under any violation of the said act. The Customs Act 1969 is also the source of their authority. When seized, both acts are relevant during seizures and arrest by customs officials. The following are some of the important cases by Customs Intelligence in that regard.

24,000 kg Poppy Seeds scized at ICD

Poppy seed, a contraband item in Bangladesh's Import Policy Order, was imported on 2 October 2010 with a false declaration of Rice. The quantity of the goods was about 24,000 kg.

80 kg of Ephedrine Seized by Customs Intelligence

Acting on a secret tip-off, a team of Customs Intelligence seized nearly 80 kg of Ephedrine, a precursor chemical for illicit manufacture of narcotics drugs and psychotropic substances. This is the biggest haul in the history of Bangladesh for such item. The goods were concealed within an export consignment of 479 pairs of Denim trousers that were awaiting to board on a Bangladesh Airlines flight BG086 destined for Kuala Lumpur, Malaysia. The consignment was detained at Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA), Dhaka on 18 August, 2010.

20 kg of heroin Seized by Customs Intelligence

Customs Intelligence officials arrested an Indian citizen with around 20 kilograms of heroin from HSIA, Dhaka on 4 May 2010.

20 kg heroin seized at Hazrat Shahjalal International Airport

Alcohol Seized by Customs Intelligence

23,680 bottles of alcohol were seized by Customs Intelligence on 9 September 2012. The items were concealed in a container brought under the diplomatic immunities.

Major Seizures by All Agencies: 2009-2013

For the prevention of drug trafficking, other agencies are also empowered to enforce narcotics control laws. These agencies are Narcotics Control Department, Bangladesh Police, Border Guard Bangladesh (BGB), Bangladesh Coast Guard and Rapid Action Battalion (RAB). They operate within their jurisdiction areas individually. Sometimes, inter-agency coordination meeting is held to conduct joint operation. The nation-wide anti-smuggling task force is in operation throughout the country to stop the smuggling of goods including drugs.

Statistics on the Seizure of Drugs by all Agencies in Bangladesh

Name of Drugs	2009	2010	2011	2012	2013
Popy Plant	1450210	-	-	-	-
Cocaine (in kg)	-	-	-	-	11.625
Opium (in kg)	-	11.69	8.07	4.84	13.00
Heroin (in kg)	159.783	188.186	107.499	124.92	123.7295
Codeine Preparation (Bottle)	1117354	961260	932874	1291078	987076
Codeine (Loose)(Ltr)	2955.300	4119.185	3228	2613	857.55
Cannabis (in Kg)	32955.581	48749.357	54244	38702	34997.543
Cannabis Plant	791	1760	742	485	666
Injecting Drug (Ampoule)	89469	69158	118890	157995	99481
ATS (Yaba) (Tab)	129644	812716	1360186	1951392	2821528
Total No. of Cases	27441	29662	37245	43717	40250
Total Number of Accused	34315	37508	47309	54100	47531

source-Department of Narcotics Control
coww.dnc.gov.bd

The Government of Bangladesh has taken three pronged steps on reduction of supply, demand and harm of the affected people. The law enforcement agencies are especially alert in both supply and demand reduction. The other agencies are engaged in treating those who are already addicted to drugs.

2. Gold Smuggling

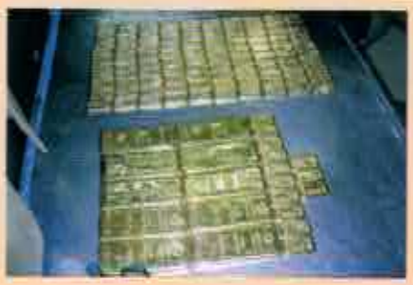

Pictures of Seized Gold Bars

The smuggling of gold has increased alarmingly while the international crime syndicates are using Bangladesh as a major transit route using the international flights in and out of the country. The customs officials seized about 254 kilogram of gold (mostly in bricks, bars and biscuits) at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka (HSIA) and Shah Amanat International Airport in Chittagong during the last eight months, indicating the rising trends of this precious metal.

Major gold seizures by Bangladesh Customs

About 124 kilogram gold bars were seized from a Biman Bangladesh Airlines aircraft BG-702 on 24th July 2013 at HSIA, Dhaka. This was the biggest gold haul concealed in a luggage compartment of the flight. On 30th August 2013 the officials of Customs Intelligence seized 18.076 kilograms from an airbus of United Airways in Dhaka. About 24.5 kilogram and 1.4 kilogram of gold were recovered on 10 and 25 June 2013 respectively at the same airport. Not only that, on 24 June 2013, 2.131 kilograms were seized from a passenger by Customs intelligence at HSIA.

Year	Gold (Grams)
2009	6073.00
2010	4382.60
2011	11040.64
2012	16654.04
2013	431735.06
Total	469885.34

On 4 December 2013 another 12 kilograms of gold were recovered from the cargo terminal of HSIA concealed in electronic goods. Just within last eight months, these gold smuggling cases were detected and seized by Bangladesh Customs only. These seizures of gold are quite high compared to the cases detected by customs and other agencies in the last five years. The table may provide a glimpse of this trend.

3. Currency smuggling

On 9/10/2013, Customs Intelligence seized 51,97,000 Saudi Riyal at HSIA

Along with gold, Bangladesh saw a similar upward trend of currency smuggling in recent times. In some of the operations, Customs Intelligence seized some important consignments of currency that caught of different level attention. On 9 October 2013, Customs Intelligence seized an amount of 51,97,000 Saudi Riyal at HSIA. The value of those currencies was about BDT. 106 million. This is considered as the largest haul in currency cases, breaking all records of last fifteen years. In the last five years, a total of foreign currencies of about Tk. 300 million has been seized.

Customs Intelligence is much more alert than previous days and is probing individual cases to identify the roots and reasons behind this trend. It seems from the preliminary investigation that the money has been smuggled for funding illicit trafficking of goods. Since financing illegal trade is not possible through legal means because of intense monitoring by law enforcement agencies, foreign currencies are being trafficked in or out of the country. There might be other reasons behind currency smuggling. In one occasion, Bangladesh Customs intercepted a Pakistani national with Indian currency. Later, it proved those currencies were fake and were intended to smuggle in the Indian territory through Bangladesh.

We believe there is a link between smuggling of currencies and the crimes arising out of trafficking of illegal trade which has transnational implications. These crimes include not only smuggling of goods including drugs, but also arms and human (both child and woman). This may also be used for terrorist financing in some countries of Asia and beyond. Bangladesh Customs has given priority to this anti-smuggling activity. In this regard, the Government has taken appropriate steps to modernize the law enforcement agencies and strengthen the capacity building mainly through automation and training.

4. Smuggling of Widdlife

Pak national held at airport with 1,000 rare birds

Bangladesh Customs Intelligence and Investigation officials seized around 1,000 birds, mostly protected species, from a Pakistani national at HSIA in the capital on 2 July 2010. The smuggler, Ahmed Shaikh Wahid, 29, was handed over to Police for further investigation for trial. He was trying to smuggle the birds in four cages packed in cartons to Pakistan from Bangladesh. This was a violation of the local laws and the CITES Convention to which Bangladesh is a signatory.

Starred live tortoises seized

Customs Intelligence officials seized 480 rare starred tortoises *(Geochelon elegans)* from a Malaysia-bound Indian Citizen at HSIA, Dhaka, on 23 May 2010. A species native to South India, starred tortoise, is much-coveted in pet trade across the world. They were intended to be used for decorative purposes. The case was unearthed from a consignment concealed in the baggage of Nagoor Meeran, a 42-year-old South Indian national. Again this was a violation of the law of the land and CITES Convention.

5. Commercial frauds

In addition to the smuggling of illicit trade, commercial frauds are the major concern for Bangladesh Customs. These take place mainly with the intention of evading payment of duties and taxes or to avoid regulatory provisions. Most of the fraudulent cases are related to valuation, description, quality, quantity and classifications. In many cases importers or exporters submit false invoices prepared by them showing far less value than what was actually transacted, show less in weight, false documentation and false description of the goods. These happen mostly with chemicals, uncommon and expensive commodities which attract high rate of duties. In such cases, rigorous examination/laboratory tests are mandatory for detection of such frauds. Customs, in absence of modern equipments, labs and mechanism, has had to examine and assess in traditional method. However, with the introduction of automated system, the trend is expected to be reduced significantly with a risk-based examination. In that regard, it is important to note that Bangladesh Customs has already installed multiple container scanners in order to combat such menace including the trafficking of illicit goods.

Overall smuggling situation

Customs Intelligence and Investigation Directorate is engaged in anti-smuggling activities throughout the country. As part of their operation, there are so many significant and meritorious cases of smuggling detected by its officers as stated above.

For better coordination of anti-smuggling activities, Bangladesh customs maintains liaison with other law enforcement agencies particularly in the areas outside the customs stations. Considering the reality, the Government has empowered different agencies like BGB, Police, Navy, Army and Bangladesh Coast Guards to discharge anti-smuggling duties within their own fields and jurisdiction. In this respect some anti-smuggling task forces have been formed at different administrative levels to effect a better outcome through effective cooperation and coordination among different agencies throughout the country. The formation of task force is as follows:

A) National Task Force (NTF) at National Level
(B) Central Task Force (CTF) at National Level
(C) Regional Task Force (RTF) at Divisional Level
(D) District Task Force (DTF) at District Level

National Board of Revenue, which operates under the Ministry of Finance, heads the central task force and mainly by supervising the anti-smuggling functions among the local and regional commissioners and director generals of customs. The Customs Intelligence is acting as the Member Secretary of this task force and coordinates the reports on raids, seizures and arrests.

Conclusion

Thus, we see Bangladesh is being used as a source, transit and target country for illicit trade. Recently, the trend of such smuggled goods has increased significantly as evident in the detection of cases particularly with regard to foreign currencies and gold. Bangladesh Customs has been deeply concerned and has affirmed its commitment to stop this trend. With limited resources, manpower and logistics support, Customs Intelligence is working round the clock for greater interest in order to protect its national interests and security. In near future, with technical assistance and collaboration from the World Customs Organization, and RILO, Bangladesh Customs is expected to face the challenges ahead particularly in areas of combating crimes related to smuggling of illicit goods which not only affect the national interests but also the transnational security. We would like to state our firm commitment to ensure that security and seek active cooperation from other agencies and international community.

Moinul Khan is Director General of Customs Intelligence and Investigation Directorate. This paper was presented at the 25th NCPs Conference of RILO AP held in Da Nang, Vietnam, on 17-19 December 2013.

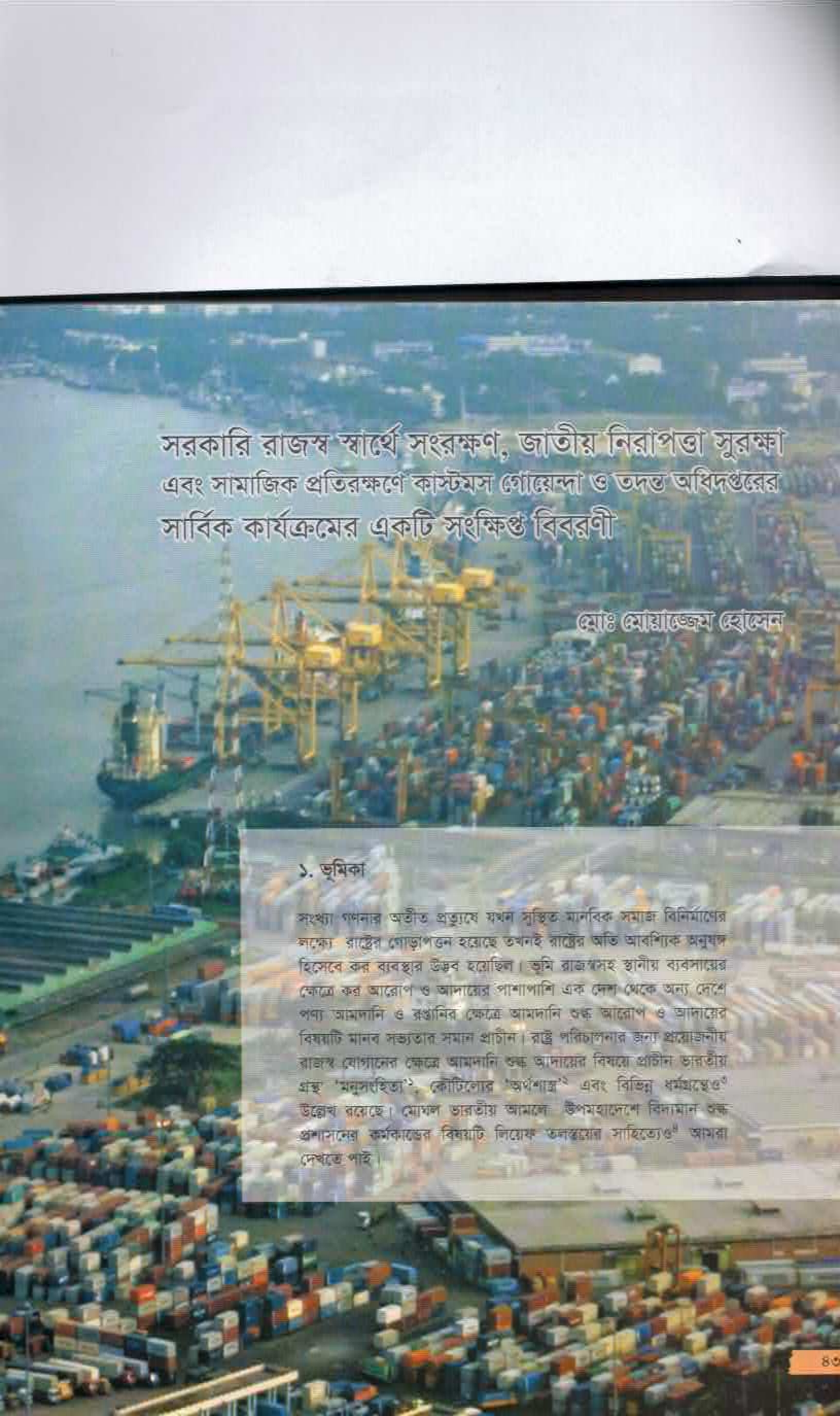

সরকারি রাজস্ব স্বার্থে সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং সামাজিক প্রতিরক্ষণে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

১. ভূমিকা

সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষে যখন সুস্থিত মানবিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে তখনই রাষ্ট্রের অতি আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে কর ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। ভূমি রাজস্বসহ স্থানীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কর আরোপ ও আদায়ের পাশাপাশি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক আরোপ ও আদায়ের বিষয়টি মানব সভ্যতার সমান প্রাচীন। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব যোগানের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক আদায়ের বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'[১], কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'[২] এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও[৩] উল্লেখ রয়েছে। মোঘল ভারতীয় আমলে উপমহাদেশে বিদ্যমান শুল্ক প্রশাসনের কর্মকান্ডের বিষয়টি লিয়োফ তলস্তয়ের সাহিত্যেও[৪] আমরা দেখতে পাই।

মোঘল শাসনামল থেকে ইংরেজ শাসননামল হয়ে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশেও শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভিযাত্রার প্রথম পর্বে আমদানি শুল্কের উপর সরকারের সামগ্রিক রাজস্ব আদায় বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বিশ্ব বানিজ্য ব্যবসায় উদারিকীকরণের ফলে আমদানি শুল্ক হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে জাতীয় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কের অবদান হ্রাস পেলেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমদানি শুল্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমদানি শুল্ক আদায়ের পাশাপাশি Transnational বিভিন্ন অপরাধ যেমন মাদক দ্রব্য, মুদ্রা ও জালমুদ্রা, মূল্যবান ধাতব-বস্তু, ওজোন স্তর ধ্বংসকারী রাসায়নিক বস্তু; ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ধারণকৃত contents, পর্নোগ্রাফি, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং প্রাণ-বৈচিত্র্য রক্ষার্থে বন্যপ্রাণি চোরাচালান প্রতিরোধের, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কাস্টমস প্রশাসনের ওপর অর্পিত হয়েছে। বর্ণিত দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন কাস্টম-ভবন, কাস্টমস স্টেশন ও অন্যান্য কাস্টমস দপ্তর পালন করে আসছে।

তাহলে সঙ্গতভাবে প্রশ্ন এসে যায় এত দপ্তর থাকতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয়তা কি অথবা এর কাজই বা কি? সরকারি প্রতিটি সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব না হলে সরকারেরর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ক্রমাগত পরিবীক্ষণের মধ্যে না থাকলে তার কর্মকান্ডে অস্বচ্ছতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিতে পারে। সরকারি দপ্তর ও কর্মচারীদের কর্মকান্ডে ক্রমাগত পরিবীক্ষণের বিষয়টির গুরুত্ব কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রেও উল্লেখ করেছেন- *"While engaged in work, they shall be daily exmened, for men are naturally fickle minded and like horses at work exihibit constant change in their temper" [chapter-IX, Arthashashra, kautilya]*

বিশ্ব বাণিজ্যে ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির কারণে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় শুল্ক সংক্রান্ত জালিয়াতি সংঘটনের ঝুঁকিও বাড়ছে। কিন্তু কাস্টম ভবনসমূহের পক্ষে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি সীমিত জনবল ও লজিস্টিক দিয়ে ঝুঁকিসমূহ শনাক্ত ও প্রতিরোধ করা অনেকটাই দুরূহ। এক্ষেত্রে একটি বিশেষায়িত সংস্থার প্রয়োজন বোধ হয় রাজস্ব প্রশাসনের জন্মলগ্ন হতে। প্রয়োজনের সাথে বাস্তবায়নের সম্পর্ক তাৎক্ষণিক নয়। রাজস্ব প্রশাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের তুলনায় কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের ইতিহাসের শেকড় অত গভীরে প্রোথিত নয়। নব্বই এর দশকে একটি পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে রূপান্তরের ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য দেয়। তবে স্বল্প সময় এই দপ্তর দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কার্যক্রমের বৈচিত্রময়তা দিয়ে রাজস্ব প্রশাসনের রূপকল্প বাস্তবায়নের কার্যকর ও গতিশীল দপ্তরে পরিণত হয়েছে।

২. কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রমের বিস্তৃতি

কাস্টমস ফাঁকি সংক্রান্ত তথ্য কাস্টম ভবনে প্রেরণের প্রাথমিক এজেন্ডা নিয়ে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের পথ চলা শুরু। কিন্তু সময়ের চাহিদা পূরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পথ নির্দেশনায় এই দপ্তর বৈচিত্রময়তা ও গতিশীলতা দিয়ে রাজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক প্রতিরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উদারিকরণ, বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও জাতীয় পর্যায়ে বাজেটের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কৌশলগত সুবিধাসম্পন্ন, কার্যকর একটি দপ্তর হিসেবে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে এই দপ্তর।

৩. কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রমের চিত্র

৩.১. চোরাচালান প্রতিরোধ

৩.১.১। মাদক চোরাচালান: ভারত ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত। দক্ষিণে সুবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণে এশিয়ার দেশ হিসেবে পূর্ব দিকে মাদক উৎপাদন ও বিপণনে কুখ্যাত "গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল" ও নিকট পশ্চিমে "গোল্ডেন ক্রিসেন্ট" এর মাঝে উভয় সংকটে মারাত্মক মাদক ঝুঁকির দেশ বাংলাদেশ। স্থল-জল-আকাশ পথে কখনো গন্তব্য আর কখনো অতিক্রমণ করে মাদক। আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (আই.এন.সি.বি) -এর ২০০৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উৎপাদিত হেরোইনের ইউরোপে অতিক্রমণের নিরাপদ পথ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি অপ্রচলিত মাদক (মেথামফেটামিন-এমফেটামিন বা ইয়াবা) ও ফেন্সিডিলের চরম শিকার বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম। যেখানে পথের শেষে শুধু অন্ধকার, অনিশ্চয়তা আর ধ্বংস।

কেসস্টাডি-১

গত ২ অক্টোবর ২০১১ তারিখে খাবার চালের মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে পপি বীজের একটি চালান খালাসের অপচেষ্টা হয় আই.সি.ডি কমলাপুর, ঢাকায়। ২৪,০০০ কেজির বৃহৎ এই মাদক চালান আটক করে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

কেসস্টাডি-২

গত ১৮ আগস্ট ২০১০ তারিখে মালয়েশিয়া হতে আগত বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট নং-বিজি ০৮৬ যোগে ৪৭৯ জোড়া ডেনিম ট্রাউজারের একটি চালানে ৮০ কেজি এফিড্রিন আসে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করে আটক করেন বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ এই মাদকের চালান।

কেসস্টাডি-৩

গত ৪ মে ২০১০ তারিখে ২০ কেজি হেরোইনসহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে একজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেন কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

৩.১.২। স্বর্ণ চোরাচালান: স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধ সাম্প্রতিক সময়ের জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যেকোন চোরাচালান রাষ্ট্রের স্বাভাবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করে। প্রধানত ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার হওয়ার অভিযোগ থাকলেও অপরাপর চোরাচালানকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের সহজ মাধ্যম হিসেবে এই সমস্ত স্বর্ণ ব্যবহার হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এক্ষেত্রে অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রমের পাশাপাশি চোরাচালানের স্বর্ণ আটক ও প্রতিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১৩ সালের চোরাচালানের উদ্দেশ্যে বিমান যাত্রী কর্তৃক পরিবাহিত স্বর্ণ ও তদসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপ:

- মোট মামলার সংখ্যা: ২০টি;
- আটককৃত স্বর্ণের মোট ওজন: ৬৮.৫১৩ কেজি;
- আটককৃত স্বর্ণের মূল্য: ২৫,০৭,৭৮,৫৭৩ টাকা;
- আসামীর সংখ্যা: ১৫ জন।

৩.১.৩। মুদ্রা চোরাচালান: স্বর্ণ চোরাচালানের মতো আরেকটি আশঙ্কাজনক বিষয় মুদ্রা, জাল মুদ্রা চোরাচালান। জাল মুদ্রা যেমন দেশের মুদ্রাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে তেমনি চোরাচালানের মাধ্যমে আনীত অন্যান্য মুদ্রা চোরাচালানকে উৎসাহিত করে।

২০১৩ সালের চোরাচালানের উদ্দেশ্যে বিমান যাত্রী কর্তৃক পরিবাহিত মুদ্রা ও তদসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক) মোট মামলার সংখ্যা: ৩টি;
খ) আটককৃত মুদ্রার মূল্য: ১৩,২৬,০৭,২৪৫ টাকা;
গ) আসামির সংখ্যা: ২জন।

৩.১.৪। বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণি চোরাচালান

কেসস্টাডি-৫

গত ২ জুলাই ২০১০ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় সংরক্ষিত ও বিরল প্রজাতির ১০০০ পাখির একটি চালান আটক করে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। আহমেদ শেখ ওয়াহিদ নামক এক পাকিস্তানি নাগরিক চোরাচালানের অপচেষ্টাকালে ধৃত হয়। চোরাকারবারীদের প্রতিরোধে এই মামলাটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

কেসস্টাডি-৬

গত ২৩ মে ২০১০ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় ভারত হতে মালয়েশিয়া অভিমুখী ট্রানজিট যাত্রী ভারতীয় নাগরিক নাগর মেরান বিরল প্রজাতির তারকাখচিত কচ্ছপ ব্যাগেজে লুকিয়ে পাচারের অপচেষ্টা করেন। সময়মতো হস্তক্ষেপ করে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

৩.২. রাজস্ব ফাঁকি রোধ

৩.২.১। আন্ডার ইনভয়েসিং: নন-সি.আর.এফ পণ্যে আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে বিপুল শুল্ক-কর ফাঁকি দেয়া হচ্ছে এরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে সমস্ত কাস্টম ভবন, কাস্টমস স্টেশন সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট সমূহে তদন্ত পরিচালনা করে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে কাস্টমস গোয়েন্দা বিভিন্ন কাস্টমস পয়েন্টে মূল্য, আন্ডার ইনভয়েসিং এর নানা চিত্র প্রত্যক্ষ করে ও তদন্তের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করে বিষয়টির সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩.২.২। পণ্যের বর্ণনায় মিথ্যা ঘোষণা: পণ্যের বর্ণনায় মিথ্যা ঘোষণা রাজস্ব ফাঁকির একটি অতি পুরাতন পদ্ধতি। কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের যথাযথ হস্তক্ষেপে প্রতি বছর শত কোটি টাকার এরূপ ঘটনা উৎঘাটন ও আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে আসছে।

কেসস্টাডি-৭

গত ২২শে অক্টোবর ২০১৩ তারিখে ডাটাসফট কর্তৃক পরিচালিত আই.জি.এম মডিউলে একটি চালান দাখিল করে মার্কো শিপিং কোম্পানী (বিডি) লিঃ। আমদানিকারক জনৈক মুস্তাফিজুর রহমান আই.জি.এম -এ পণ্যের বর্ণনায় ১টি বি.এম.ডব্লিও গাড়ী, ১টি ফোর্ড গাড়িসহ স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদির ঘোষণা দেন। ঘোষণা মোতাবেক শুল্ক-করাদি পরিশোধের মাধ্যমে খালাসের নিমিত্তে কাস্টম হাউসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বি/ই দাখিল করার বিধান থাকলেও, তা করতে আমদানিকারক উদ্যোগ গ্রহন করেননি। বরং গত ২৫/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্তৃক কন্টেইনার ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে ব্যবহৃত সি.টি.এম.এস সিস্টেমে বিতর্কিত কন্টেইনার MSCU 9830366 এর পণ্যের বর্ণনায় রেজিন/এডহেসিভ ঘোষণা করে খালাসের উদ্যোগ নেয়। অভিযোগ রয়েছে উক্ত পণ্যের বর্ণনার সমর্থনে বন্দরের গেটে দাখিলের নিমিত্তে জাল দলিল প্রস্তুত করেছিল আমদানিকারক। বন্দর কর্তৃপক্ষের মোবাইল স্ক্যানারে কন্টেইনারের অভ্যন্তরে গাড়ির ইমেজ সনাক্ত হলে গাড়ির স্থলে রেজিন/এডহেসিভ ঘোষণায় চালান খালাসের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঘটনাটির পর ৩৮ দিন আরো অতিবাহিত হলেও প্রায় ৮ কোটি শুল্ক-কর সংশ্লিষ্ট আই.জি.এম মডিউলের ঘোষণা অনুযায়ী বিল অব এন্ট্রি দাখিল করেনি আমদানিকারক। গত ০৩/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কাস্টমস আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের একটি লিখিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যেকোন সময় এই চালানটি খালাসের অপচেষ্টা হতে পারে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর প্রাপ্ত তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম এ বিষয়ে চালানটি লক করে আইনানুগ কার্যক্রম করছে একটি সূত্র হতে এমন তথ্য পাওয়া যায়। কাস্টম হাউসের এরূপ লক করা চালান অতীতে জাল দলিল বানিয়ে দাখিল করে খালাসের ঘটনা ঘটেছে এবং খালাসের অপচেষ্টাকালে কাস্টমস গোয়েন্দা আটক করেছে (রহিম আফরোজ গ্লোবেট, এ্যাম্পল ফ্যাশন লিঃ এর দুটি চালান)। এমন অপচেষ্টা আবার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের প্রেক্ষিতে গত ০৪/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কাস্টমস আইনের আওতায় কাস্টমস ডিউটি আদায় সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

৩.২.৩। কম ওজন প্রদর্শন: যে সমস্ত পণ্যের ওজন ভিত্তিক শুল্কায়ন হয় সে সমস্ত পণ্যে কম ওজন প্রদর্শন করে শুল্ক ফাঁকি অপচেষ্টাও একটি নিয়মিত ঘটনা। কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ এরূপ অপচেষ্টা নিয়মিত উদঘাটন করে আসছে।

কেসস্টাডি-৮

আমদানিকারক মেসার্স মিলন এন্টারপ্রাইজ, ১১৩, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনী, ঢাকা কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য Painted or Coated Steel Sheet খালাসের জন্য তাঁর মনোনীত সিএন্ডএফ পদ্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন কর্তৃক বি/ই নং- সি ৭৫৪২ তারিখ ২০/০১/২০১৩ দাখিল করে। আমদানিকারক এবং সিএন্ডএফ এজেন্ট এর ঘোষণা মোতাবেক পণ্যের মোট পরিমাণ ছিল ৮৪.১৩০ মেট্রিকটন । অপরদিকে কায়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত পণ্যের পরিমাণ ১০৬.৩২ মেট্রিক টন। আমদানিকারক ও সরবরাহকারী পরস্পর যোগসাজশ করে পণ্যের পরিমাণ কমিয়ে ১০৬.৩২ মেট্রিক টন এর স্থলে ৮৪.১৩০ মেট্রিক টন ঘোষণা প্রদান করে এবং আমদানিকারক সে মোতাবেক পণ্যচালানটি যথাযথ শুল্ক-কর পরিশোধ না করে খালাসের অপচেষ্টা করে। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করে চালানটির কায়িক পরীক্ষা করে ওজন জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন করে তা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করে।

৩.২.৪। মিথ্যা কান্ট্রি অব অরিজিন: কান্ট্রি অব অরিজিন ভেদে পণ্যের গুণগতমান ও মূল্যের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেসব দেশ সুলভ মূল্যে পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করে তাদের নাম উল্লেখ করে অধিক গুণগত মান ও মূল্যের উৎপাদনকারী দেশের পণ্য আমদানির অপচেষ্টা করে। এরূপ একটি তদন্ত করে এই দপ্তর। যেখানে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত গুঁড়া দুধ তৃতীয় একটি দেশ দিয়ে আমদানি হচ্ছে। নতুন কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লেখ করা হলেও অস্ট্রেলিয়া হতে আমদানিকালে উক্ত গুড়া দুধের চাইতে কম মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে মূল্য সংশোধনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করে এই দপ্তর।

৩.২.৫। জাল দলিল দাখিল: জাল দলিল দাখিল করে শুল্ক ফাঁকির অপচেষ্টা যেমন হয় তেমনি স্পর্শকাতর, আমদানি নিষিদ্ধ এবং শর্তযুক্ত পণ্যের প্রবেশের আশঙ্কা থেকে যায়। ঝুঁকি বিশ্লেষণ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ করে এরূপ অনেক অপচেষ্টা নিয়মিত উৎঘাটন করছে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

কেসস্টাডি-৯

গত ২৮/০১/২০১৩ খ্রি: বিকেল ৫:৩০ ঘটিকায় একটি গোপন সূত্র হতে জানা যায়, জাল দলিল দাখিল করে একটি চালান অন-চেসিস ডেলিভারীর পায়তারা চলছে। বিষয়টি সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে একটি বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে হাজির হয়। আটক পরবর্তীতে ইনভেনটোরি হয়। পণ্যচালানটির ঘোষিত পণ্যের সাথে আটক পরবর্তী ইনভেনটোরিতে পণ্যের ব্যাপক গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। রিফাইন্ড জিংক, ব্যাটারির বাক্স ঘোষণা থাকলেও পাওয়া যায় ফটোকপি মেশিন, এল.ই.ডি টিভি।

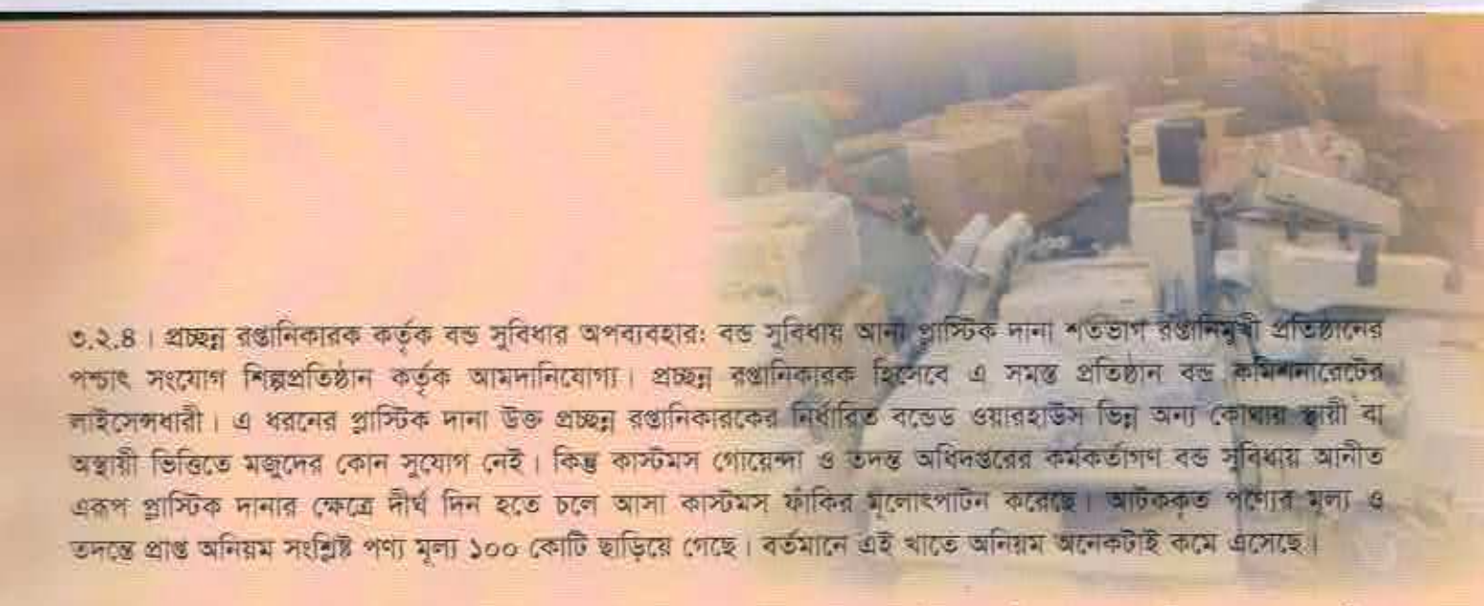

৩.২.৪। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কর্তৃক বন্ড সুবিধার অপব্যবহার: বন্ড সুবিধায় আনা প্লাস্টিক দানা শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিযোগ্য। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ড কমিশনারেটের লাইসেন্সধারী। এ ধরনের প্লাস্টিক দানা উক্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের নির্ধারিত বন্ডেড ওয়ারহাউস ভিন্ন অন্য কোথায় স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে মজুদের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বন্ড সুবিধায় আনীত এরূপ প্লাস্টিক দানার ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন হতে চলে আসা কাস্টমস ফাঁকির মূলোৎপাটন করেছে। আটককৃত পণ্যের মূল্য ও তদন্তে প্রাপ্ত অনিয়ম সংশ্লিষ্ট পণ্য মূল্য ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে এই খাতে অনিয়ম অনেকটাই কমে এসেছে।

৩.২.৫। বন্ড সুবিধায় আনীত ফেব্রিক্স খোলাবাজারে বিক্রয়: দেশের অভ্যন্তরে বিপুল চাহিদার কারনে উন্নত মানের ফেব্রিক্স নিয়ে নানা অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। কাস্টমস ফাঁকি দিয়ে স্বল্প সময়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জনের লোভে জড়িত হয়ে পড়ছে অনেকেই। নানা অনিয়মের মধ্যে সবচাইতে বেশি ঘটনা ঘটছে বন্ড সুবিধার নামে। বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট অর্ডারের ভিত্তিতে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক নির্ধারিত প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কাঁচামাল হিসেবে শুল্ক মুক্ত ভাবে ফেব্রিক্স আমদানি করতে পারে। আমদানিকৃত ফেব্রিক্স ব্যবহার করে বিদেশে রপ্তানি করতে হয়। কোন ব্যতিক্রম হলে প্রযোজ্য শুল্ক-কর জরিমানাসহ আদায়যোগ্য। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী বন্ড সুবিধার নামে খোলাবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে উন্নত এসব ফেব্রিক্স পাচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যেসব বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করা হয় তাদের পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগও পাওয়া যায়। যেসব চালান খালাস হয়ে যায় সে বিষয়ে ভূয়া এক্সপোর্টের মাধ্যমে বৈধ করার চেষ্টা করে কেউ কেউ। আবার কোন কর্তৃপক্ষ সময়মতো হস্তক্ষেপ করলে চালানটি তাদের নয় বলে ঘোষণা করে। রাতারাতি বড়লোক হওয়া অনেকেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন বলে বিভিন্ন সূত্র হতে তথ্য পাওয়া যায়। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রাম বন্দরে এরূপ শত কোটি টাকার চালান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আটক করে। তদন্তে উদঘাটিত হয় শুল্ক ফাঁকির আরো নানা ঘটনা যার আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছে এই দপ্তর।

৩.৩ সামাজিক প্রতিরক্ষণ

রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটনে ও প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রত্যক্ষ ভূমিকা। এর অতিরিক্ত পরোক্ষ নানাবিধ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পাদন করছে এই দপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা, ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ, দ্রুত খালাস, ব্যবসায়িক খরচ কমানো, শুল্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, আইন প্রতিপালনে স্বতস্ফূর্ততা কতিপয় কার্যক্রম যা কাস্টমস ফাঁকি সংশ্লিষ্ট না হলেও দীর্ঘমেয়াদে শুল্ক সচেতন ব্যবসায়ী, কর দাতা তৈরী করে উন্নত দেশ ও জাতি বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যপূরণ এক্ষেত্রে একপক্ষীয় বিষয় না হয়ে সকলের অংশগ্রহনমূলক একটি সামষ্টিক লক্ষ্য হিসেবে একটি প্রাগসর সমাজ গঠনে ধাপে ধাপে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। পরোক্ষ কার্যক্রমের এই ক্ষেত্রসমূহ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের ভূমিকা পূর্বে আলোচিত না হলেও আগামী দিনে সংশ্লিষ্টদের আগ্রহের বিষয়বস্তু বলে প্রতীয়মান হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৪ জাতীয় নিরাপত্তা বিধান

গণ বিধ্বংসী অস্ত্র, গোলা-বারুদ, পারমাণবিক বর্জ্য আমদানি ইত্যাদি জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে। সঠিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় ও সময়মতো হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এরূপ যেকোন অপ-তৎপরতা রোধে সর্বদা সক্রিয় কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ।

৩.৫ কাস্টমস-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

জাতীয় বাজেটে অর্থ যোগানোর ক্রম-বর্ধমান চাপ, আরো ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের জন্য ব্যবসায়ীদের তৎপরতার সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির মাঝে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হয়। কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করছে:

- ⇨ উচ্চ ঝুঁকির চালান সনাক্তকরণ;
- ⇨ রিস্ক প্রোফাইলিং;
- ⇨ ভ্যালু ডাটাবেইজের ব্যবহার;
- ⇨ বাণিজ্যিক তথ্যাদির যাচাই-বাছাই;
- ⇨ বন্ড প্রতিষ্ঠানে গোপন সংবাদ ভিত্তিক তদন্ত;
- ⇨ আন্ত:সংস্থা তথ্য বিনিময়।

এ সমস্ত পদ্ধতির ব্যবহার কাস্টমস গোয়েন্দাদের মনিটরিং কার্যক্রমের পাশাপাশি কাস্টমস ভবন ও কাস্টমস স্টেশনের দ্রুত ও ঝুঁকিমুক্ত কার্যক্রম গ্রহণে সহযোগিতা করছে।

৩.৬ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফল উপস্থিতি:

৩.৬.১। **Customs Enforcement Network (CEN):** কাস্টমস সংক্রান্ত বৈশ্বিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন কর্তৃক কাস্টমস সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, প্রস্তাবনা বাস্তবায়নসহ অটোমেটেড কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সহগামী করতে Enforcement Network -এ নিজেদের সংযুক্ত করতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করে। RILO A/P এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত সংযুক্তকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের কাস্টমস প্রশাসন সর্বদা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের হালনাগাদ করে রাখতে সমর্থ হচ্ছে। আর এতে বাড়ছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও আস্থা।

৩.৬.২। **Regional Intelligence Liaison Office (RILO):** কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর RILO -এর সদস্য হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বহুজাতিক কাস্টমস সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের এই প্লাটফর্মে সরব অংশগ্রহন এর পাশাপাশি কাস্টমস ফাঁকি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধের ক্ষেত্রে নিয়মিত সহযোগিতা গ্রহণ করছে। যা রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

কেসস্টাডি-১০

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং ছাড়াই পণ্য খালাসের সময় দুইটি কন্টেইনার আটক করার অভিযোগ তদন্ত করে এইদপ্তর। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিচালক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ পত্রের আলোকে জানা যায়, ঘটনার সূত্রপাত হয় গত ২৫ এপ্রিল ২০১২ তারিখ যখন চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের জেটির ৪নং গেট দিয়ে বহির্গামী ২টি পণ্য বোঝাই ৪০ ফুট কন্টেনার স্ক্যানিং ছাড়াই ছাড়করণের অপচেষ্টাকালে বন্দরের নিরাপত্তা রক্ষীগণ আটক করে। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বন্দর কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা ও ইনভেনটোরি করে। মূলঘনী যন্ত্রপাতির ঘোষণা থাকলেও উচ্চ শুল্ক হারের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী পাওয়া যায় কন্টেইনার দুটোতে। অভিযুক্ত আমদানিকারক- H.U. Accessories Ltd. এবং আমদানিকারকের মনোনীত প্রতিনিধি সিএন্ডএফ এজেন্ট- JRT C&F Business. উক্ত পণ্যচালানটি চীন হতে আমদানি করে পণ্য খালাসকালে ঘটনাটি ঘটে। দেশে তদন্ত কালে কোন সূত্র না পাওয়া যাওয়ায় রপ্তানিকারকের বিস্তারিত জানতে অনুসন্ধানে নামে কাস্টমস গোয়েন্দা কতৃপক্ষ। RILO A/P এর নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয় এই দপ্তর।

৪. উপসংহার

শুল্ক কর আদায় সব সময় একটি কষ্টসাধ্য কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। শুল্ক সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন অনেক ক্ষেত্রে সহজবোধ্য না হওয়ায় রয়েছে কাস্টমসভীতি। কিন্তু কাস্টমস প্রশাসনকে জাতীয় বাজেটের লক্ষ্য পূরণে সর্বদাই নিরলস কাজ করে যেতে হয়। এ পরিস্থিতিতে শুল্ক তথা কাস্টমস সচেতন জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে প্রয়োজন সবার সহযোগিতা। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শুল্ক দাতা ও শুল্ক সংগ্রহকারীর মধ্যে অনাকাঙ্খিত যেকোন পরিস্থিতি যাতে না তৈরি হয় তা নিশ্চিত করে, একইসাথে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী কাস্টমস সচেতনতাকে সার্বজনীন করে তোলে। এই উভয় কার্যক্রমকে বেগবান করতে জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধিসহ কাস্টমস আইনের কাঠামোতে এই দপ্তরের অধিকতর ক্ষমতায়ন কাস্টমস প্রশাসনকে আগামী দিনের প্রযুক্তি নির্ভর আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সক্ষম করে তুলবে। বিশ্বায়নের এই যুগে কাস্টমস কর আহরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কাস্টমস ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্ত পূরণে মনোযোগী হওয়া ছাড়া অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়া সুকঠিন। সেক্ষেত্রে কাস্টমস সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা ও তদন্ত কার্যক্রম কাস্টমস প্রশাসনকে ভবিষ্যতের শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত গড়তে সাহায্য করে যাবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. *Manu's Code of Law; Chapter 7(127)*
২. *Kautilya; Arthashastra, Chapter VII*
৩. *Old Testament; Mathew, 22: 17-21*
৪. *লিয়েফ তলস্তয়: সুরাটের কফিখানা (ছোট গল্প)*

লেখক
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
অতিরিক্ত পরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর
আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

RILO AP
Regional Intelligence Liaison Office Asia Pacific
Bridge across borders

RILO Reports: Reflecting Bangladesh to the WCO

Shagufta Mahjabin

In the array of a world which is constantly changing, customs administrations are faced with the challenges of newer dynamics in trade and economies with increased demands on providing higher efficiencies, absolute professionalism, legitimate trade facilitations as well as ensuring the security concerns and effective risk management comprising the socio-politic and territorial realities. Competencies here are measured and recognized by the role played in promoting legitimate trade ensuring the broader mandate of unearthing economic offenses and outright smuggling. Customs Intelligence and Investigation Directorate is entrusted with the onerous job of protecting Bangladesh's economic frontiers. Without disrupting legal trade, Customs Intelligence and Investigation Directorate is providing a gridlock eternal vigilance beating the activities of tax evasion, commercial fraudulent, illicit trade and traffic of counterfeit goods, narcotics, precursor chemicals and endangered species.

All over the globe a greater degree of sophistication has been added to the ingenious methods applied by talented economic offenders and criminals. Followed by a continuous change in modus-operandi, they are now well equipped with deep rooted big stick technologies and discerning strategies. Thus information and intelligence exchange has been given abreast priority by the World Customs Organization (WCO) which is the steward organization of international customs standards and the central forum for co-operation and dialogue on worldwide customs matters. As its enforcement strategy, the WCO has developed a global network mechanism through setting up Regional Intelligence Liaison Offices (RILO).

Each RILO are the regional centers for collecting and analyzing data, as well as disseminating information on trends, modi operandi, routes and significant cases of fraud. They employ Customs officers coming from different countries in a region. The RILO network currently covers all six regions of WCO and consists of offices in the 11 countries. RILO act as a regional data collector and analyst, making them the center of information flow which is organized around three essential and complementary components, these are :

- **National Contact Point (NCP)** at the national customs administrative level.
- **Regional Intelligence Liaison Offices (RILO)** at the regional level
- **WCO Secretariat** at the international level

The aim of this mechanism is to enhance the effectiveness of global information and intelligence exchange and to strengthen cooperation between all customs services tasked with combating transnational crime. The RILO mechanism is supported by the Customs Enforcement Network (CEN), a global data and information-gathering, analysis and communication system for intelligence purpose centrally managed by the WCO Secretariat.

Customs Intelligence and Investigation Directorate is associated directly to the WCO through the mechanisms of RILO. The Director General is the NCP of Bangladesh who reports to the RILO- Asia and the Pacific (AP). The NCP sends monthly summary of seizure reports on cases of illicit narcotic substances (i.e., Methamphetamine, Cannabis, Cocaine, Heroin, Phensidyl, Opium), intoxicating drugs, precursor chemicals, smuggled gold, precious metals and tobacco, counterfeit goods and currency notes, IPR violations, smuggled statue and sculptures made of precious stones, illegal wild life trade (CITES) and various commodities detected and seized by the different law enforcement and anti-smuggling agencies of Bangladesh including those of the Customs Intelligence and Investigation Directorate's. The NCP is also responsible for analyzing information collected at the national level to identify new or unusual smuggling methods, consistent patterns, smuggling trends, etc. and to enter the results into the CEN which produces necessary alerts to the RILO.

The RILO-AP publishes data reports and special reports collected from around the world on their issue periodicals, ad hoc analysis, bulletins and annual reports. RILO prepares and circulates alerts, intelligence profiles and regional tactical strategy analysis gathered from the CEN. Intelligence provided by RILO help to define risk indicators including the identification of smuggling trends, routings, means of transportation, and means of concealment etc. It also organizes and support regional intelligence based operations. These joint operations have led to thousands of seizures and dozens of arrests in countries. Customs Intelligence and Investigation Directorate has participated in these joint operations through employing its officials in key spots. It circulates alerts and intelligence provided by RILO to keep itself updated to the identification of global smuggling trends and to formulate the enforcement strategy to tackle these activities.

RILO facilitate mutual assistance and cooperation with other enforcement agencies, promote and maintain regional cooperation between Customs and other law enforcement agencies and organizations. Providing technical and other assistance to NCPs is another major area of concern. As the focal reporting agency, the NCP from Bangladesh has participated as a delegate from Bangladesh at the 25th administrative Meetings for the NCPs of the RILO AP with detail smuggling trend analysis, success stories and area of challenges for Bangladesh in the forum of RILO.

Following are some of the major seizure cases provided to the RILO-AP

1. Tobacco

Huge quantity of Cigarettes seized at Hazrat Shahjalal International Airport

Officials of Customs Intelligence and Investigation Directorate busted a mega stash of 5300 cartons cigarettes of various brands at the Airfreight unit of Hazrat Shahjalal International Airport on 25 February 2014. Having prior alerts about 13 consignments, the officials did the inventory and detected the cigarettes which were brought in violation of the Import Policy Order of Bangladesh. Value of the seizure is almost BDT 10 million.

Cigarette seized from passenger's luggage at Hazrat Shahjalal International Airport

Contraband cigarettes worth BDT 1.10 million recovered at Shahjalal International Airport on 18th September 2013. Officials of Customs Intelligence and Investigation Directorate allegedly challenged two passengers namely Ismail Muhammad and Muhammad Syed Ghulam upon their suspicious movements and took them to interrogation. A total number of 580 cartons of Esse Black and Benson & Hedges brand cigarettes were recovered from their luggage. Those cigerrtes were brought in violation of the Import Policy Order of Bangladesh.

2. Currency

20 million Indian Rupees seized at Shah Amanat International Airport, Chittagong.

In an operation, Customs Intelligence and Investigation Directorate seized huge amount of Indian currency notes with a face value of Rs. 20 million from a passengers luggage who hailed from Oman at the Hazrat Shahjalal International Airport on 16 December 2013. Officials intercepted the passenger as he passed through the green channel. The accused, identified as Astafizur Rahman was handed to the police. The Directorate assumed the notes to be counterfeit and had send samples for further verification.

10 million Indian currency notes seized at Hazrat Shahjalal International Airport

Officials of Customs Intelligence and Investigation Directorate seized huge quantity of Indian currency notes with a face value of Rs. 10 million The officials intercepted a passenger called Md. Nannu Sarder on his suspicious movements and found the rupees concealed in his luggage although he managed to escape the security. Nannu arrived at Hazrat Shahjalal International Airport from Karachi through Dubai on 22 January 2014 by flight no. EK582. The currency notes assumed to be fake were sent for further examination.

3. Gold

48 Kg Gold Seized at Shah Amanat International Airport, Chittagong

Officials of Customs Intelligence and Investigation Directorate foiled an attempt to smuggle 48kg gold at the Shah Amanat International Airport from Dubai F2-589 flight. Acting on a secret tip-off, officials of the Directorate and Customs House, Chittagong rummaged the aircraft and found 420 pieces of gold bar worth BDT 210 million under a passenger seat. The seizure assumes significance as it comes in the wake of a series of such seizures made from international flights.

Gold concealed within projection machines seized at Airfreight unit of Hazrat Shahjalal International Airport

Who could have ever imagined that those innocent looking projector machines had precious gold bars and ornaments concealed inside their battery chambers? The modus operandi surprised the officials of Customs Intelligence and Investigation Directorate. 11.99 kg gold worth BDT 60 million was meritoriously recovered from projectors imported under the airway bill no. 061877703323 by flight no SQ 446 at the airfreight unit of Hazrat Shahzalal International Airport on 4 December 2013.

These are some of the few reports among the major seizures sent to the RILO AP. As for the last one decade Customs Intelligence and Investigation Directorate is regularly reporting monthly seizure cases to the RILO AP. On many occasions, some of these report cases became the top reports among the members worldwide. This has two opposite impression, one that reflects the perennial battle and chase of an agile organization against commercial frauds and smuggling which should result in reduced number of seizure reporting. As a motivated and restless intelligence organization there will always be challenges for Customs and Intelligence and Investigation Directorate. Association with the WCO Regional Intelligence Liaison Office for Asia and The Pacific (RILO AP) may endeavor to keep this tenacity high and be responsive and forever alert to the emerging trends of economic fraudulent thus breaking the concomitant links of drug trafficking, terrorism and other trans-border crimes.

Shagufta Mahjabin
Assistant Director
Customs Intelligence and Investigation Directorate

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১১ই মে ২০১৪ তারিখে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগে প্রায় সাড়ে ছয়শ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নবনিয়োগ প্রাপ্ত হন। এদের মাঝে ৩৯ জন কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে যোগদান করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য জনাব সুলতান মোহাম্মদ ইকবাল ১৫ই মে নবনিয়োগ প্রাপ্ত এসকল কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত কাস্টমস ও ভ্যাট বিষয়ের উপর নির্ধারিত মডিউল সহ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের বাস্তবতার আলোকে বেসিক ইন্টেলিজেন্স, গোয়েন্দা কৌশল ও কার্যক্রম, এ্যান্টি মানিলন্ডারিং, সীমান্ত চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি, লিডারশীপ, অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের কমিশনারবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), গোয়েন্দা অপরাধ তথ্য বিভাগ (ডিবি), জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ডি.জি.এফ.আই, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে প্রশিক্ষকবৃন্দ এসকল কর্মকর্তাদের ক্লাশ নিয়েছেন। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ চলাকালে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য নতুন নিয়োগ পাওয়া এসকল কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের রাত্রিকালীন টহল দলে ও বিমানবন্দরে বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন।

নবনিযুক্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাবৃন্দ

মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য
জনাব সুলতান মোহাম্মদ ইকবাল

প্রশিক্ষণের খেরোখাতা

প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিভিন্ন
সেশনের মুহুর্ত নিয়ে সাজানো
হয়েছে এই এ্যালবামটি

গত
প্রাপ্ত
জনা
করে
তদন্ত
চোর
অফি
কমি
বাংল
নিয়ন্ত্র
নিয়ে
কর্মব
অংশ

সাম্প্রতিক বিশেষ অভিযান

বিমানের টয়লেট হতে ১০৫ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার ও আটক এক

কাস্টমস গোয়েন্দার এক বিশেষ অভিযানে দুবাই হতে আসা বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজের ৭টি টয়লেট হতে ১০৫ কেজি স্বর্ণ উদ্ধারসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়। গত ২৬-শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস গোয়েন্দার বিশেষ অভিযান দল বাংলাদেশ বিমানের এয়ারক্রাফট মেকানিক এসিসটেন্ট আনিসউদ্দীন ভূইয়া (৪০) কে আটক করে তার মোবাইল ফোন জব্দ করে। কাস্টমস গোয়েন্দার উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা সর্তক হয়ে যায়। আনিসের মোবাইলে রক্ষিত মেসেজ অনুসন্ধান করে Customs Intelligence Red Alert this Flight – এই বার্তাটি পাওয়া যায়। এতে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন যে এয়ারক্রাফটে স্বর্ণ লুকায়িত আছে। এরপর পুরো উড়োজাহাজটি প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা তল্লাশি করা হয় এবং ৭টি টয়লেটের কমোডের পেছনের ও পাশের চেম্বার হতে ১৪টি প্যাকেটে সেলাইকৃত অবস্থায় ৯০৪ টুকরা স্বর্ণবার উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের মূল্য সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা। স্বর্ণ চোরাচালানে ব্যবহৃত হওয়ার কারনে The Customs Act, 1969- এর সেকশন ২(এস), ২(এল), ২(জি) ও ১৫৭ অনুযায়ী 'অরুণ আলো' নামে বাংলাদেশ বিমানের এয়ারক্রাফটটিও আটক করা হয় যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম। ফলে আটককৃত পণ্যের মোট মূল্য দাড়ায় প্রায় ১৩শ কোটি টাকা। স্বর্ণ উদ্ধারের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম হোসেন বিমানবন্দরে প্রেস ব্রিফিং করেন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

সাড়ে ছয় কোটি জাল ভারতীয় রুপি ও আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ আটক

গত ২৯শে এপ্রিল ২০১৪ রবিবার হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরের কার্গো কমপ্লেক্সে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ জাল ভারতীয় রুপি ও আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ আটক করে কাস্টমস গোয়েন্দা। পাকিস্তান থেকে কাতার হয়ে জাল টাকার একটি চালান আসতে পারে এমন সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কার্গো হাউসে কাস্টমস গোয়েন্দার নজরদারি বাড়ানো হয়। এর আলোকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্যের ঘোষণায় কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে জনৈক কামাল আহমেদ এর নামে আনা ১৯০ কেজি ওজনের ৫টি কার্টন খুলে অবৈধ ঔষধ বাক্সের আচ্ছাদনে লুকানো রুপিগুলো উদ্ধার করা হয়। একই নম্বরের একাধিক নোট পাওয়ায় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে নোটগুলো জাল। এটি এযাবৎকালের জাল ভারতীয় মুদ্রার সর্ববৃহৎ আটক চালান।

তিন যাত্রীর নিকট হতে ২০ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গত ২১শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ২০ কেজি স্বর্ণসহ চার জনকে আটক করে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন শাহনাজ হোসেন (৪৪), তার মেয়ে আনজিলা হোসেন (২৬), আনজিলার স্বামী আগা নাভিল ইবনে আকরাম (২৭) এবং সিভিল এভিয়েশনের তথ্য সহকারী কর্মী মোবারক হোসেন মোল্লা। গ্রেপ্তারকৃত শাহনাজ, আনজিলা ও নাভিল ২১ শে এপ্রিল রাত ১০.০০ টার SQ-444 ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় অবতরণ করেন। তাদের প্রোটোকল সুবিধা দিচ্ছিলেন মোবারক হোসেন। গ্রীন চ্যানেল পার হবার সময় কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিদের থামিয়ে স্বর্ণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান যে তাদের নিকট কোন স্বর্ণ নেই এবং তারা ব্যাগেজ ঘোষণা ফর্মেও তা উল্লেখ করেন। গোপন তথ্য থাকায় কর্মকর্তাগণ তাদের তল্লাশি করেন এবং তিনজনের পরিহিত পোষাকের ভেতর লুকানো অবস্থায় প্রতিটি এক কেজি ওজনের মোট ২০টি স্বর্ণবার উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের মূল্য প্রায় নয় কোটি টাকা। জিজ্ঞাসাবাদকালে গ্রেপ্তারকৃত যাত্রী শাহনাজ জানান যে, এই স্বর্ণবারগুলো বিমানবন্দর হতে বের করার ব্যাপারে এক ব্যক্তি সহায়তা প্রদান করবেন বলে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। আটককৃত স্বর্ণবার কাস্টমস হাউস, ঢাকার মূল্যবান শুল্ক গুদামে জমা প্রদান করা হয় এবং ধৃত চার ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে প্রদান করে বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

আটককৃত ২০ কেজি স্বর্ণবার

উদ্ধারকৃত ৬ কেজি স্বর্ণ

রোগীর নিকট থেকে ছয় কেজি স্বর্ণ উদ্ধার

৪ই মে ২০১৪ তারিখে মালয়েশিয়া হতে আগত এক যাত্রীর পরিহিত বেল্টের ভেতর থেকে দুই কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের ৬ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করেন কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। ঐ দিন বেলা সোয়া ১২ টার সময় এম এইচ -১০২ ফ্লাইটে ষাটোর্ধ্ব যাত্রী আবদুর রাজ্জাক হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। কিডনি সংক্রান্ত জটিলতায় আক্রান্ত রাজ্জাক হুইল চেয়ারে করে ইমিগ্রেশন ও গ্রীন চ্যানেল পার হয়ে ২নং এক্সিট গেট দিয়ে দ্রুতবেগে বিমানবন্দর ত্যাগ করছিলেন। এসময় কাস্টমস গোয়েন্দারা রাজ্জাকের নিকট স্বর্ণ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি না-সূচক জবাব দেন। গোপন তথ্য থাকায় তার দেহ তল্লাশি করা হয় এবং কোমরে জড়ানো কালো রং-এর বেল্ট হতে প্রতিটি ১ কেজি ওজনের ৬টি স্বর্ণবার উদ্ধার করা হয়। বারগুলো বিশেষভাবে টেপ দিয়ে বেল্টের সাথে আটকানো ছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাজ্জাক স্বীকার করেন যে, এভাবে বিভিন্ন সময় তিনি বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই স্বর্ণ এনেছেন। অবৈধভাবে স্বর্ণ চোরাচালানের দায়ে কাস্টমস গোয়েন্দা তাকে গ্রেফতার করে এবং বিমানবন্দর থানার একটি মামলা করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, প্রতিটি স্বর্ণবারে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই স্বর্ণ বহন করছিলেন।

The Daily Star

TUESDAY APRIL 2, 2014

Gold smuggling marks sharp rise

Smuggled gold meant mainly for Indian market

SAJJADUR RAHMAN

Gold smuggling via Bangladesh has ... officials say has resulted mainly from ...

Smuggling syndicates are using Bangladesh as a transit point to ... the yellow metal to India, which has hiked import duty on it ... percent since January last year.

This is evident in the recent sharp rise in seizure of ... Bangladesh customs officials.

Around 520 kilograms of gold was seized last year, wh... was only 25 kg in 2012, according to customs intelligence.

The Daily Star

শাহজালালে পাঁচ ওজনের দুই টাকার সোনা

ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৩০ কেজি সোনার বার আটক

চোরাচালান চক্র

স্টাফ রিপোর্টার

সাম্প্রতিককালে সোনা চোরাচালান চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ও চট্টগ্রামে আটক করা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ৩০ কেজি সোনার বার। এর মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২০ কেজি, চট্টগ্রাম আমানত শাহ বিমানবন্দরে ৭ কেজি এবং চট্টগ্রামের অক্সিজেন মোড় থেকে ৩ কেজি সোনার বার আটক হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল ভোরে কুয়ালালামপুর থেকে রিজেন্ট এয়ারওয়েজের একটি উড়োজাহাজ শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে। উড়োজাহাজের সকল যাত্রী নেমে যাওয়ার পর এর টয়লেটের মধ্যে একটি ব্যাগ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সংশ্লিষ্ট কেবিন ক্রুরা শুল্ক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। পরে ব্যাগটি উদ্ধার করা হয় এবং এর মধ্যে পাওয়া যায় ১৬০টি সোনার বার। এগুলোর ওজন ২০ কেজি। একই দিন সকাল সাড়ে ১০টায় দুবাই থেকে চট্টগ্রাম আমানত শাহ বিমানবন্দরে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজ থেকে পরিত্যক্ত একটি ব্যাগ তল্লাশি করে ৭ কেজি পরিমাণ ৬০টি সোনার বার আটক করে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। এই উড়োজাহাজটি দুবাই থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসছিল। চট্টগ্রামের যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর গোয়েন্দা কর্মকর্তা নাহিদ নওশাদ মুকুল ও হাবিবুর রহমান উড়োজাহাজের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে একটি সিটের নিচ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এই সোনা উদ্ধার করেন। সোনার বারগুলো একটি ব্যাগের মধ্যে ছিল।

অপরদিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারির দেওয়ান নগর এলাকার জাহাঙ্গীর আলম ২৬টি সোনার বার নিয়ে সিএনজি চালিত অটোরিকশায় করে নগরের কোতোয়ালি যাচ্ছিলেন। অক্সিজেন এলাকায় পুলিশ তার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে সোনার বারগুলো উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া সোনার ওজন তিন কেজি। যার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। এ ঘটনায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার দেওয়ান নগর এলাকার নাসিরুল আলমের ছেলে জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ■ ২৫ মাঘ ১৪২০

আমাদের সময়

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ধরা পড়ল ৪৮ কেজি স্বর্ণ

চট্টগ্রাম ব্যুরো ■

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ৪৮.৫ কেজি স্বর্ণ ধরা পড়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ১৭ কোটি টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটা ১০ মিনিটে দুবাই থেকে আসা ফ্লাই দুবাই উড়োজাহাজে (এফজেড ৫৮৯) তল্লাশি চালিয়ে টয়লেটে এ বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় কোনও যাত্রী ধরা পড়েনি।

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস ও শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ধরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কর্মকর্তাদের যৌথ অভিযানে এ স্বর্ণ ধরা পড়ে। চট্টগ্রাম বিমানবন্দর শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নাহিদ নওশাদ মুকুল আমাদের সময়কে বলেন, উড়োজাহাজের ভেতরে তল্লাশি করে এ বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। এ সময় স্বর্ণ বহনকারী কাউকে পাওয়া যায়নি।

■ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০

সকাল ১২৮টি স্বর্ণের বারসহ একজনকে গ্রেপ্তার

■ আমাদের সময়

আমাদের সময়

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ১২ কেজি স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার ১

...বিমানবন্দরে ...স্বর্ণসহ

...ও বিমান বন্দর ...স্বর্ণের বারসহ ...রয়েছেন কাস্টমস ...ওয়া ব্যক্তির নাম ...। তার বাড়ি ফটিকছড়ি ...র্ণের বারের ওজন ১২ ...পেছে।

...ন বন্দর পুলিশের ...কমিশনার মিজানুর ...সকাল পৌনে ১০টায় ...বাংলাদেশ বিমানের ...ফ্লাইটে দুবাই থেকে ...ন। বিমানবন্দর থেকে ...ময় তার সঙ্গে থাকা ...করে এসব স্বর্ণের বার ...কাস্টমস কর্মকর্তারা

তথ্য যখন তত্ত্ব তৈরির মূল একক তখন তথ্যের কাঁধে ভর করে জ্ঞান ও সভ্যতার বিনির্মাণ এগিয়ে যেতে থাকবে এটিই সত্য। যে দেশ বা জাতির তথ্য ভান্ডার যত সমৃদ্ধ, তার জ্ঞান বলয়ের পরিব্যাপ্তি তত বেশি। আর তাই উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার দ্বার উন্মুক্তকরণের প্রথম শর্ত হল তথ্যের যথাযথ উপস্থাপন, বিনিময়, ব্যবহার ও রূপান্তরের মাধ্যমে সময়োপযোগী জ্ঞানকান্ড বা ডিসকোর্সের জন্মদান। বহুমুখী মিডিয়ার বহুবিধ ব্যবহারের এই সময়ে আমরাও পিছিয়ে নেই। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মিডিয়ার স্বাধীন কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসী। আমাদের কাজ, পথচলা, সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা সবকিছু মিডিয়ার কল্যাণে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

গোয়েন্দা অধিদপ্তর হিসেবে গোয়েন্দা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বাঞ্ছনীয়। তবে কার্যক্রম শেষে প্রাপ্ত তথ্যে তথ্য অধিকার সবার। আমাদের যেকোন কার্যক্রমের যুক্তিযুক্ত ও সাবলীল উপস্থাপনা ও প্রচারণার সাথে সবসময় যুক্ত আছে এদেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া। যে কোন প্রোপাগান্ডার উর্ধ্বে থেকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে তারা স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিচারে এক অপোষহীন ভাবমূর্তি হিসেবে এই দপ্তরের কাজকে সামনে এনেছেন। এজন্য তাদের কাছে ঋণী।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর হিসেবে এই দপ্তরের কার্যক্রম অতন্দ্র প্রহরীর মতো। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কাঠামো ও জনগণের জন্য হুমকিস্বরূপ যে কোন পণ্য, তা অস্ত্র, মাদক, সোনা, মুদ্রা, ক্ষতিকর রাসায়নিক, ঔষধ কিংবা, সবার অলক্ষ্যে দেশের সীমানায় প্রবেশদ্যোত প্রাণঘাতী ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া যাই হোক না কেন, তার প্রবেশ রোধ করতে এই দপ্তর আপোষহীন, সদাসচেষ্ট। আর এমন নিরলস কার্যক্রমের প্রচারণা চালিয়ে সহায়তা করছেন মিডিয়া সংস্থাগুলো।

যখন কোন চাঞ্চল্যকর আটকের ঘটনা ঘটে, তখন সাথে সাথে মিডিয়াগুলোতে আমরা ই-মেইল, ফ্যাক্স, ফোন ও এস এম এসের মাধ্যমে প্রতিবেদন পাঠিয়ে থাকি। বড় ধরনের কোন আটকের ক্ষেত্রে প্রেস কনফারেন্সের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, সরকারী বিধিমালা অনুসারে সরকারী দপ্তরের প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বজায় রেখেই মিডিয়ায় সর্বসাধারণের জন্য প্রতিবেদন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য ৩টি।

প্রথমত, যারা এই ধরনের অন্যায় কাজের সাথে লিপ্ত থেকে রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও জনগণের ক্ষতি করছেন তাদের কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের উপস্থিতি ও তৎপরতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া, যেন তারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যান ও বিরত থাকেন।
দ্বিতীয়ত, নিজেদের কাজের ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
আর **সর্বশেষ উদ্দেশ্য** হল তথ্যের সর্বোত্তম বিনিময় প্রচারণা ও ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী কাস্টমস পরিমন্ডলের অপরাধ ও অপতৎপরতা রুখতে একটি ট্রান্সন্যাশনাল নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা। যেখানে রাজনৈতিক সীমানা নির্বিশেষে অপরাধীরা সংঘবদ্ধভাবে সীমান্ত চোরাচালানসহ কাস্টমস সম্পর্কিত অপরাধে লিপ্ত রয়েছে; সেখানে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে ট্রান্সন্যাশনাল সম্মিলিত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে না তুললে একক ভাবে নিজ দেশের কাস্টমস প্রক্রিয়াকে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে, যেকোন আটক প্রক্রিয়ার আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে অনলাইন টিভি ও পত্রিকায় পৃথিবীব্যাপী প্রচারণার সঙ্গে সঙ্গে RILO তে এবং RILO-র মাধ্যমে WCO তে প্রতিবেদন পাঠানো হয়। অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির এই সময়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্যের যথাযথ প্রচারণা সম্পন্ন করা আমাদের মূল লক্ষ্য। আর এরই প্রয়াসে ইতোমধ্যেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আটক সমূহ নিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিবেদন নিয়ে প্রযোজিত হয়েছে আমাদের ''লেন্স অব মিডিয়া'' অংশটি।

প্রতিবেদক
উম্মে নাহিদা আক্তার
সহকারী পরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২০
২৬ নভেম্বর ২০১৩

শাহজালাল বিমানবন্দরে ১১৭০ কার্টন সিগারেট আটক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা গতকাল সোমবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বিদেশি সিগারেট আটক করেছে। কে বা কারা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে দুবাই থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১ হাজার ১৭০ কার্টন সিগারেট নিয়ে আসে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চোরাচালানকৃত এই সিগারেট আটকের জন্য শুল্ক গোয়েন্দারা বিমানবন্দরের ...

সমকাল

শাহজালালে কোটি টাকার সি...

■ সমকাল প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ... ৫ হাজার ৩০... স্টুডিনিট থেকে আমদানিনিষিদ্ধ ... করা হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জান... মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বিদেশ থেকে ইত্তেহাদ ... বিমানবন্দরের এয়ারফ্রেইট ...

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ১৪ ফাল্গুন ১৪২০
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তিন কোটি ১০ লাখ টাকার সোনা ও সিগারেট আটক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গতকাল মঙ্গলবার কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পৃথক ২ ঘটনায় ৩ কোটি ১০ লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও সিগারেট আটক করেছে। এ ঘটনায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিমানবন্দরের ৬ নম্বর বেল্টের কাছে একটি টয়লেটের কমোড থেকে গতকাল সকাল ১১টার দিকে টেপ ... অবস্থায় ৪ কেজি ৬শ ...টি পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২৮ জানুয়ারি ২০১৪। ১৫ মাঘ ১৪২০

বেনাপোল বন্দরে ছয় কোটি টাকার কাপড় আটক

বেনাপোল প্রতিনিধি ►

বন্দরের মাধ্যমে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ভারত থেকে আমদানি করা ছয় কোটি টাকার কাপড় আটক করেছে বেনাপোল বন্দর কর্তৃপক্ষ। বেনাপোল শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের সূত্র জানায়, নারায়ণগঞ্জের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হাজি অ্যাপারেলস গত ১৮ জানুয়ারি ভারত থেকে এক ট্রাক কাপড় আমদানি করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ট্রাকটি আটক করেন। বন্দরের মাধ্যমে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে শতভাগ লেডিস পলিয়েস্টার স্কার্ফ আমদানি করেন, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যায় এটি বন্দরের মাধ্যমে আমদানি নিষিদ্ধ। তা ছাড়া ঘোষণার অতিরিক্ত ও ওভার ইনভয়েস করা হয় এই চালানটিতে। পণ্য চালানের আমদানি মূল্য তিন লাখ ২৪০ ইউএস ডলার দেখানো হয়েছে। পণ্যের মূল্যসহ শুল্ক ফাঁকির পরিমাণ ছয় কোটি টাকা বলে শুল্ক গোয়েন্দা সূত্র জানায়। গোয়েন্দা চোখ এড়াতে পণ্য চালানটি কৌশলে বন্দর পেড়ে আনলোড না করে আট দিন ধরে বন্দরের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকে রাখা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার ৩ পৌষ ১৪২০
১৭ ডিসেম্বর ২০১৩

চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে বড় অংকের ভারতীয় রুপিসহ আটক এক

■ চট্টগ্রাম অফিস

বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রাসহ এক ব্যক্তিকে গত রবিবার চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী ব্যক্তির নাম এতাফিজুর রহমান। ওমান এয়ারলাইন্সের ডব্লিউওয়াই-৩১১ ফ্লাইটে তিনি চট্টগ্রামে আসেন। তার বাড়ি কক্সবাজার জেলায়। বিকাল পাঁচটায় বিমানটি অবতরণের পর ইমিগ্রেশনের স্ক্যানিংয়ে ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নাহিদ নওশাদ বলেন, তিনি ওমান থেকে চট্টগ্রামে এসেছেন। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা ভারতীয় রুপির পরিমাণ দুই কোটির বেশি হতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

...ন কোটি

সোনার বার উদ্ধার করা হয়। আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ১... টাকা। কাস্টমস গোয়েন্দারা দুবাই ফ্লাই দুবাইয়ে আসা যাত্রীদের স্বর্ণ চোরাচালানটি সম্পর্কে গোপন সংবাদ পেয়েছিল।

এদিকে এয়ারফ্রেইট ... কাস্টমস গোয়েন্দারা প্রায় ১ কোটি মূল্যের বিদেশি সিগারেট আটক ... ইত্তিহাদ এয়ারওয়েজে গত ... আনা আমদানি করা ১৩টি ... ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা গোপন সংবাদ ... কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তা ... সম্পন্ন করে ৫ হাজার ... সিগারেট পান। আমদানি ... ২০১২-২০১৫-এর সংশ্লিষ্ট ... করে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এ... হয়েছিল।

শুল্ক ফাঁকি দিতে গাড়ি খুলে আমদানি

বিশেষ প্রতিনিধি ●

শুল্ক ফাঁকি দিতে বিলাসবহুল গাড়ি খুলে 'খুচরা যন্ত্রাংশ' হিসেবে আমদানি করা হয়েছে। এসব যন্ত্রাংশ জোড়া দিয়ে আস্ত গাড়ি তৈরি করা সম্ভব। শুল্ক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কমলাপুর ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) থেকে এ রকম ১২টি গাড়ির একটি চালানের খোঁজ পাওয়ার পর এগুলো আটক করার সুপারিশ করেছেন। এই চালানে আছে চারটি জিপ, তিনটি মাইক্রোবাস ও পাঁচটি গাড়ি। জানতে চাইলে ...

'খুচরা যন্ত্রাংশ'র চালানে ... গাড়ি। ...

টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শুল্ক আইন অনুসারে গাড়ির শুল্ক ২৫০ শতাংশ, কিন্তু খুচরা যন্ত্রাংশের সর্বোচ্চ শুল্ক মাত্র ২৫ শতাংশ।

জানতে চাইলে পণ্যটি খালাসের দায়িত্বে নিয়োজিত ... এখনো কোনো মামলা করতে পারি হয়নি। সংবাদকর্মী শুনেই তিনি ফোন কেটে দেন।

কমলাপুর আইসিডির কমিশনার (শুল্ক) এ কে এম নুরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, তিনি দেশের বাইরে থাকার সময় এ চালানটি আমদানি হয়। এ কারণে আগে থেকে কিছু জানতেন না। এখন এসব পরীক্ষা করা হবে।

শুল্ক কর্মকর্তারা জানান, এগুলো আসলে সম্পূর্ণ গাড়ি। এখন পুরো গাড়ির শুল্ক দিয়েই এসব ছাড়াতে হবে।

যুগান্তর
বুধবার ১ জানুয়ারি ২...

শাহজালালে ৩ কোটি টাকার ওষুধের চালান আটক

যুগান্তর রিপোর্ট

শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধের চালান আটক করেছে কাস্টমস ও শুল্ক গোয়েন্দা ...দপ্তর। এই ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। কাস্টমসের সহকারী কমিশনার ... জানান, গোপন ... দুপুরে ... হাউস থেকে ...

Customs intelligence officials physically examine fabrics of one of the seven containers seized at Chittagong Port yesterday suspecting irregularities in their import.

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY DECEMBER ...

7 containers of imported fabrics seized at Ctg port

STAFF CORRESPONDENT, Ctg

Customs intelligence officials yesterday seized seven containers of fabrics imported under zero duty facilities at Chittagong Port one and a half years ago, on suspicion that the importers are trying to smuggle the goods out of the port.

The investigators said the importers possibly wanted to have the goods released illegally on opportune moments and sell those on the local market instead of manufacturing and exporting finished products, a condition to enjoy total duty waiver on textile imports.

The fabrics are worth ...

SEE PAGE 4 COL 4

7 containers of imported

FROM PAGE 1

about Tk 20 crore including around Tk 7 crore of import duties, according to officials of the Directorate of Customs Intelligence and Investigation.

As part of an investigation on unreleased containers at the port, the directorate yesterday physically examined the seven containers before sealing those off.

According to import documents, MoonStar Garments Ltd at Laldighi imported three containers and Ample Fashion Ltd at Kalurghat of Chittagong city brought in the rest.

Authorities of the both factories, however, denied owning the consignments, saying some other people might have imported the fabrics using names of their factories to dodge import duties, said customs officials.

Last month, the customs intelligence enlisted 15 containers, which were suspected to be imported through irregularities but found during physical examination that five of them have already been already released.

Of the 15 containers, MoonStar imported eight and Ample Fashion four, said Moinul Khan, director general of the customs intelligence directorate.

During the investigation, MoonStar authorities admitted that they have had four containers released earlier but failed to show documents that they have exported finished goods manufactured with those imports, he added.

The Daily Star could independently contact the officials of the two factories for comment.

The Daily Star
16 DHAKA TUESDAY MAY ...

480 rare starred tortoises seized

A Malaysia-bound Indian held at Shahjalal Airport for the smuggling bid

STAFF CORRESPONDENT

Customs officials seized 480 rare starred tortoises from a Malaysia-bound Indian national at the capital's Hazrat Shahjalal International Airport early yesterday.

Immigration officials at Hazrat Shahjalal International Airport yesterday recovered these starred tortoises ... an Indian national heading for Malaysia.

PHOTO: ANISUR RAHMAN

The Daily Star
FOUNDER EDITOR
LATE S. M. ALI
DHAKA WEDNESDAY APRIL 2, 2014

Gold smuggling marks sharp rise

Smuggled gold meant mainly for Indian market

দৈনিক জনকণ্ঠ

চোরাই সোনায় চলছে

বৈধ পথে এলসির মাধ্যমে আমদানির

কালের কণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৩০ কেজি সোনার বার আটক

সক্রিয় চোরাচালান চক্র

আমাদের সময়
মঙ্গলবার ১৯ নভেম্বর ২০১৩

প্রথম আলো
বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

Bangladesh customs officials.
Around 520 kilograms of gold was sei

১২ কেজি স্বর্ণসহ বিমানযাত্রী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা গতকাল বিকেলে এক বিমানযাত্রীর দেহ তল্লাশি করে ১২ কেজি সোনার বার উদ্ধার করেছেন। ওই যাত্রীকেও আটক করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের সহকারী কমিশনার রাশেদুল হাসান জানান, আমিরাত এয়ার লাইনসের বিমান ই-৫৮০ ...

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ১২ কেজি স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার ১

আমাদের সময়
শুক্রবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ■ ২৫ মাঘ ১৪২০

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY FEBRUARY 26, 2014

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ধরা পড়ল ৪৮ কেজি স্বর্ণ

চট্টগ্রাম ব্যুরো ● চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ৪৮.৫ কেজি স্বর্ণ ধরা পড়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ১৭ কোটি টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটা ১০ মিনিটে দুবাই থেকে আসা ফ্লাই দুবাই উড়োজাহাজে (এফজেড ৫৮৯) তল্লাশি চালিয়ে টয়লেটে এ বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় কোনও যাত্রী ধরা পড়েনি।

চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস ও শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ধরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কর্মকর্তাদের যৌথ অভিযানে এ স্বর্ণ ধরা পড়ে। চট্টগ্রাম বিমানবন্দর শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নাহিদ নওশাদ মুকুল আমাদের সময়কে বলেন, উড়োজাহাজের ভেতরে তল্লাশি করে এ বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। এ সময় স্বর্ণ বহনকারী কাউকে পাওয়া যায়নি।

২১ কোটি ...র্ণ উদ্ধার

40 gold bars recovered at Shahjalal airport

STAFF CORRESPONDENT

Customs intelligence officials seized 40 gold bars, weighing 4.6kg, worth Tk 2.10 crore, at the capital's Hazrat Shahjalal International Airport yesterday.

The bars were found abandoned inside a toilet near belt no-5 of Customs Hall around 11:45am, said Moinul Khan, director general of customs intelligence.

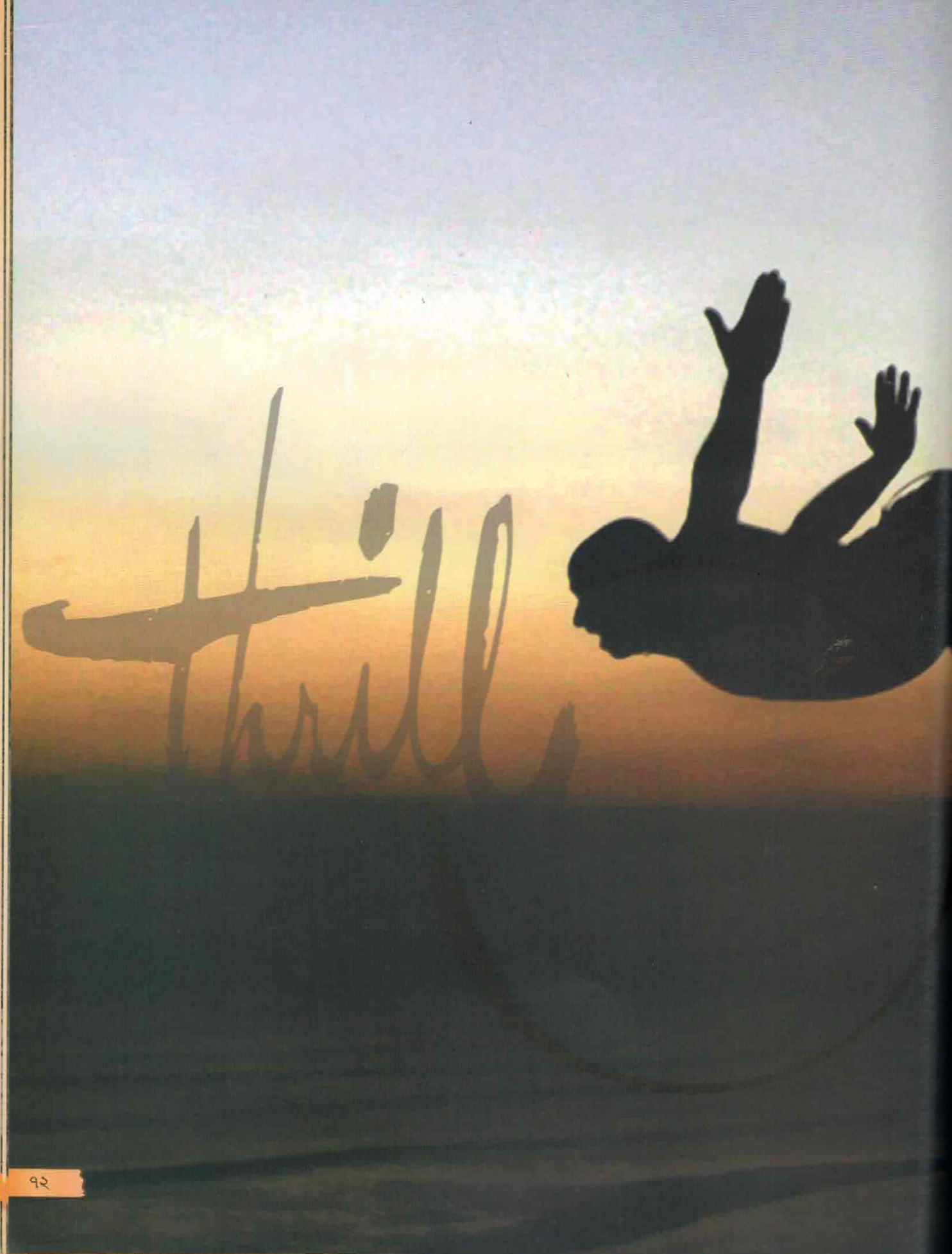
Thrill

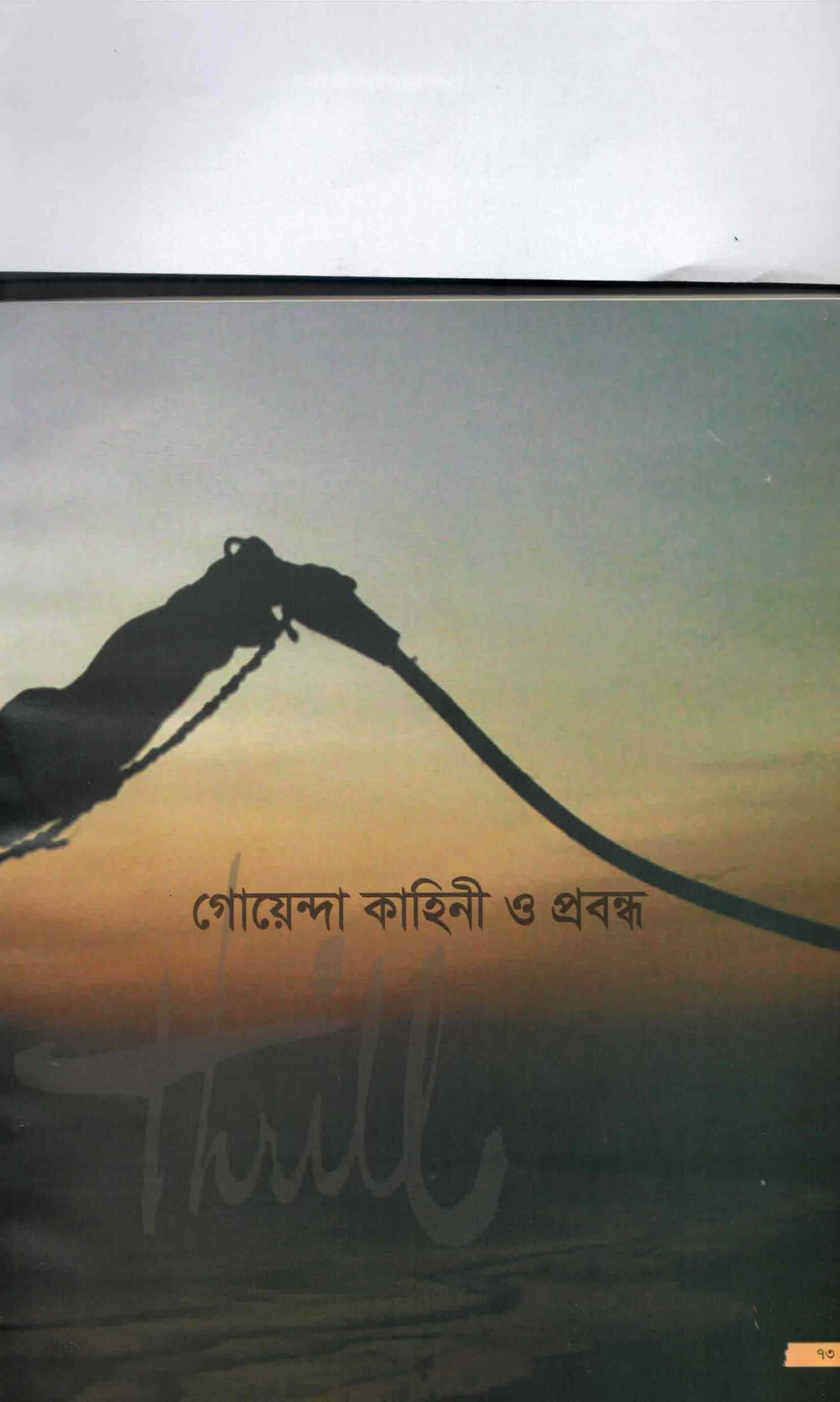

গোয়েন্দা কাহিনী ও প্রবন্ধ

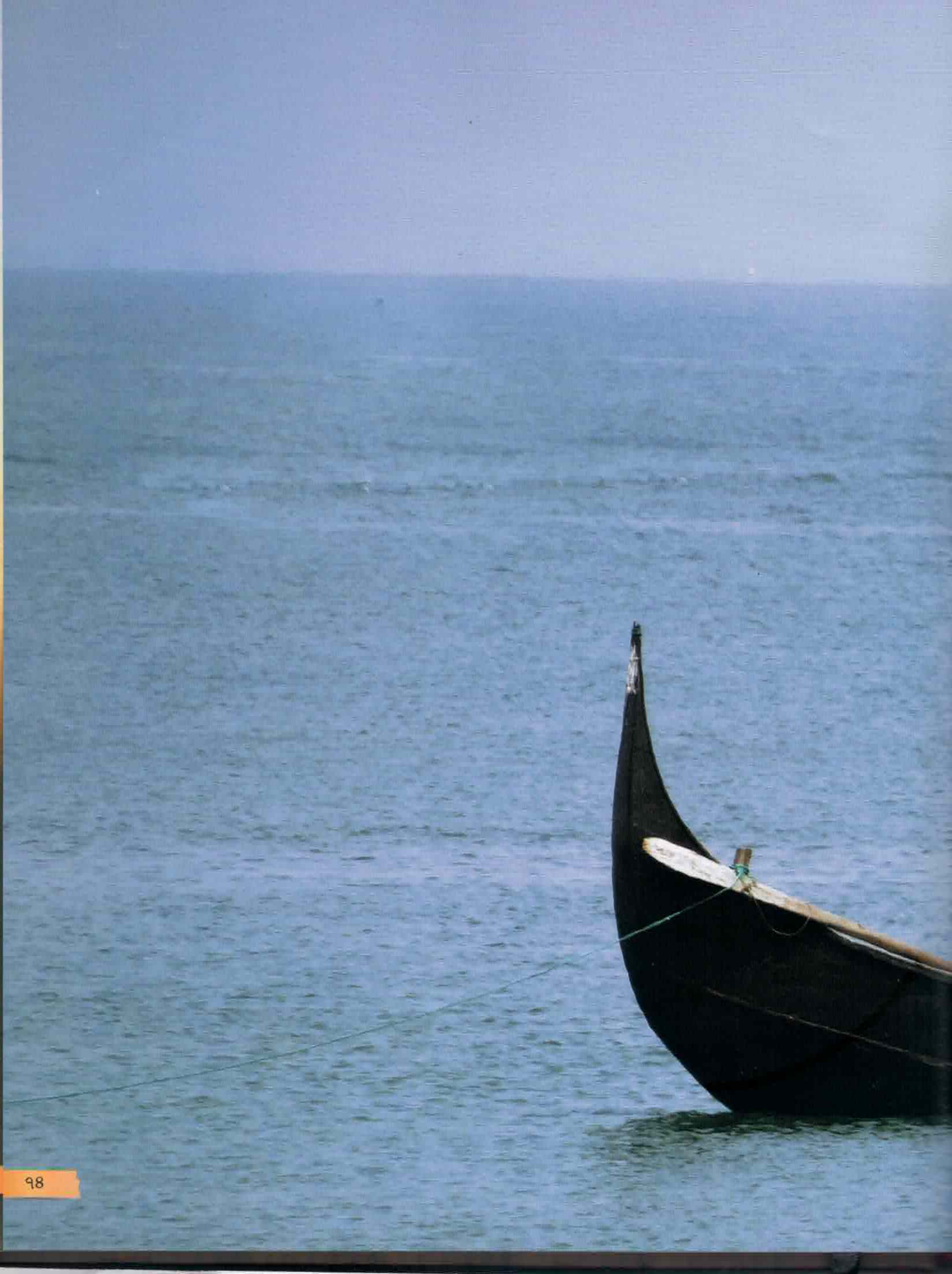

চোরাচালানের কিংবদন্তী “ম্যান ছেরু মিয়া”

আবদুল লতিফ সিকদার

উনিশশত চুয়াত্তর সালের তেইশে মার্চ শনিবার, সপ্তাহান্তের অর্ধ কর্মদিবসের অবসান ঘটে বিকেল দু'টোর মধ্যে। ছুটির আমেজে কর্ণফুলি নদীর পাড়ে ওল্ড কাস্টম হাউসে নারকেল গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে বিকেল নামে ধীর গতিতে আলস্যের কোমল পরশ বুলিয়ে। কর্ণফুলির জলরাশিতে ভাঁটার শেষে একটা নিস্তরঙ্গ থমথমে ভাব যেন জোয়ারের আগমনের অপেক্ষারত। একটু পরেই জোয়ার। প্রবল বেগে ধেয়ে আসবে বঙ্গোপসাগরের অথৈ জলরাশি। ষাটের দশকের শুরুতেই সমুদ্র পথের সকল কাস্টমস কার্যক্রম নিউ কাস্টম হাউসে স্থানান্তর হয়ে গেলে ওল্ড কাস্টম হাউসে সেন্ট্রাল এক্সাইজ এন্ড ল্যান্ড কাস্টম এর সহকারী কালেক্টরের ডিভিশনাল অফিস স্থাপিত হয়। ওল্ড কাস্টম হাউসের অভ্যন্তরে সহকারী কালেক্টরের বাসভবনটি নদীর পাড়ে অনেকটা নিরাপত্তাহীন অরক্ষিতই বলা যায়। অফিস ছুটির পর এলাকাটি নির্জনতায় ডুবে যায়।

তেইশে মার্চের শনিবারের পড়ন্ত বিকেলে পরিবারের সদস্য সমভিব্যাহারে বাইরে বেরুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময়ে এক আগুন্তকের আবির্ভাব। গেটের পাহারারত সেপাই এসে জানাল যে কোন এক জরুরি কাজে একজন লোক আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। অফিস সময়ের পরে কোন সাক্ষাৎপ্রার্থীর আগমন অনেকটা অপ্রত্যাশিত। তবে যখন জানতে পারি যে একটা জরুরি গোপন সংবাদ দিতে তিনি আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চান তখন বাইরে যাবার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে অফিস চেম্বার খুলে তাকে আসতে বলি। লুঙ্গি শার্ট পরিহিত সাদাসিধে একজন সাধারণ গ্রামবাসী। প্রথম দর্শনে যাকে একজন গোপন সংবাদদাতার ভূমিকায় বিশ্বাসে আনা সুকঠিন সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কিন্তু শুল্ক ফাঁকি কিংবা চোরাচালানের গোপন সংবাদ প্রবাহের জগতে বিশ্বাস -অবিশ্বাসের সীমারেখা নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট নির্দেশিত মানদন্ড থাকে না। এটি একটি জটিল অনুভূতির ব্যাপার, তীব্র মননশীলতা ও অনায়াস অনুশীলনে যার অবয়ব নির্মিত হয়। অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আর চেতনা নির্দেশিত পথ ধরে অগ্রসর হই।

সংবাদদাতার নাম ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করে নিশ্চিত হই যে তার নাম ঠিকানা সঠিক নাও হতে পারে, তবে সে যে দলছুট হয়ে দলের অন্যান্য মাঝিদের ধরিয়ে দিয়ে শাস্তি দিতে চায় তাতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। তাই সংবাদটি সঠিক ধরে নিয়ে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। গোপন সংবাদ হল, কুতুবদিয়ার কাছে গভীর সমুদ্রে অবস্থানরত বিদেশী জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণ সিগারেট, মদ, শাড়ি, অন্যান্য কাপড়সহ সব বিলাসদ্রব্য খালাস করে ১০০ টনের অধিক মাল বোঝাই একখানি জালি বোট মাঝির ঘাটের দিকে চলে এসেছে এবং রাতের আঁধারে এখান থেকে মাল খালাস করে ট্রাকযোগে পাচার করা হবে।

এই গোপন সংবাদটির ক্ষেত্রে সংবাদদাতাকে সঠিক তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে গণ্য করে এবং পণ্যবাহী জালি বোটখানির আনুমানিক অবস্থান নিশ্চিত হয়ে একটি অভিযান পরিচালনার কঠিন ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। এটা যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে পারে সেটা জেনে নিয়েই এই অভিযানের তাগিদ মনেপ্রাণে অনুভব করলাম। এ এক এমন এক অনুভব যা গভীর কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব চেতনা থেকে উৎসারিত। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংগ্রহ করে অভিযান স্কোয়াড গঠনই প্রাথমিক পদক্ষেপ। দু'জন নির্ভীক ও নির্ভরশীল কর্তব্যনিষ্ঠ ইন্সপেক্টরের কথা মনে হল, যাদের বাসার ঠিকানা অফিসেই ছিল। সাথে সাথে তাদের বাসা থেকে ডেকে পাঠানো হল। তাদের একজন সার্কেল ওয়েস্ট এর প্রিভেন্টিভ অফিসার বোরহানুল হক চৌধুরী এবং অন্যজন সার্কেল ইস্ট এর প্রিভেন্টিভ অফিসার মুক্তিযোদ্ধা উদয়ন বড়ুয়া। তাদের নেতৃত্বে ওল্ড কাস্টম হাউসের স্টাফ কোয়াটারে বসবাসকারী কয়েকজন সিপাই সমন্বয়ে গঠিত হল অপারেশন 'ম্যান ছেরু মিয়া' স্কোয়াড। ভাড়া করা সাম্পানযোগে কর্ণফুলী নদীর পাড় ঘেঁষে শুরু হল অভিযানের পালা। সংবাদদাতার দেয়া তথ্য মত জালি বোট নং - প ৭৯/৭৪ কোথায় নোঙর করেছে তার খোঁজে রাতের আঁধারে চলতে থাকলো অভিযান।

রাতের আঁধার গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে কর্ণফুলীর বুকে। মাঝিরঘাট এলাকায় নোঙর করা একখানি বিশালাকার জালি বোটের ছায়া ভেসে ওঠে। এর অভ্যন্তরে কয়েকদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত মাঝির দল বিশ্রামরত। পূর্বনির্ধারিত যথা সময়েই অযান্ত্রিক মানুষ চালিত বোটখানা নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। এখন পণ্য বুঝে নিয়ে খালাস করার আয়োজনে ব্যস্ত নদী তীরে অবস্থানরত মালিকের লোকজন। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অপারেশন স্কোয়াড অতি সন্তর্পণে বোটে উঠে পড়লো এবং নিরস্ত্র মাঝিদের কাবু করে পাটাতন উঠিয়ে দেখতে পেলো বিদেশী পণ্যের কার্টন ভর্তি বোটের খোল। অপারেশন স্কোয়াড বোটখানি আটকের ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়ে তিন চারজন মাঝির সহায়তায় নোঙর তুলে ফেলে অদূরে অবস্থিত সদরঘাটের দিকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে রাত দশটার মধ্যে ওল্ড কাস্টম হাউসের ঘাটে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

বোট আটকের পর তাৎক্ষণিক কতিপয় কার্য ব্যবস্থা নিয়ে নিলাম। আগ্রাবাদ সিজিএস কলোনীতে বসবাসরত বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের তিন চারটা গাড়ী পাঠিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হল। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে সে আশংকা মাথায় রেখে কয়েকটি হ্যাজাক লাইট পার্শ্ববর্তী ডেকোরেটরের দোকান থেকে ভাড়া নিয়ে আসা হল। এক কথায় ওল্ড কাস্টম হাউসকে সেই অন্ধকার রাতে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় জাগরিত করে এক অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত করে তোলা হল। কারণ, আতংকিত হওয়ার মত ঘটনার খবর আসতে শুরু করেছে। ওল্ড কাস্টম হাউসের সামনের ষ্টান্ড রোড ধরে দু'একটা সন্দেহজনক গাড়ী টহল দিতে দেখা গেল। ইতিমধ্যে নদীবক্ষে কয়েকটি সাম্পানের আনা গোনা লক্ষ্য করা গেছে।

তাই বোটখানি নদীতে ভাসমান অবস্থায় নোঙর করে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে সেটাকে চরায় আটকে দিয়ে মাঝি মাল্লাদের নামিয়ে এনে ওল্ড কাস্টম হাউসের অভ্যন্তরে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ আটকে রেখে শক্ত পাহারা বসানো হয়। তবে নিরস্ত্র সিপাই দিয়ে পাহাড়া দেয়া নিরাপদ মনে হল না। তাই পুলিশের সশস্ত্র পাহারা চেয়ে জেলা রিজার্ভ পুলিশ সুপারের দপ্তরে পাঠানোর জন্য একখানি পত্র তৈরী করা হল। পুলিশের সদর দপ্তরে টেলিফোনের চেষ্টা করে কাউকে না পেয়ে লিখিত পত্র খানি পাঠানোর চেষ্টা করছি এমন সময়ে মোটর সাইকেলে টহলরত দু'জন পুলিশ সার্জেন্ট ওল্ড কাস্টম হাউসের গেটে হাজির। পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তাদের মাধ্যমে পত্র খানা পাঠানো গেল। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই দশজন পুলিশের একটি দল এসে কর্তব্যরত হল।

এবার পণ্য খালাসের পালা। স্ট্যান্ড রোডের দুটি দোকান থেকে দু'জন স্থানীয় লোককে নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে ডেকে আনা হল। রাতের আঁধারে পণ্য নামনোর ব্যাপারে কর্মকর্তারা দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাছাড়া স্টেট ওয়্যারহাউসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি। সবে জোয়ার শুরু হয়েছে। ভোর পর্যন্ত জোয়ার থাকা অবস্থায় বোট থেকে পণ্য ছোট সাম্পানযোগে তীরে নিয়ে আসা সহজ হবে। নদীর পাড়ে অবস্থিত মিলানায়তনে পণ্য রাখা সহজ হত। কিন্তু নড়বড়ে দরজা জানালাযুক্ত টিনশেডের এই মিলানায়তনে পণ্য রাখা নিরাপদ মনে হল না। তাই ডিভিশনাল অফিসের বিরাট হল ঘরটি খুলে দিয়ে টেবিল চেয়ার র‍্যাকসহ সব আসবাবপত্র প্রশস্ত বিশাল বারান্দায় বের করে হল ঘরটি খালি করে সেখানেই সাময়িকভাবে পণ্য রাখার ব্যবস্থা করে দিতে হল। পাশের বাংলাদেশ রিভার স্টীমার ঘাট থেকে দু'টি ছোট সাম্পান ও ১৫ জন কুলি নিয়ে আসা হল। এবং শুরু হল পণ্য খালাসের পালা। সে এক বিনিদ্র রজনীর বিশাল কর্মযজ্ঞ। একদল কুলি বোট থেকে সাম্পানে পণ্য নামিয়ে দিচ্ছে। ঘাটের ছোট কাঠের ব্রিজের মত পল্টুনে সাম্পান থেকে পণ্য তীরে তুলছে আরেকদল কুলি এবং সেখান থেকে হল ঘরে পণ্য নামিয়ে আনছে অন্য দল। তিন স্তরেই নিরাপত্তা দিচ্ছে সশস্ত্র পুলিশ এবং আমাদের সিপাইয়ের দল এবং তিন স্তরেই প্রতিটি পণ্য কার্টনের হিসাব রাখা হচ্ছে আলাদাভাবে। কুলিরা হিসাব মিলাচ্ছে তাদের কায়দায় কাঠির সাহায্যে।

পরদিন ভোরের আলোয় জালিবোটের খোল ঠাসা পণ্যের পরিমাণ দেখে বিস্ময়ের পালা শুরু। রাতে যে পণ্য নামানো হয়েছে তাতেই হল ঘরের অর্ধেকটা ভরে গেছে। বোঝা গেল এটি একটি মামুলি চোরাচালানকৃত পণ্য আটকের কেস নয় আর এর সাথে একটি প্রভাবশালী মহল জড়িত।

রোববারের ছুটির অবকাশ আর ভোগ করা হল না। প্রাতঃরাশ সেরে সামান্য বিশ্রাম। তারপর কাজের পালা শুরু। কাজের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকলো। সাথে সাথে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। টেলিফোনে কয়েকদফা স্নায়ু হিমেল করা শ্বেত সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল ভৌতিক কণ্ঠস্বর।

কোন নাম নেই, পরিচয় প্রকাশ করে না, শুধু ভীতি উদ্রেক করে যায়। অন্তরাত্মা শুকিয়ে দেয় এমন নির্দেশ আসে, পণ্য ছেড়ে দিতে হবে। ভয়ভীতি শেষে প্রলোভন। কোন কিছুতেই টলাতে না পেরে পরিবার পরিজন সহ জীবননাশ অথবা চাকরিচ্যুতি কোন কিছুই বাদ যায়নি। এমনিভাবে টেলিফোন যন্ত্রটি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দেখা দিল বারবার।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় সকাল নয়টার পর কালেক্টর এম.এ.রশিদ সাহেবকে খবর দেয়া হল। কাস্টম হাউসের কালেক্টর তবারক আলি সাহেবকেও জানানো হল। ঢাকার সব জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় ব্যুরো প্রধান এবং চট্টগ্রামের 'আজাদী' ও `People's View' পত্রিকা দু'টির অফিসে খবর পৌঁছে দেয়া হল। দশটা নাগাদ সবাই আসতে শুরু করলেন। তারা ঘটনা শুনলেন ও পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখলেন। পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে কোন ধারণাই দিতে পারলাম না। কেননা, এক তৃতীয়াংশ পণ্যও তখন খালাস হয়নি। কিছুক্ষণ পর জোয়ার আসলে আবার খালাস শুরু করা হবে। তারপর হয়তো বলা যাবে। তবে খালাসকৃত পণ্যের ইনভেনটরি সকল পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে দেয়া হল। বাকীটা তারা নিজেরাই অনুমান করে নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করলেন।

কালেক্টর রশীদ সাহেবের কাছে কেসের গুরুত্ব ও বিদ্যমান বিরূপ পরিস্থিতি তুলে ধরে অনুরোধ করা হল ঘটনাটা যেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য জনাব ওয়ালিউল ইসলাম সাহেবকে জানানো হয় এবং তিনি যেন অর্থসচিব জনাব কফিলউদ্দিন মাহমুদ সাহেবের মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে ঘটনা ও পরিস্থিতি অবহিত করেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাঁর অকুস্থল পরিদর্শন ও নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

এগারোটার পর যে যার কাজে চলে গেলেন। আমি পড়ে রইলাম। একা নিঃসঙ্গ অসহায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তবু সিদ্ধান্তে অটল, অনড় এবং দৃঢ়। প্রটোকল ভেঙ্গে জনাব ওয়ালিউল ইসলাম সাহেবকে আমি নিজেই ফোন করলাম। এর আগে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে তিনি কালেক্টর থাকাকালীন তিন বছরের বেশী সময়ে একসাথে কাজ করেছি। সেই সুবাদে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধরে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম যাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী দয়া করে এখানে এসে আমাদের অভয়বাণী শুনিয়ে যান। বিষয়টিতে কোন রাজনৈতিক মহল জড়িত থাকলে এখানে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়কল্পে তাঁর উপস্থিতি জরুরি। জনাব ওয়ালিউল ইসলাম আমাকে কথা দিলেন তিনি যে করেই হোক মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এখানে আসার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হবেন এবং আমাকে নির্ভীক চিত্তে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সাহস যোগালেন।

সন্ধ্যার পর জনাব ওয়ালিউল ইসলাম ফোন করে জানালেন যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কাপাসিয়া সফর শেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন। তাঁকে এই কেস আটকের কথা জানালে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁকে চট্টগ্রাম সফরের জন্য অনুরোধ করলে রেগে যান এই বলে যে এটাতো প্রশাসনিক নির্বাহী দায়িত্ব এবং রাজস্ব বোর্ডকে সেটা প্রশাসনিকভাবেই মোকাবেলা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে আদৌ যেতে হবে কেন? অবশ্য সমগ্র বিষয় বোঝানোর পর বাস্তব পরিস্থিতি তিনি উপলব্ধি করেন এবং শেষ পর্যন্ত আসতে রাজী হন। তবে কখন কীভাবে আসবেন তা তার একান্ত সচিব হাকিম সাহেবের মাধ্যমে পরে জানাবেন।

দুপুর নাগাদ রাউন্ড দি'ক্লক তিন শিফট সশস্ত্র পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিভিশন ও সার্কেল অফিসের শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীকে একইভাবে তিন শিফটে দায়িত্ব দেয়া হল। রাতে যারা কাজ করেছে তাদের বিশ্রামে পাঠানো হলো। নদী বক্ষে পাহারা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ নেভীকে অনুরোধ করা হলে সাথে সাথেই তারা অনুকূল সাড়া দিয়ে গানবোটের টহল দেয়ার ব্যবস্থা করে দিল। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকলো। রাতেই মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রোগ্রাম জানা গেল। তিনি পরদিন ২৫শে মার্চ দশটায় হেলিকপ্টার যোগে চট্টগ্রাম আসবেন। সঙ্গে আসবেন অর্থসচিব জনাব কফিল উদ্দিন মাহমুদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সদস্য জনাব ওয়ালিউল ইসলাম এবং একান্ত সচিব হাকিম সাহেব। আর একটি বিনিদ্র রজনীর অবসান হল।

পরদিন ঢাকার সকল দৈনিক সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠার দুইতিন কলামের হেডলাইনের খবরে বলা হল "কর্ণফুলি থেকে কোটি টাকার চোরাচালানকৃত মাল উদ্ধার: চোরাচালানী চক্র গ্রেফতার"। চট্টগ্রামের কাগজে ব্যানার হেডলাইনে এ সংবাদ ছাপা হল। সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার অফিসের কর্মচারীরা এসে দেখতে পেল তাদের কর্মস্থল বিদেশী পণ্যে ভর্তি হয়ে গেছে। বসার কোন জায়গা নেই। বারান্দায় স্থানান্তরিত টেবিল চেয়ারে বসলেও কেউ কাজের মুডে নেই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আসবেন। তখন ওল্ড কাস্টম হাউসের অভ্যন্তরে, আঙিনায়, নদীর তীরে সর্বত্র এক উৎসবমুখর পরিবেশ রচিত হয়ে গেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অনন্য ভূমিকা পালনকারী তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের শুভ আগমন ওল্ড কাস্টম হাউসে। অথচ সংবর্ধনার কোন আয়োজন নেই, কোন স্বাগত তোরণ নেই, কোন বরণমাল্য নেই, নেই কোন শ্লোগান। কোন অভিনন্দনপত্র নেই, আছে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

জালিবোটের সব পণ্য তখনো খালাস করা যায়নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এসে কিছুক্ষণ অফিসে বসলেন। তাকে এই কেস আটকের ঘটনাবলীর শুরু থেকে একটা বিবরণ দেয়া হলে তিনি নদীতীরে গিয়ে বোটে যেতে চাইলেন। কিন্তু তখন নদীতে ভাটা চলছে। ওল্ড কাস্টম হাউসের ঘাটে কোন সাম্পান ভেড়ানো যাবে না। অর্থমন্ত্রীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাশে অবস্থিত বাংলাদেশ রিভার ষ্টীমারের ঘাটটিতে গিয়ে পড়লে তিনি সাথে সাথে সেখানে হেঁটে চললেন। অর্থসচিব সহ অন্য সবাই পেছনে পড়ে রইলেন। আমি কোন রকম দ্রুত পায়ে তার সাথে ছুটে গেলাম। সেখানে ভেড়ানো একটি সাম্পানে উঠে পড়লে আমিও তার সাথে উঠে পড়লাম। সাম্পান জালি বোটের কাছে আমাদের নিয়ে গেল। জালিবোটে ওঠা কষ্টকর হলেও আমরা দড়ির সিড়ি বেয়ে উঠে গেলাম। কর্মরত অফিসাররা বোটের সকল স্থান ঘুরিয়ে দেখালেন। তখনো এক তৃতীয়াংশ পণ্য বোট থেকে নামানো যায় নি। তিনি সেদিনের মধ্যে সকল পণ্য খালাস করতে বললেন। বোট পরিদর্শন শেষে ফিরে এসে তিনি অফিসে বসলেন এবং এ চোরাচালানের সাথে যারা জড়িত তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। বললাম, বোট থেকে আটককৃত পণ্যবহনকারী ও মাঝিদের কাছ থেকে ছেরু মিয়া ও মানু বাবু নামক দুটি নাম জানা গেছে, কিন্তু তাদের পরিচয় জানা যায়নি। যথাযথ নির্ভুল তদন্তে তাদের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। তিনি বিকেলে সার্কিট হাউসে জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিবেন বলে জানালেন এবং পিএসকে এক মিটিং আয়োজন করতে বললেন।

অর্থমন্ত্রী এরপর আটককৃত লোকদের সাথে কথা বলতে চাইলেন। ওল্ড কাস্টম হাউসের যে কক্ষে তাদের আটক রাখা হয়েছে কয়েকজন সাংবাদিক, অর্থসচিব এবং অন্য সফরসঙ্গীদের সেইখানে নিয়ে গেলে আটক অভিযুক্ত সবাই অর্থমন্ত্রীকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এদের দলনেতা হিসাবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনি মোহাম্মদ সেলিম, বাড়ি হালি শহরে। অর্থমন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তাঁর জিজ্ঞাসাবদের উত্তরে মোঃ সেলিম জানালেন যে আটককৃত মাল ছেরু মিয়ার, তিনিই বোটের মালিক, মাদার বাড়িতে থাকেন এবং মাঝিরঘাটে তার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর অফিস আছে। কুতুবদিয়ার কাছে জাহাজ থেকে বোটে মালামাল নামিয়ে দেয়া হয়। এর আগে আরো দুইবার তারা এইভাবে জাহাজ থেকে মাল নিয়ে এসেছে। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তাদের কোন টাকা পয়সা দিতে হয়নি। তাহলে ক্যাপ্টেন কেন কোটি টাকার মাল বিনা পয়সায় আপনাকে দিয়ে দিলো, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এমন প্রশ্নের উত্তরে মোঃ সেলিম জানালেন যে তিনি ইংরেজী জানেন না। তাকে শেখানো কোড ওয়ার্ড "ম্যানছেরু মিয়া" বললেই পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে দিলেন।

'ম্যন ছেরু মিয়া' শব্দত্রয়ের কি অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি, যা শোনা মাত্র বিদেশী জাহাজের ক্যাপ্টেন দেশী জালিবোটের চরণদারের কাছে অনায়াসে তুলে দেন কোটি টাকার মূল্যবান বিদেশী সামগ্রী। এই শব্দ সংকেত সাথে সাথে লুফে নিলেন অর্থমন্ত্রীর একদিকে দাঁড়ানো দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান জনাব মঈনুল আলম। অর্থমন্ত্রীর দিকে অর্থবহ দৃষ্টি দিয়ে মঈনুল আলম বললেন , "মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান তিনটি শব্দ শুনলাম। মাত্র তিনটি শব্দ বলে সে কোটি টাকার মাল পেয়েছে। অতএব প্রতিটি শব্দের মূল্য তেত্রিশ লক্ষ টাকা। এই প্রেক্ষাপটে মঈনুল আলম তৈরী করলেন "ম্যান ছেরু মিয়া" শিরোনামে ইত্তেফাকের পরবর্তী ডেসপ্যাচসমূহ।

তখন থেকে এ কেস পরিচিতি লাভ করে 'ম্যান ছেরু মিয়া' চোরাচালান কিংবদন্তীতুল্য কেস হিসেবে। তখন থেকে এটি একটি প্রতীকী নাম হিসেবে গণ্য হয়েছে অনেকদিন। জাতীয় সংসদে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর থেকে শুরু করে 'ম্যান ছেরু মিয়া' শব্দগুচ্ছ সকল অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে চিহ্নিত করার অর্থে গৃহীত হতে থাকে। চোরাচালানের গুপ্ত জগতের ছদ্ম নাম ম্যান ছেরু মিয়া, রহস্যের অন্তরালে সংঘটিত সব অশুভ কার্যক্রমের অন্য নাম ম্যান ছেরু মিয়া, মুখোশের অবগুণ্ঠনে সৃষ্ট সব নষ্টামির ঘৃণ্য নাম ম্যান ছেরু মিয়া।

বিকেলে অর্থমন্ত্রী এই কেসের ব্যাপারে কতিপয় দিক নির্দেশনা দিলেন। ওল্ড কাস্টম হাউসে যতদিন প্রয়োজন ততদিন পুলিশ ও নেভীকে সশস্ত্র প্রহরা অব্যাহত রাখতে বললেন। কেসের তদন্তভার ডাবলমুরিং থানার পরিবর্তে জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করতে বললেন, যাতে ঘটনার মূল নায়কদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা যায়। আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের এ কেসের সফল পরিসমাপ্তির জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার নির্দেশ দিলেন। পরদিন ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। চট্টগ্রামে, বিশেষ করে কালুরঘাটের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মসূচীতে যোগ দিবেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে রাজনৈতিক দলসমূহ ২৭শে মার্চ সদরঘাট স্টীমার ঘাটে একজন সভা অনুষ্ঠিত করে এই কেসে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রকাশ করে । অনেকদিন সশস্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল থাকে। ২৭শে মার্চ পণ্য আটক কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে ডিভিশনাল অফিসের হলঘরে সাময়িকভাবে জমাকৃত ১০০ টনের অধিক পণ্য কাস্টম হাউসের স্টেট ওয়্যার হাউসে স্থানান্তর করতে ২০টি ট্রাক ভাড়া করতে হয়েছিল।

জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তদন্ত কাজ শেষ করে চার্জ শীট দাখিল করলে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে কেসের শুনানী শুরু হয় এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর বিচারাদেশ প্রদান করা হয়। এ কেসের ১ নম্বর সাক্ষী হিসেবে আমাকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে পণ্য আটক, অভিযুক্ত নাবিকদের গ্রেপ্তার ও পণ্য আটকের সফল পরিসমাপ্তি সহ সকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হয়, আটককৃত অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে হয় এবং অভিযুক্ত আসামীদের আইনজীবীদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়। কেসের মূল আসামী মানু বাবু ওরফে মানিক চৌধুরী ওরফে ভূপতি ভূষণ চৌধুরীসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের সংশ্লিষ্টতা মামলার তদন্ত পর্যায়ে উদঘাটিত হয়। বিচারে ১৯৬৯ সালের কাস্টমস এ্যাক্টের ১৪৬(১) ও (৮) এবং (৮৯) ধারাবলে অভিযুক্ত সিরাজুল ইসলাম ওরফে ছেরু মিয়া, মানিক চৌধুরী ওরফে ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ও দুলাল চন্দ্র ধর প্রত্যেককে ছয় বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেকের উপর আড়াই কোটি টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হয় ও অনাদায়ে দেড় বছর সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করার আদেশ প্রদত্ত হয়। অন্যান্য আটজন অভিযুক্তদের প্রত্যেককে দুই বছর সশ্রম কারাদন্ড, পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ড ও অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনজনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

'ম্যান ছেরু মিয়া' চোরাচালান কেসকে জড়িয়ে অন্য একটি গুরুতর অভিযোগ আমাকে মোকাবেলা করতে হয় ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে। দেশে তখন সামরিক শাসনের এক কঠিন দুর্দিন চলছে। আমাকে তলব করা হয়েছে আবদুল গণি রোডের লাল বিল্ডিংখ্যাত এক বিশেষ সামরিক তদন্ত সেলে। সেখানে উপস্থিত হলে তদন্ত কর্মকর্তা একজন মেজর জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন করেন যে ম্যান ছেরু মিয়া কেসে আটক পণ্য ছেড়ে দেয়ার জন্য অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। এ অভিযোগের পক্ষে আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। আমাকে আরো বলা হল, এ কেসে সাক্ষ্য দেয়া না হলে আমাকেই এই বলে ফাঁসানো হবে যে এই আটক পণ্য ছেড়ে দেয়ার সুবিধার জন্য অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে আমিই চট্টগ্রামে ডেকে নিয়েছিলাম। এমন উদ্ভট অলীক মিথ্যা অভিযোগ শুনে একদিকে যেমন বিস্ময়াহত হয়েছি অন্যদিকে তেমনি ভীতও হয়েছি। কিন্তু অভিযোগটি যে মোটেই সত্য নয়, মিথ্যা ও বানোয়াট সেটা বলতে দৃঢ়চিত্তে সাহস সঞ্চয় করলাম। মনে করলাম চিত্ত যদি ভয়শূণ্য হয়, শির সেখানে উচ্চ হবেই। আমি কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আমার অপারগতার কথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই জানালাম।

ঘটনার পূর্বাপর বিবৃত করার পর প্রত্যুৎপন্নমতি তদন্তকারী মেজর সাহেব সেটা অনুধাবন করলেন বলে মনে হল। কেননা, এ কেসের ব্যাপারে আমার আর কোন তলব পড়েনি। জনাব তাজউদ্দিনসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতিদের বিরুদ্ধে আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যেসব বানোয়াট কল্প কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল পাকিপন্থী অন্ধকারের বাসিন্দারা তা দিনের আলো দেখতে পায়নি বলেই কি অরক্ষিত বাসভবন এবং সুরক্ষিত কারাকক্ষের অন্ধকারকে বেছে নিয়ে ঘাতক তার আক্রোশ মিটিয়েছিল ১৯৭৫ সালের পনোরোই আগস্টে এবং তেসরা নভেম্বরে?

এই ঘটনাটি পরে বেগম জোহরা তাজউদ্দিন সেই সামরিক কর্মকর্তার কাছে জানতে পারেন। যখন আমি ১৯৯১ সালে "কিংবদন্তীর ম্যান ছেরু মিয়া" নামের বইটি লিখি তখন বিষয়টির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে খোঁজ করেন বলে জানতে পারি। আমার কলেজ সহপাঠী বন্ধু দৈনিক সংবাদ এর সম্পাদক বজলুর রহমান তাঁর সহধর্মিনী মতিয়া চৌধুরীর (বর্তমানে কৃষিমন্ত্রী) কাছে জানতে পেরে আমাকে অবহিত করেন। কয়েক বছর আগে ২০০৩ সালে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদের কন্যা সিমিন হোসেন রিমির লিখিত গ্রন্থ 'আমার বাবা তাজউদ্দিন' প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে বজলুর রহমান আমাকে সেখানে নিয়ে গেলে বেগম জোহরা তাজউদ্দিন ও সিমিন হোসেন রিমির সাথে আমার দেখা হয়। আমাকে তারা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইলে আমি বলি, আমি আমার কর্তব্যবোধ থেকে যা করেছি সেজন্য ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা কোনটাই আমার প্রাপ্য নয়। বিষয়টি সিমিন হোসেন রিমির লিখিত বইয়েও উল্লেখ রয়েছে। এই ঘটনাটি বিশদ আকারে স্থান পায় ইতিহাসবিদ জনাব সিরাজউদ্দিন আহমেদের লেখা 'প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ' গ্রন্থে।

"ম্যান ছেরু মিয়া" কেসে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ সম্বলিত পত্র কালেক্টরেট অফিসে প্রেরণ করে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বদলী হয়ে আসলে সুপারিশ অনুসারে পুরস্কার মঞ্জুরী ও বিতরণের বিষয়টি দীর্ঘসূত্রিতার কবলে পড়ে গেলে বোর্ডের হস্তক্ষেপে বিষয়টি সুরাহা হয়। আমাকে পুরস্কারের আওতায় আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থ বিভাগের আপত্তির কারণে চেয়ারম্যান কে.এম.এম. হোসাইন সাহেবের মত সচিবও ব্যর্থ হন। কারণ, পাকিস্তান আমলে করা পুরস্কার বিধিমালায় ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তারা কোন কাজের জন্য আর্থিক পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না, সেটা যতই কৃতিত্বপূর্ণ হোক না কেন। আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা না হলেও এ কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সরকার আমাকে যে Letter of Commendation ইংরেজী ভাষায় প্রদান করে তাতে বলা হয়, "দেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর উত্তাল সময়ে জনাব আবদুল লতিফ সিকদার তার রুটিন দায়িত্বের উর্ধ্বে উঠে একদল নিরস্ত্র লোকবল নিয়ে কেবল উদ্দীপনামন্ত্রে দীপ্ত হয়ে "ম্যান ছেরু মিয়া" কিংবদন্তীখ্যাত কেসে যেভাবে একটি সফল অভিযান সংগঠিত ও পরিচালনা করে সকল ভয়ভীতি ও প্রলোভন উপেক্ষা করে কৃতিত্বপূর্ণ পরিসমাপ্ত করেন তা তার নির্ভীকচিত্ততা, নেতৃত্ব, পরম কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সততার স্পষ্ট পরিচায়ক।" আমি এই সনদপত্রকে লক্ষ টাকা পুরস্কারের চাইতেও শ্রেয়তর বলে গণ্য করি।

লেখক
আবদুল লতিফ সিকদার
অবসরপ্রাপ্ত সদস্য
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

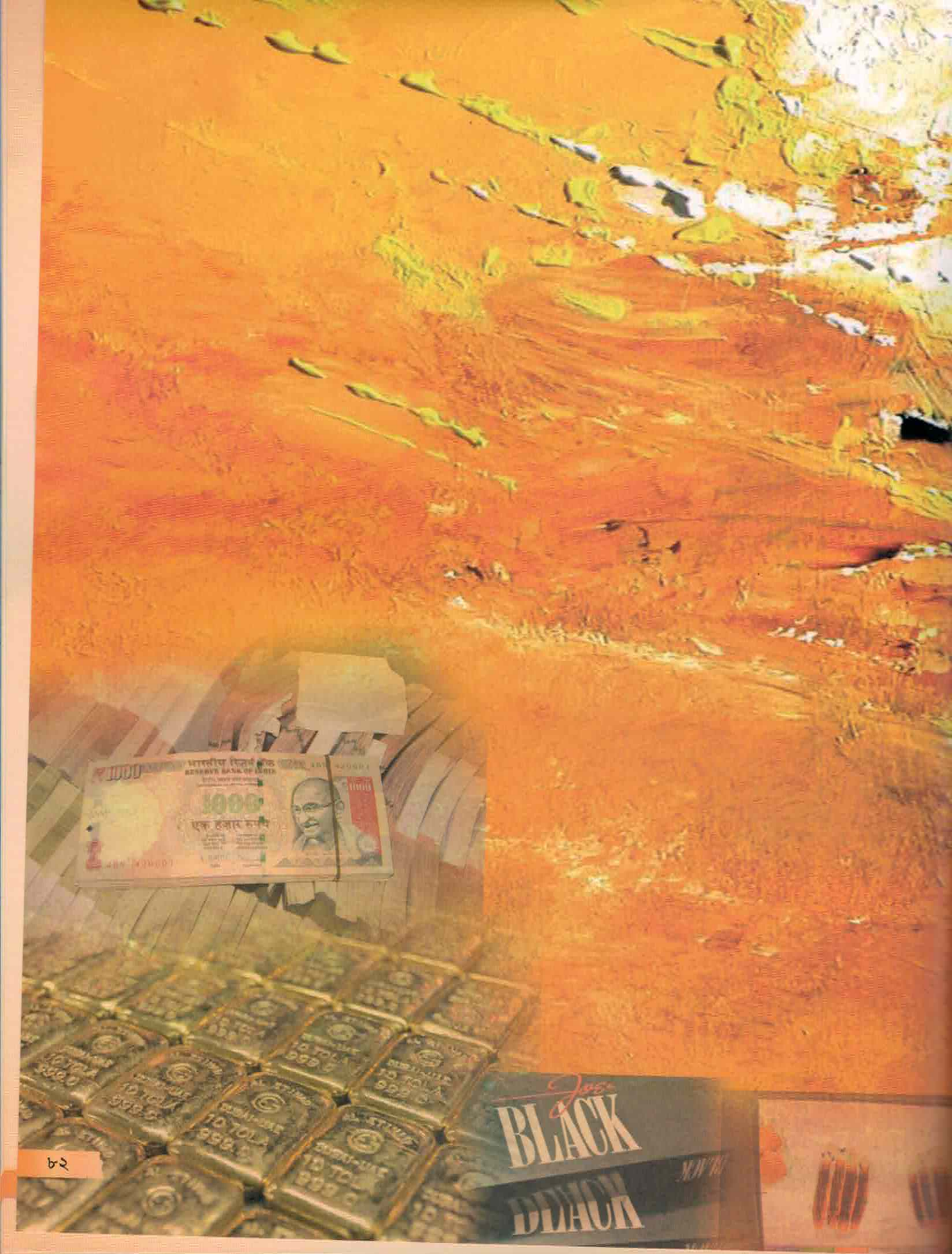
BLACK
BLACK

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, চোরাচালান এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ

হায়াৎ সাইফ

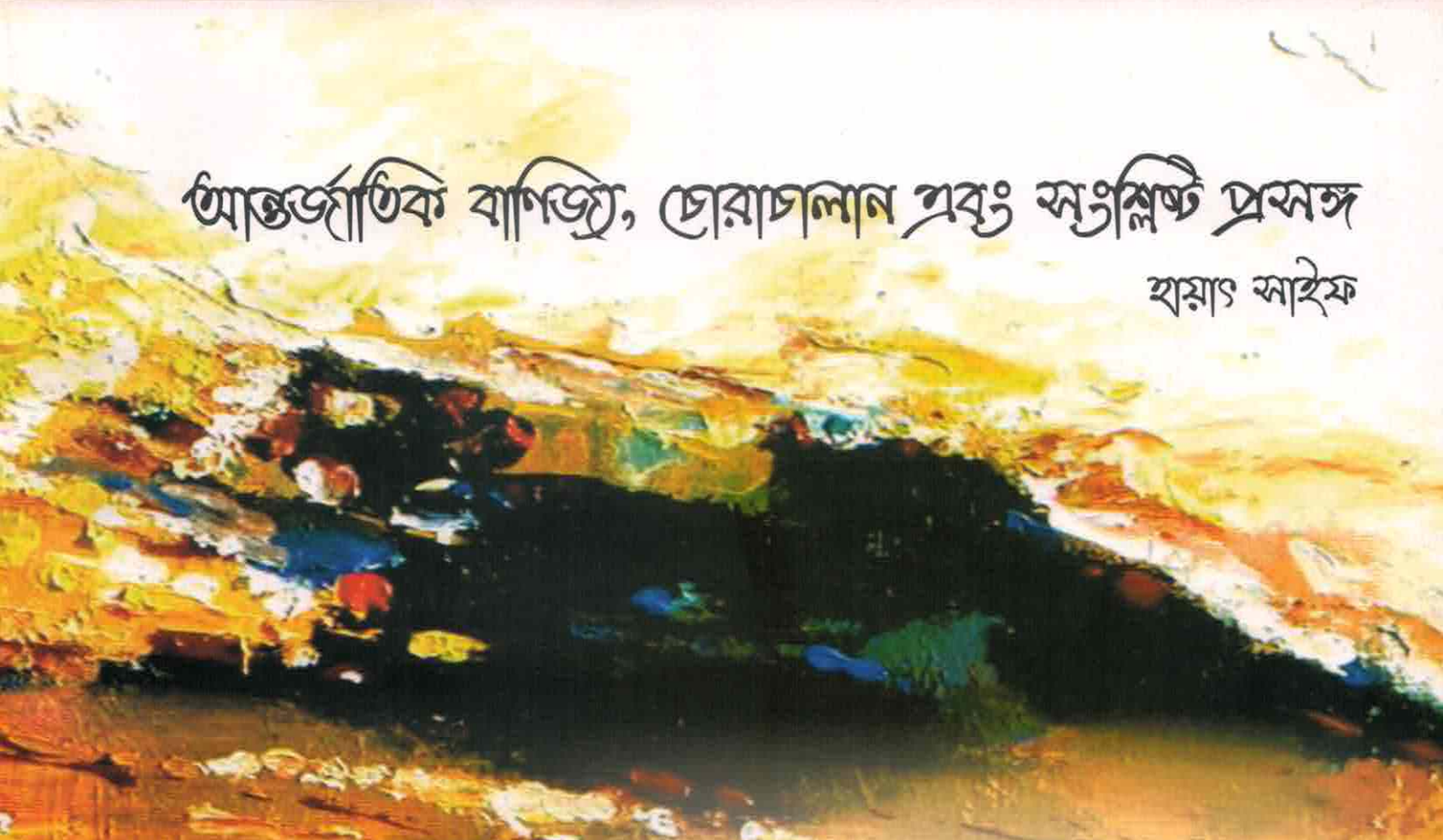

বিভিন্ন প্রসঙ্গে চোরাচালান কথাটা প্রায়শ শোনা যায়। পত্র-পত্রিকায় মাঝে-মধ্যে বেশ রোমাঞ্চকর চোরাচালানের ঘটনা উন্মোচনের সংবাদও পরিবেশিত হয়। এই উন্মোচনে বাস্তবক্ষেত্রে যেমন ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি কল্পনায় সাধারণের মনে এসম্পর্কে বেশ একটা গোয়েন্দা কাহিনীর আবহও বিদ্যমান। কিন্তু আসলে চোরাচালান বলতে আমরা কী বুঝি? কথাটার সঠিক অর্থ কী? ইংরেজি 'স্মাগলিং' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবেই সাধারণত চোরাচালান কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো লুকিয়ে বা কোনো প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে দেশের ভেতরে বা বাইরে কোনো কিছু পাচার করা। খাঁটি দেশি শব্দে চোরাচালান বা স্মাগলিংয়ের একমাত্র প্রতিশব্দ যতদূর সম্ভব সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত 'বোংগা' কথাটি। সিলেটের সীমান্ত এলাকায় এ শব্দটির ব্যবহার অহরহ শোনা যায়। এর অন্য কোনো আঞ্চলিক প্রতিশব্দ আছে বলে আমাদের জানা নেই। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের বিবর্তনের যে পর্যায়ে শুল্ক প্রয়োগ করা হয়েছিলো সে সময় থেকেই স্মাগলিং বা চোরাচালান চলে আসছে এবং সম্ভবত ততোদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে যতোদিন অর্থকরীভাবে তা লাভজনক থাকবে। এক অর্থে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চাহিদা ও যোগানের সঙ্গে এই ক্রিয়াকলাপ গভীরভাবে সম্পর্কিত। কোনো দেশে কোনো বিশেষ পণ্যের প্রকৃত চাহিদা থাকলে এবং স্বাভাবিকভাবে তা আমদানিতে কোনো অন্তরায় থাকলে সে পণ্যটির যোগান অননুমোদিত পথে হবে। কোনো দেশই তাই এই অননুমোদিত আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে এখনো সক্ষম হয়নি।

লক্ষ্য করা গেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে সিল্ক, কফি এবং তামাক বিপুলভাবে চোরাচালান হতো যাতে করে চোরাচালানকৃত মাল বৈধভাবে আমদানিকৃত মালের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বাজারে প্রচলিত ছিলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন উপনিবেশ দেশকেই বাণিজ্য করতে হলে বৃটেনের মাধ্যমে করতে হতো। কিন্তু সেই তেজারতি নীতি আমেরিকান উপনিবেশে সাংঘাতিকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিলো। ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কমপক্ষে ৪০টি সমুদ্রগামী বাণিজ্য পোত নিয়মিতভাবে দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে চোরাচালানে লিপ্ত ছিলো। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে চীন সরকার আফিম চোরাচালান বন্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই সেদিন ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ সাল- এই ১৩ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদ বিক্রয়ের ওপর বিধিনিষেধের ফলে সে দেশ তার দীর্ঘ উপকূল জুড়ে মারাত্মক চোরাচালান কর্মতৎপরতার সম্মুখীন হয়। সে সময় পুরো মার্কিন-কানাডা সীমান্ত জুড়ে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করা হতো এখন যেমন মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমান মাদকদ্রব্য পাচার হয়। চোরাচালানের কৌশল মৌলিকভাবে একই। একদেশে থেকে আরেক দেশে আইনপ্রয়োগকারীর চক্ষু এড়িয়ে পণ্যদ্রব্য পাচার করা বন্দরে বা সীমান্তে আগত বিভিন্ন নৌযান ও স্থলযানের বিভিন্ন অংশে বা যাত্রীর মালামাল এবং বৈধভাবে আনীত মালের সঙ্গে অবৈধ পণ্য লুকিয়ে রেখে অথবা মানুষের শরীরের মাধ্যমে লুকিয়ে মূল্যবান দ্রব্যাদি পাচার করাকেও চোরাচালানীরা তাদের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে 'স্মাগলিং' বা চোরাচালান একটি অর্থকরী কাজ এবং এর ইতিহাস দীর্ঘ। প্রাক মধ্যযুগে যখন বৈদেশিক বাণিজ্য ধীরে-ধীরে প্রসার লাভ করছিল তখন থেকেই এধরনের ক্রিয়া কলাপের উৎপত্তি। অদ্ভুত হলেও এবং নেতিবাচক অর্থে হলেও ইউরোপের রেনেসাঁ যুগেই একটি অর্গানাইজড্ ক্রাইম হিসেবে এর উৎপত্তি ঘটেছিলো। প্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে যখন ইউরোপে মূল্যবান সিল্ক ও বিভিন্ন প্রকারের মসলা রপ্তানি শুরু হলো তখন থেকেই লুকিয়ে-ছাপিয়ে পণ্য পাচারের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কেননা, পণ্য বন্দরে পৌঁছুলেই রাজাকে তার অংশ প্রদান করতে হতো শুল্ক হিসেবে। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলেও দেখা যায় যে মধ্যযুগেও আমাদের বেশ কয়েকটি বর্ধিষ্ণু বন্দর ছিলো এবং শুল্ক সংগ্রহের জন্যে 'শুল্কামাত্য' বলে অভিহিত একটি পদেরও অস্তিত্ব ছিলো। যখন সমুদ্রপথে বিভিন্ন নতুন দেশ আবিষ্কারের হিড়িক চলতে থাকে ইউরোপে বিশেষত স্পেন ও ইংল্যান্ডে তখন নিত্যনতুন পণ্যদ্রব্য ও অনেক সময় জলদস্যুতামূলক কার্যকলাপে প্রাপ্ত রত্নাদি নিয়ে একেকটি জাহাজ ভিড়তে থাকে স্বদেশের বন্দরে। সে সময় থেকেই এ সমস্ত আনীত রত্নভান্ডার থেকে রাজার প্রাপ্য অংশ রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এই রাজস্বই বিভিন্নরূপে বিবর্তিত হতে হতে কাস্টমস ডিউটি বা শুল্কে পরিণত হয়েছে এবং তখন থেকেই ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাও বিদ্যমান রয়েছে। কেবলমাত্র স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে এর চরিত্র প্রকার ও মান পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র।

প্রাচীনকালে এমনকি এই স্বল্পকাল আগেও দেশের বড় বড় শহর বা রাজধানী সামরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে উঁচু প্রাচীর বা দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকতো; এবং পণ্য সম্ভারের কাফেলা সেখানে পৌঁছুলে নগরের প্রবেশ ফটকে শুল্ক সংগ্রহ করে হিসেব রাখা হতো। বর্তমান যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিপুল প্রসার, অর্থনৈতিক জটিলতার বৃদ্ধি ও প্রকৌশলগত অভাবনীয় অগ্রগতির সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আজকে প্রয়োজন পড়েছে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের এবং তার ফলে কোন কোন বিশেষ ধরনের মালামালের আমদানি-রপ্তানির ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের। যুক্তরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও স্বাধীন বাজারের প্রধান উদ্যোক্তা দেশও কোন না কোনভাবে নিজের দেশে প্রস্তুত পণ্যকে 'প্রোটেকশন' দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের কোটা আরোপ করা হয়, সংকলিত হয় অ্যান্টি ডাম্পিং আইন। এ সমস্ত কারণে চোরাচালান সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপও ধীরে ধীরে বেশ জটিল ও অনেক সময় খুবই সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। অতএব আজকের দিনে এ ধরনের কার্যকলাপ উদ্‌ঘাটনেও দরকার গভীর ও বিস্তৃত প্রশিক্ষণের ও বিভিন্ন আধুনিক টেকনিক বা কলাকৌশল রপ্ত করবার। বলাবাহুল্য এ ধরনের কাজ বিশেষজ্ঞ দ্বারাই করা সম্ভব।

একটি সংজ্ঞা

বিভিন্ন দেশের কাস্টমস এ্যাক্টে বা শুল্ক আইনে 'স্মাগলিং' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রথমে ১৮৭৮ সালের শুল্ক আইনে শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে শুল্ক আইনের ২ নং ধারায় শব্দটিকে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মৌলিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে লুক্কায়িতভাবে অননুমোদিত পথে মালামাল স্থানান্তরিত করা যার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো শুল্ক কর ফাঁকি দেয়া এবং আমদানি-রপ্তানি বিধিমালা লঙ্ঘন করা। সাধারণত অত্যন্ত উচ্চহারে যে সমস্ত দেশে শুল্ক প্রয়োগ করা হয় এবং যেখানে আমদানি-রফতানির ওপর বিধিনিষেধের আরোপ যতো প্রবল সে সমস্ত দেশে চোরাচালান ও চোরাচালান সম্পর্কিত কার্যক্রম ততোবেশি সচল। যে কোন শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞাপিত পথ বা শুল্ক ষ্টেশনের মাধ্যমে না এনে অন্যভাবে লুকিয়ে নিয়ে আসা বা নিয়ে যাওয়াও চোরাচালানের অর্ন্তগত। কেবল পাচার করাটাই চোরাচালান নয়। পাচার করার উদ্যোগ নেয়া বা পাচারকারীকে রক্ষা করাও এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। সামান্য হেরফের করে মোটামুটি এই সংজ্ঞাই বর্তমানকালে সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রের আইনে বর্ণিত হয়েছে।

চোরাচালান কেন হয়?

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেশে অনেক নিত্য ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য তৈরি হয় না। এখন সেগুলো যদি বৈদেশিক মুদ্রা খরচ না করে আমাদের দেশের বাজারে এসেই পড়ে তাতে ক্ষতিটা কোথায়? আরেকটি ধারণা হতে পারে এই যে, বিদেশি পণ্যের সঙ্গে আমাদের একই ধরনের পণ্য পাশাপাশি থাকলে ভোক্তারা উন্নতমানের বৈদেশিক পণ্যদ্রব্যের দিকে আকৃষ্ট হবেন। ফলে আমাদের শিল্পে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আসবে এবং উৎকৃষ্টমানের মালামাল দেশে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পাবে। দু'টো মতই একেবারে ভ্রান্ত। কেননা যে নিষিদ্ধ দ্রব্যটি আমদানি হলো বাজারে এবং চোরাপথে তা কি এমনিতেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে? বাইরে থেকে যাঁরা এদেশে পণ্যদ্রব্য পাচার করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে যাঁরা এসব ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকেন তাঁরা কাজটা করেন এজন্যে যে, এই অবৈধ ব্যবসায়ে লভ্যাংশ অনেক বেশি এবং বাজারে যে বেশি দামে নিষিদ্ধ দ্রব্যটি আপনি ক্রয় করলেন সেই মূল্যের একটি বিরাট অংশ দিতে হয়েছে জনগণকে এবং তা হয় বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা হয়তো আমাদের এমন প্রয়োজনীয় পণ্যের বিনিময়ে যা আমাদের জন্যে অপরিহার্য, যে পণ্যের বিনিময়ে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতাম কিংবা যে পণ্য প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়েই আমদানিকৃত হয়েছিলো। অপরদিকে এই কারবারকে চালু রাখার জন্যে বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাসমান অনিয়ন্ত্রিত বাজার দেশের ভেতর পুষ্টিলাভ করছে। সে বাজারে আপনার মুদ্রার বিনিময়মূল্য যাচ্ছে শনৈ শনৈ কমে। অপরদিকে এমন প্রতিযোগিতায় আপনার নিজের দেশের পণ্যদ্রব্য টিকতে পারছে না বাজারে। এর সামগ্রিক পরিণতি হলো মুদ্রাস্ফীতি, টাকার মূল্যমানের অধোগতি এবং নিজের শিল্পের বিনষ্টি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া-- যদি বিপুল পরিমাণে চোরাচালান চলতে থাকে-- অর্থনীতিকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়া।

চোরাচালান দন্ডনীয় কেন?

চোরাচালানের একটি প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, এতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে সরকার তথা রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ তদনুপাতে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ফলে আমরা যতোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নেই না কেন তা কিছুটা ব্যাহত হবেই। তবে তা কতোখানি হবে তা নির্ভর করছে চোরাচালানের গতি-প্রকৃতি ও বিস্তৃতির ওপর। এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে পরিসংখ্যান দেয়া প্রায় অসম্ভব। তবে উদ্‌ঘাটিত তথ্য ও আটককৃত পণ্যসামগ্রীর মোট মূল্যায়ন থেকে তা কিছুটা অনুমান করা চলে। বলাবাহুল্য যে কোনো দেশেই প্রকৃত চোরাচালানের সামান্য অংশই ধরা সম্ভব হয়। তবে এ সম্পর্কে সবাই সচেতন হয়ে উঠলে ও চোরাচালাননিরোধ সংস্থাগুলোকে জোরদার করে তুললে এ প্রবণতাকে যথেষ্ট কমিয়ে আনা যায়।

শুল্ক ও কর ফাঁকি দেবার ফলে কেলমাত্র যে রাজস্বই পাওয়া যাচ্ছে না তাই নয়। শুল্ক ও কর আরোপ করে পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হয় তাও সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছে। বলা বাহুল্য এর প্রতিক্রিয়া অর্থনীতির উপর ভয়াবহ হতে পারে। এবং এ কারণেই পৃথিবীর সর্বত্রই চোরাচালান একটি দন্ডনীয় অপরাধ। দেশের অর্থনৈতিক চেহারাই সে দেশের চোরাচালানের চরিত্র নির্ধারণ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশে চোরাচালানের প্রধান পণ্য হচ্ছে 'হিরোইন' 'কোকেইন' বা 'ক্যানাবিসের' মতো মাদকদ্রব্য। সেখানে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের স্থিতিশীল বাজারে সেগুলোর চোরাচালান যথেষ্ট লাভজনক নয়। সেখানে তরুণেরা সমৃদ্ধির রোগে ভুগছেন। অপরপক্ষে আমাদের দেশে যে কোনো পণ্যদ্রব্যই চোরাচালানকারীর বিষয় হতে পারে। বিশেষত সেই সমস্ত পণ্য যার কোন-কোন শ্রেনীর মানুষের জন্যে বেশ একটা বড় রকমের চাহিদা রয়েছে, যা সহজে এবং স্বল্প সময়ে বিক্রিত হয়ে যায় কাপড়-চোপড়, সিগারেট, মদ, শাড়ি, কসমেটিকস, ইলেকট্রনিক্স, ঘড়ি ইত্যাদি।

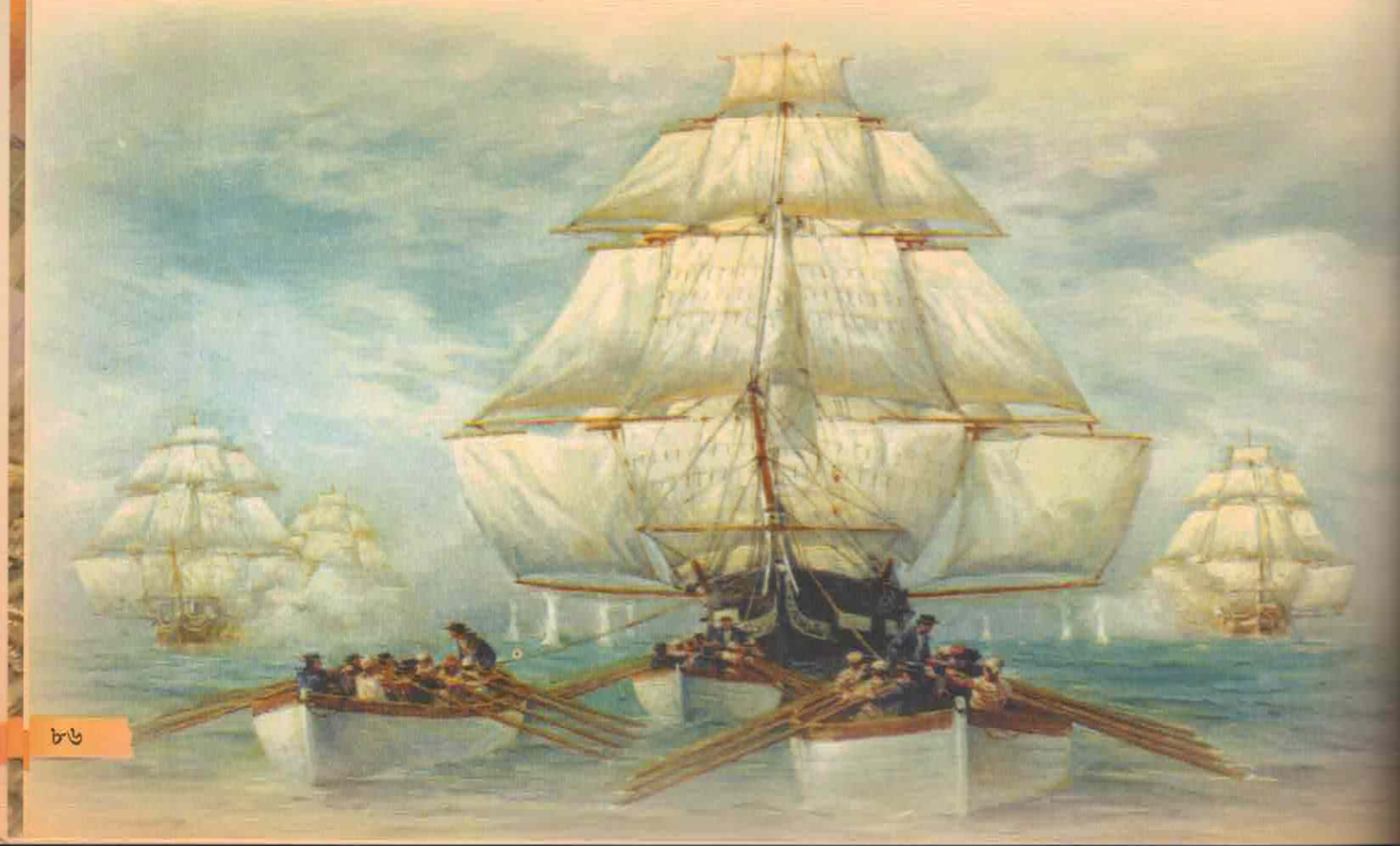

১৯৮৩ সালের জন্যে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জেরার্দ দেব্রো মূলত মূল্যের তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর তত্ত্বে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে একটি অবাধ, স্বাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে বাজারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এমন একটি অবস্থা সৃষ্ট হবে যখন চাহিদা ও যোগান পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিরাজ করবে। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান হবে সম্পূর্নভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থনীতিবিদেরা অবশ্য বরাবরই জানতেন যে একটি বিশেষ বা সীমিত বাজারে যোগান চাহিদার সমান হতে পারে। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ অর্থনীতিতে যে এমন ভারসাম্য, অন্ততপক্ষে তাত্ত্বিকভাবেও, আসা সম্ভব তা তাঁর আগে কেউ ভাবেননি। যদি পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি সুষম একটি বাজার তৈরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর চোরাচালান লাভজনক থাকবে না। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে হলেও এমন পরিস্থিতি-অন্তত তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, কোনোকালে যে আসবে এমন ভাবার কোনো সংগত কারণ নেই। বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে এমন পরিস্থিতি এখনও আসেনি। আর এ কারণেই সে সমস্ত দেশে এখন চোরাচালানের সম্পূর্ণ উচ্ছেদও সম্ভব হয়নি। সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়তো সম্ভব নয়, তবে নিশ্চিতভাবেই এই ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপকে একটি সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব। আর পৃথিবীর সব দেশেই তাই কাস্টমস ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী বিভাগের লক্ষ্য হচ্ছে এ প্রবণতাকে যতোদূর সম্ভব কমিয়ে আনা। আমাদের এই অঞ্চলে সার্কের আওতায় খুব সহজেই এবং সার্কের নীতিমালার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা রেখেই কাস্টমস ইউনিয়নের কথা ভাবা যেতে পারে। প্রশাসনিক পর্যায়ে কৌশল ও পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যায় এবং তার ফলে পারস্পরিক স্বার্থে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করাও সম্ভব হবে।

বন্দর এলাকা ও চোরাচালান

যে কোনো বন্দর এলাকাতেই বিভিন্নভাবে চোরাচালানকারীরা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম দেশের প্রধান বন্দর বলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিদেশি জাহাজ এই বন্দরে ভিড়ে। এছাড়া আমাদের নিজেদের জাহাজগুলোরও প্রধান কেন্দ্রস্থল এই বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা ও তৎসন্নিহিত গ্রামাঞ্চল সমুদ্রপথে চোরাচালানের একটি অন্যতম প্রধান এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। পরবর্তীকালে ধীরে-ধীরে বন্দরের গুরুত্ব ও কর্মকান্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোরাচালানের গতি ও প্রকৃতিও ধীরে-ধীরে বদলে গেছে। জাহাজ বহির্নোঙ্গরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সব সময় সেগুলো সরাসরি জেটিগুলোতে এসে ভিড়তে পারে না। যখন বন্দরে বেশি সংখ্যক জাহাজ থাকে তখন বর্হিনোঙ্গরে দীর্ঘসময় জাহাজকে অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া বড় বড় বাল্‌কার ধরনের জাহাজকে এসে বহির্নোঙ্গরেই থাকতে হয়। নদীর গভীরতার অভাবে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। এই বহির্নোঙ্গরই চোরাচালানীদের তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রস্থল। বহির্নোঙ্গর এলাকাতেও প্রবেশের পূর্বাহ্নেও অনেক ক্ষেত্রে সমুদ্রে জাহাজের গতি কমিয়ে সাম্পানে অবৈধ মাল পাচার হয়ে থাকে। এ সমস্ত কাজে যথেষ্ট দুঃসাহসিকতারও প্রয়োজন। যে সমস্ত এলাকার লোকেরা এ দরনের কাজে লিপ্ত থাকে তারা বহুকাল হলো জাহাজের কাজের সঙ্গেও জড়িত। অনেকে একসময় জাহাজে কাজ করতো।

আবার অনেকের আত্মীয়স্বজন এখনও বিভিন্ন জাহাজে কাজ করেন। এর মধ্যে অনেক বৈদেশিক জাহাজও রয়েছে। এদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র থাকায় চোরাচালান কাজ তারা সুষ্ঠুভাবে করার সুযোগ পান। গভীর সমুদ্রে অনেক সময় মোটা রশি ছুঁড়ে জাহাজের গা বেয়ে এরা উঠতে পারে। বহির্নোঙ্গরের বিপুল ঢেউয়ের মধ্যে এ কাজটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। লেনদেন স্বাভাবিকভাবেই বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পাদিত হয়। কেননা জাহাজের ক্রুদের কাছে আমাদের টাকার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। আর মূল অর্থে যোগান দেন যাঁরা তারা থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। বহির্নোঙ্গর থেকে মূল বন্দরে প্রবেশ করার পথে কর্ণফুলির উভয় তীরে যথেষ্ট ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল রয়েছে। চোরাচালানকারীরা এ অঞ্চলগুলোকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। অনেকে পুরুষানুক্রমে এ অঞ্চলেরই অধিবাসী। কিন্তু এ ধরনের অপরাধীরা যখন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলকে মালামাল পাচারের জন্যে ব্যবহার করে তখন তাদের তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করে ধরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব কেননা পথে তারা যে কোনো ঘর-বাড়ি বা দোকান-পাটকে তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে যথার্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ ব্যতিরেকে কোনো বিশেষ চোরাচালান তৎপরতা বানচাল করা প্রায়

অসম্ভব। কেননা একটি ঘনবসতিপূর্ণ আধা গ্রামাঞ্চলে এমন কাউকে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার মতোই অসার হতে পারে। কাজেই শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত বিভাগ বা শুল্ক ভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে গোপন সংবাদ সরবরাহকারীদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়; এবং এ জাতীয় লোক সাধারণত বড়ই পিচ্ছিল। এদের অনেক সময় সঠিক ঠিকানা থাকে না, তারা সদাসঞ্চারণশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরাও অপরাধের সমান অংশীদার। কোনো কারণে দলে ভাঙন ধরলে বা বখরা ঠিক না মিললে তারা প্রতিশোধের জন্যে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। আবার অনেক সময় অর্থের লোভেও সংবাদ পাওয়া যায়। এদেরকে ব্যবহার করতেই হয়। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে বা শুল্ক গোয়েন্দাকে এক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। উপস্থিত বুদ্ধির সঙ্গে বিপুল ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় অনবরত।

কর্ণফুলির দু'তীরে বন্দরের দু'দিকের একদিকে রয়েছে পতেঙ্গা অঞ্চল ও অপরটি আনোয়ারা থানা। যেখানে জুলদিয়া গ্রামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই আনোয়ারা থানা অঞ্চলটির কুখ্যাতি বহুকালের। বিভিন্ন সময়ে এ এলাকার বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা চালিয়ে অতীতেও চোরাচালানের ঘটনা ধরা পড়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলে ও পতেঙ্গা অঞ্চলের কাঠগড় এলাকাকে মাল পাচারের অন্তবর্তী স্থান হিসেবেই প্রধানত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ জাহাজ থেকে মাল হস্তগত হওয়ার পর এ সমস্ত জায়গায় লুকিয়ে রেখে পরে সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ছাড়া ছোট ছোট জাহাজ বা ট্রলারে করে বিরাট ধরনের চোরাচালানের ঘটনাও যথেষ্ট ঘটছে সাম্প্রতিককালে। অর্থাৎ চোরাচালানকারীরা ধীরে ধীরে এদেশে একটা সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এছাড়া সুন্দরবন এলাকা ও মংলা বন্দরের প্রবেশ পথেও চোরাচালানকারীদের বিপুল সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু যেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে মাল নিষ্পত্তি করা যায় এমন নিকটবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের অভাব রয়েছে কাজেই বড় ধরনের চোরাচালানকারীদের দ্বারা তেমন লাভজনকভাবে এখনও এঅঞ্চল ব্যবহৃত হতে পারেনি।

চোরাচালানের গতি ও প্রকৃতি

চোরাচালান প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে । এক হলো অবৈধ মালামাল সরাসরি জাহাজ থেকে চোরাপথে পাচার করে নিয়ে আসা। কিন্তু রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার আরেকটি সূক্ষ্ম উপায় হলো মালামালের সঠিক বর্ণনা না দিয়ে বৈধভাবে আমদানিকৃত মালের চরিত্র অবৈধ মালের ওপর আরোপ করা। এই দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বনের জন্যে রীতিমতো সুক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি যেমন খাটাতে হয়, এগুলো উদঘাটন করাও তেমনি পরিশ্রমসাপেক্ষ। তাতে আমদানি রপ্তানি ও কাস্টমসের সুক্ষ্ম ক্লাসিফিকেশন ও ভ্যালুয়েশন ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। এগুলোকে সাধারণত 'মিসডিক্লারেশনের' কেস বলে অভিহিত করা হয়। কাস্টমসের আর্ন্তজাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের শুল্ক ফাঁকি ও বৃহত্তর অর্থে স্মাগলিং এরই অর্ন্তগত। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন অনবরত

সঠিক প্রশিক্ষণ ও প্রায়োগিক বিষয়াদি সম্পর্কে শুল্ক কর্মচারীদের অতি গভীরভাবে ওয়াকিবহাল করে তোলা।
এ ধরনের মিসডিক্লারেশনের কেসও অহরহই বন্দরে ও স্থল শুল্ক কেন্দ্রে উদঘাটিত হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ওয়েজআর্নারস্কীমে বিভিন্ন ধরনের মালামাল আমদানির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় মিসডিক্লারেশনের সুযোগ কমলেও অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সঠিক ঠিকানায় কোনো আমদানিকারককে আর পাওয়া যায় না। ভূঁইফোড় আমদানিকারকদের আমদানিতে অত্যন্ত দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা একবারে এক জিনিস আমদানি করেন বলে তার পরবর্তীকালে কোন হদিস থাকে না। তিনি অনেক সময়েই ঝুঁকি নিয়ে মিসডিক্লারেশন করে থাকেন। শুল্ক মূল্যায়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট পরবর্তী অনুসন্ধানে আর তাকে পাওয়া যায় না। এরকম একটি পরিস্থিতি বিরাজ করায় মূল্যায়ন সম্পর্কে সঠিক তথ্য কেবলমাএ রপ্তানিকারী দেশ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। অথচ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোতে বর্তমানে আমাদের প্রয়োজনীয় শুল্ক মূল্যায়ন তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। কাস্টমস মূল্যায়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সেখানে আজ পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়নি।

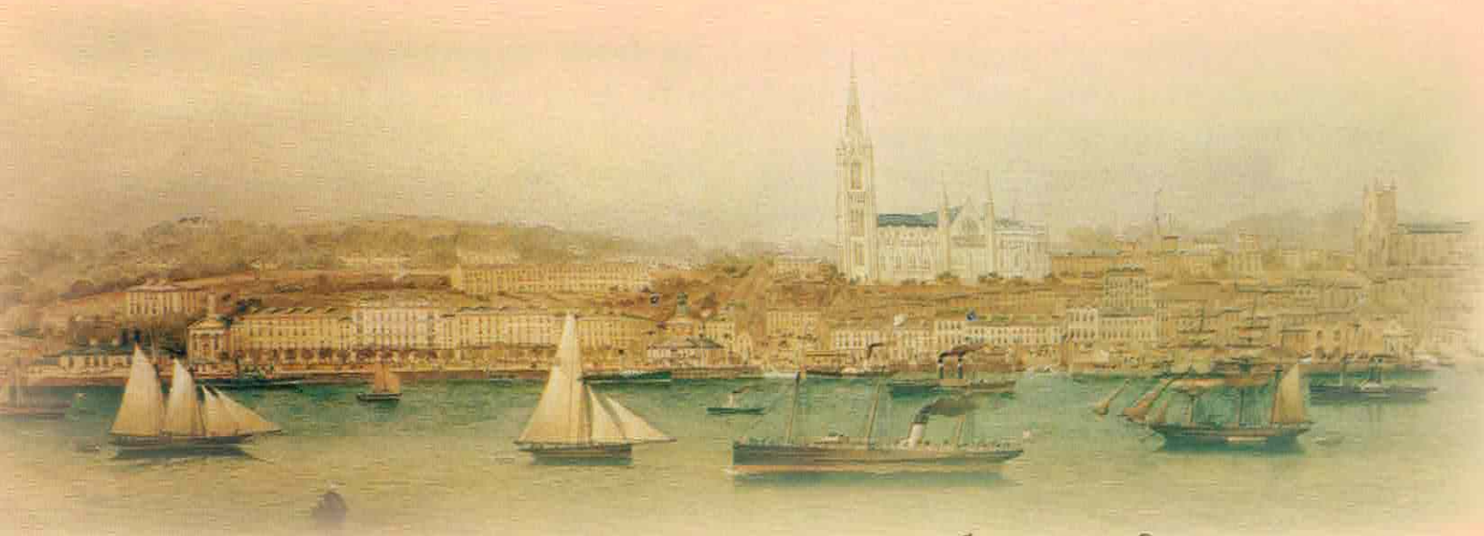

গোড়াতেই উল্লিখিত হয়েছে যে এটি এমন একটি অপরাধমূলক তৎপরতা যার সঠিক ও বাস্তব পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক সংস্থার তৎপরতা থেকে চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কার্যক্রম থেকে এবং দেশের বিভিন্ন বিপণি কেন্দ্রের পণ্যের চরিত্র থেকে আমরা মোটামুটিভাবে দেশে চোরাচালানের গতি-প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। সাম্প্রতিককালের চোরাচালান নিরোধ কর্মতৎপরতা থেকে দেখা যায় যে কী বিপুল পরিমাণ মালামাল দেশের অভ্যন্তরে আসছে যা একদিকে অবৈধভাবে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে বা দেশে থাকতে দিচ্ছে না এবং অন্যদিকে আমাদের মৌলিক শিল্পগুলোর গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে বিপুল বাধার সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন সময়ে গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে বেশ চাঞ্চল্যকর তথ্যও উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে ধাওয়া করে ট্রলার আটক থেকে শুরু করে সিমেন্টের ট্রলারে সিগারেট পাচার, মশার কয়েলের কনসাইনমেন্টে পাচার করা ঘড়ি, টু-ইন ওয়ানের ভেতরে সুকৌশলে কালোটেপ দিয়ে প্রায় তিন'শ তোলা খাঁটি সোনার পাত পাচারের প্রচেষ্টা, দেহের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা সোনার পাত, রপ্তানিযোগ্য পোশাক তৈরী করার জন্য আমদানিকৃত কাপড়ের শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বাজারে পাচার এ সমস্তই লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিরোধকারী সংস্থাসমূহের অত্যন্ত সীমিত শক্তি ও অপ্রতুল কারিগরি ও কৌশলগত সুযোগ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এমন বিপুল পরিমাণ চোরাচালানের তথ্য উদঘাটিত হয় তাহলে এর প্রকৃত পরিমাণ আমাদের অর্থনীতির ওপর কী বিপুল চাপ ও নেতিবাচক প্রভাব রাখছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেকের মনে একটি অস্পষ্ট ধারণা যে, ব্যাগেজের সুযোগের অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ চোরাচালান হয়ে থাকে। কিন্তু পরিসংখ্যানের দিক থেকে এ তথ্য

ভ্রান্ত বিবেচিত হবে। কেননা বাজারে যে বিপুল পরিমাণ মালামাল পাওয়া যায় বিশেষত টেক্সটাইল মালামাল তার পরিমাণ ও বৈচিত্র থেকে মনে হয় না যে তা কেবলমাত্র ব্যাগেজের অপব্যবহার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে অবশ্য তা কিছুটা সত্য। কিন্তু পরিমাণ ও মূল্যের বিচারে তা টেক্সটাইলের তুলনায় নগণ্য।

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বাস্তব দিক থেকে এই প্রবণতাকে যথার্থভাবে প্রতিরোধ করতে হলে আইনগত ও কৌশলগত এই উভয় বিষয়ের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আইনগত দিক থেকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন এই যে চোরাচালান একটি বিশেষ ধরনের অপরাধ। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর সেই জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিভাগ কর্তৃক এ সম্পর্কে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান আইনগত ব্যবস্থা যথেষ্ট হলেও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অব্যবস্থা বিরাজিত রয়েছে। শুল্ক আইনে যদিও অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে মালামালের ওপর ন্যায় নির্ণয়ন এবং অপরাধীর ওপর জেল ব্যতীত অন্য শাস্তি শুল্ক বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ প্রদান করবেন এবং অপরাধীর উপরে কারাদন্ডাদেশ দেবেন ম্যাজিস্ট্রেট, তবু বিপুলসংখ্যক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সাধারণ আদালত প্রায়ই মালামাল ও অপরাধী উভয়ের উপরেই আদেশ দিচ্ছেন এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় চোরাচালানকৃত বা চোরাচালানের উদ্দেশ্যে আনীত মালামাল ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের তিনটি অঞ্চলে চোরাচালানের অপরাধীর বিচারের উদ্দেশ্যে তিনটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত রয়েছে এবং এই ট্রাইব্যুনাল সমূহের আওতা ও সংখ্যা আরও বাড়ানোর চিন্তা করা যেতে পারে।

এছাড়া চোরাচালান সম্পর্কিত মামলার তদন্ত করতে হবে বিশেষজ্ঞ বিভাগকে যার কাছে সিজিং এজেন্সি সাহায্য চাইবেন অন্যথায় অবৈধ মালামাল বৈধ হিসেবে ছাড় পেয়ে যাবে। সাধারণ আইনের আওতায় প্রাথমিক পুলিশী তদন্ত এই সমস্ত ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। এই সমস্ত মামলার তদন্তে শুল্ক আইন, বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি ও করারোপ নীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের পটভূমি একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

শিল্প-বাণিজ্য অর্থনীতি সম্পর্কে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং কেবলমাত্র তখনই সঠিক পন্থায় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। শুল্ক আইনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোকে পূর্বাপর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে বাতিল করতে থাকলে সামগ্রিকভাবে বিপর্যয়ের সম্ভাবনাই বাড়বে।

উদাহরণ হিসেবে কাস্টমস এ্যাক্টের ১৮১ ধারার সংশোধনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে শিল্পমন্ত্রণালয়, বাণিজ্যমন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে অধিকতর মতামত বিনিময় ও সামঞ্জস্য বিধান একান্তভাবে আবশ্যক। সংরক্ষণ, কৃষি ও শিল্পের প্রসার রাজস্বের প্রয়োজনীয়তা ও সাধারণ ভোক্তাদের পরস্পর বিরোধী স্বার্থকে সমন্বিত করার মাধ্যমেই সঠিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তার ফলে চোরাচালান নিরোধ সম্ভব অন্যথায় নয়। বর্তমান ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে অর্থনীতিকে সাজাতে হলে এমন বাণিজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে এক ধরনের সম্পূরক অর্থনীতি তৈরি হয় যার ফলে বাণিজ্যের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে।

সার্কের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন করে সাধারণ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। প্রতি বছরের আমদানি-রপ্তানি নীতিমালা ও রাজস্ব নীতি বাস্তবায়নে অধিকতর স্পষ্টতা ও যৌক্তিকতার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে যার অভাবে প্রায়শ বাস্তবক্ষেত্রে বিপুল জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমদানি-রপ্তানির আঞ্চলিক দপ্তরসমূহে অনেক বেশি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।

সীমান্তে ও অনুমোদিত রুটে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় ও বাস্তব চিন্তার প্রসার ঘটানো জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিভাগ তুলনামূলকভাবে কতোখানি দক্ষ এমনটা প্রমাণ করার যে উৎকট

প্রতিযোগিতা বর্তমানে চলছে তাকে পরিত্যাগ করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগকেই আনুপূর্ব তৎপর হয়ে উঠতে হবে অর্থনীতি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবার আগেই। পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমন্বিত বিন্যাস বা Harmonized System কে ব্যবহার করা Transaction Value ব্যবহার সম্পর্কে অধিকতর ব্যাপক ও গভীর চিন্তা-ভাবনা ও সঙ্গে সঙ্গে GATT নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হলে সরকারী সংস্থাসমূহ ও বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের মধ্যে অধিকতর সুসম্পর্ক স্থাপন ও মতামত আদান-প্রদান করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি ও মনোভাব উন্নয়ন বিরোধী। কেন্দ্রীয়ভাবে সংঘবদ্ধ ও একক চোরাচালানীদের তালিকা প্রস্তুত ও এসম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার নিশ্চিতকরণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে বিপুলভাবে সাহায্য করতে পারে। এ সম্পর্কে UNDP ও IMF এর ২টি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনও সরকারের সমীপে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দুই প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়নের দাবিদার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হলে অবিলম্বে এ সম্পর্কে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন এবং সর্বোপরি প্রয়োজন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থে নয় দেশপ্রেমে আপামর জনগণের উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা।

লেখক
সাইফুল ইসলাম খান
অবসরপ্রাপ্ত সদস্য
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

তিনি হায়াৎ সাইফ নামে কবিতা, প্রবন্ধ ও শিল্প সমালোচনা লিখেন। এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর 'সংরক্ষণবাদ, আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক-ব্যবস্থাপনা' গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৮৮ সাল।

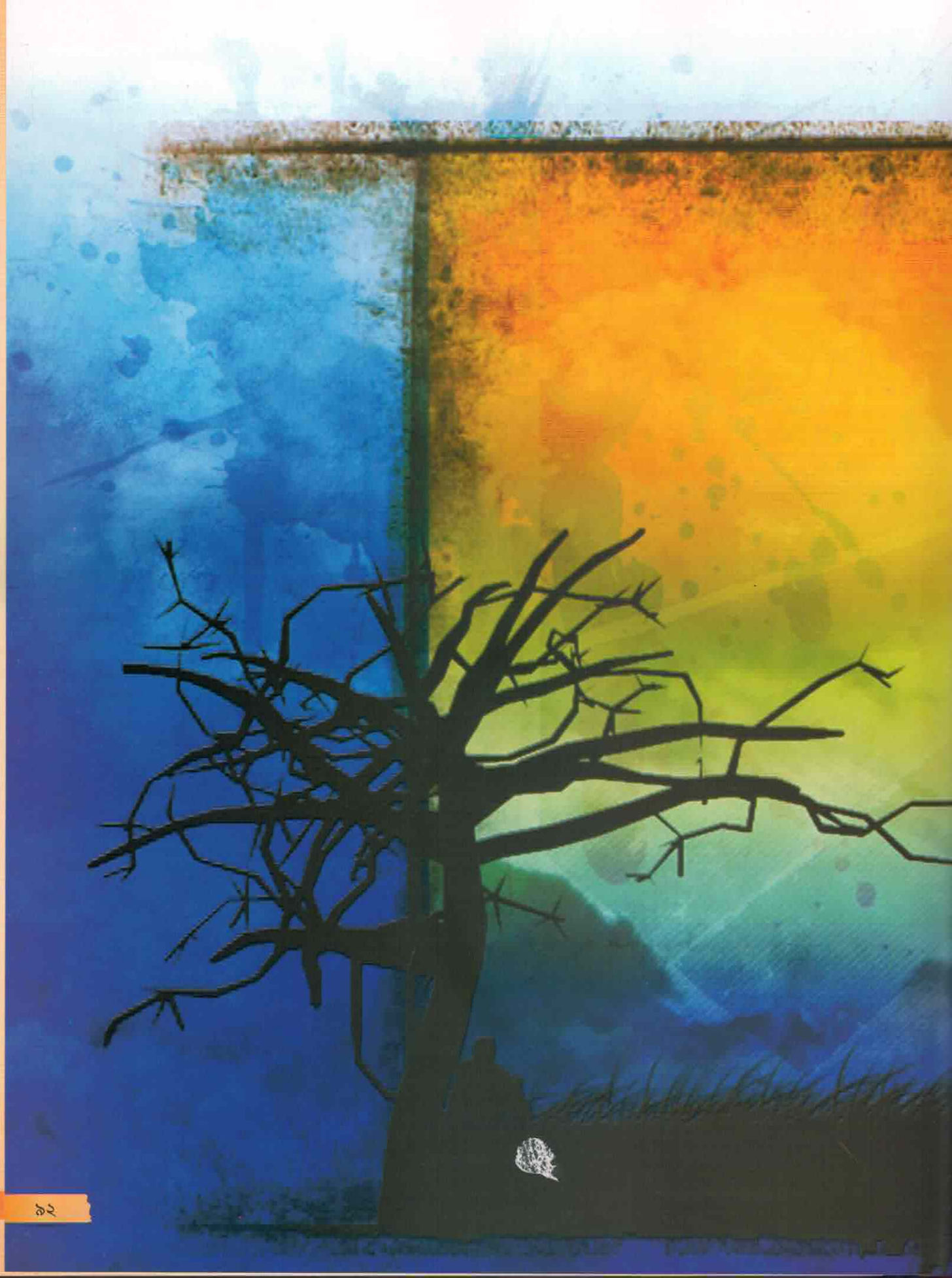

খোলা মন

শেখ হাফিজুল কবির

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন একদিন আমাদের বাসায় আমার এক ফুফাতো ভাই আসেন। তিনি মংলা কাস্টম হাউসের প্রিভেন্টিভ সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ দাপ্তরিক ইউনিফর্ম পরে এসেছিলেন। সাদা জুতা, সাদা মোজা, সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, কাঁধে ব্যাগ, মাথায় ক্যাপ। হঠাৎ দেখলে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা বলে মনে হবে। আমিও তা-ই মনে করেছিলাম। পরে শুনলাম, তিনি শুল্ক কর্মকর্তা। আর তখনই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেই যে, চাকরি পেলে শুল্ক বিভাগে করব। আল্লাহর অপূর্ব রহস্য, আমার সেই কামনা পরে বাস্তবায়িত হয়।

চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনে কর্মরত। ডিসি (জেটি) হিসাবে হিসাবে কাজ করি। আমি একা একা শেডে ঘুরতাম আর পণ্য চালানগুলো দেখতাম। একদিন দেখি পুরাতন কাপড়ের বেলের স্তুপ। একটি বেল মাঝখানে কেটে গেছে এবং সেখান থেকে নতুন কাপড় চোখে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ শেডে কর্মরত এ্যাপ্রেইজার ও প্রিন্সিপাল এ্যাপ্রেইজারকে ডেকে এনে লেবার দ্বারা বেলটি নামাই এবং দেখি পুরাতন কাপড়ের মাঝে কুড়িটির মত বেনারশী শাড়ী লুকানো আছে। পরে মেনিফেস্ট ধরে সিএন্ডএফ এজেন্টকে ডেকে পুরো চালান পরীক্ষা করি এবং আরো শাড়ী পাই।

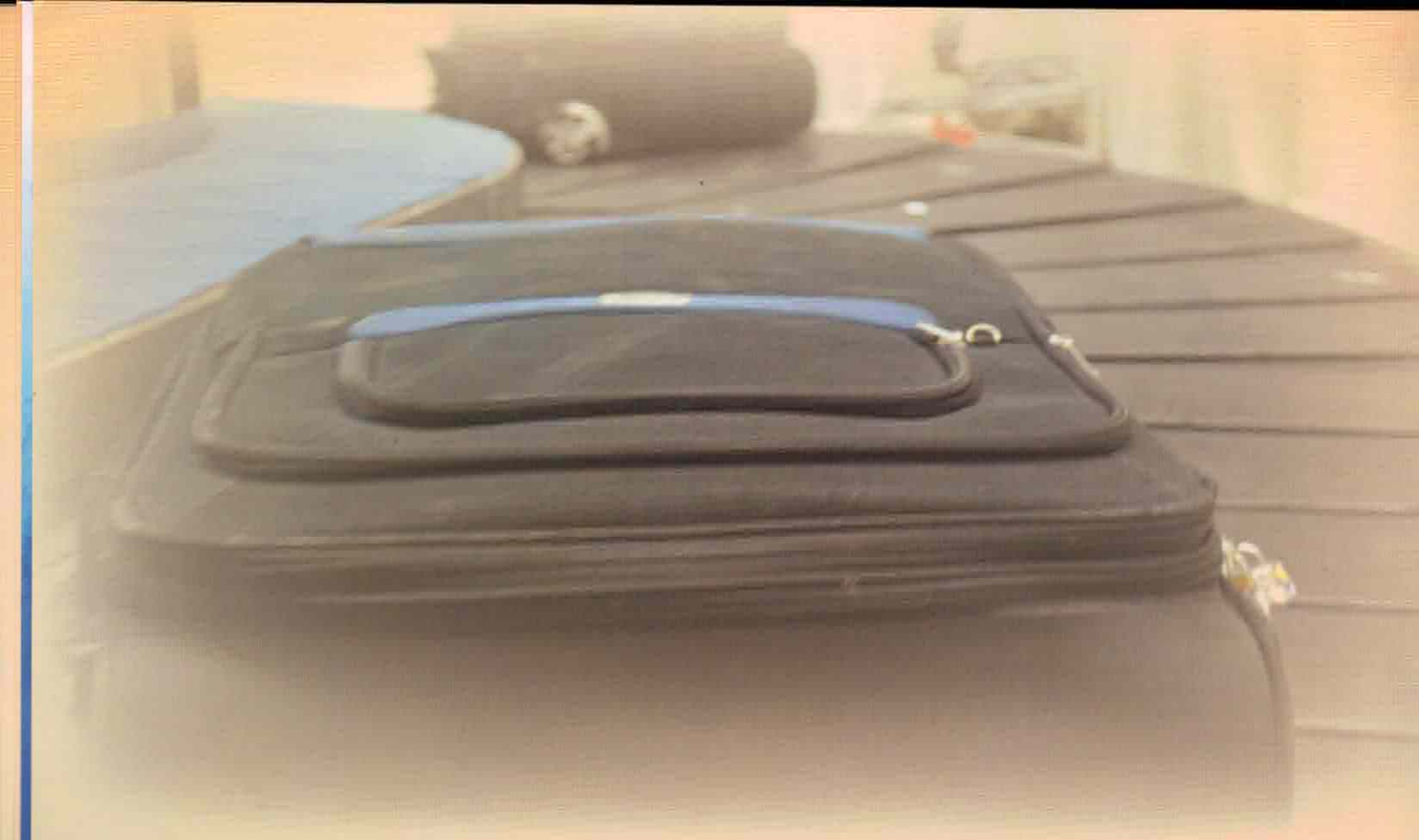

ঢাকা বিমানবন্দরে অতিরিক্ত কমিশনার হিসাবে কর্মরত। গ্রীন চ্যানেলের কাছে দাড়িয়ে। পিআইএর করাচী ফ্লাইট এসেছে। ২৪/২৫ বৎসর বয়সী মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, হাঁটুপর্যন্ত ঝোলা পাঞ্জাবী ও লুঙ্গি পরা একজন তালেবে এলেম প্লেন থেকে নেমে সরাসরি গ্রীন চ্যানেলে ঢুকেছে। তার কোন বাক্স বা মালামাল নেই। হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা কিছু আরবি, উর্দু বই। আমি তাকে থামালাম এবং একজন অফিসারকে বললাম তাকে চেক করতে। অফিসার বললেন, স্যার কোন মালামাল নেই, এগুলোতো কয়েকটা বই। চলে যাক। আমি বললাম, বইগুলো দেখেন। অফিসার দেখলাম নাখোশ হলেন। তখন আমি অফিসারকে কিছু না বলে নিজেই বইয়ের দড়ি খুলতে লাগলাম। তালেবে এলেম আমাকে বললেন, এগুলো ধর্মীয় বই। ওজু ছাড়া ধরা যাবে না। আমি বললাম, আমার ওজু আছে। তারপরও তিনি মালামাল নেই, আমি তাকে হয়রানি করছি বলে শোরগোল তুলতে লাগলেন। আমি দড়ি খুলে প্রথম বই খুলে পাতা উল্টিয়ে দেখে রেখে দিলাম। যখন দ্বিতীয় বইতে হাত দিয়েছি তখন লক্ষ্য করে দেখি লোকটির কথা থেমে গেছে এবং সে কাঁপছে। বইয়ের শক্ত মলাট ওল্টাবার পরই দেখি, পাতার মাঝখানে আয়তকার মোট ৮টি সোনার বার রাখা আছে। আমি তারদিকে তাকিয়ে বললাম, ধর্মীয় বই কেটে সোনা চোরাচালান করতে কি ওজু করা লাগে? সে তখন আমার পায়ে পড়ে গেছে। পরে সমস্ত বই পরীক্ষা করি কিন্তু আর সোনা পাইনি। আমার অফিসারকে বললাম, আমার যে সন্দেহ হয়েছে তা আপনার হওয়া উচিত ছিল। সে পাকিস্তান থেকে আসছে কিন্তু তার কোন লাগেজ নেই। তার মানেই সে ক্যারিয়ার এবং মালামাল থাকলে মাল চেক করার ঝামেলা আছে কিন্তু বই থাকলে সন্দেহ হবে না। এই সাইকোলজিতেই সে মালামাল ছাড়া শুধু বই নিয়ে গ্রীন চ্যানেল পার হওয়ার চেষ্টা করছিল আর আমি না থাকলে তো সে পার হয়েই যেত।

আর একদিন কোলকাতা থেকে বিজি ০৯৪ ফ্লাইট ঢাকা ল্যান্ড করেছে। যথারীতি আমি গ্রীন চ্যানেল দাঁড়াই। দেখি, ২০/২২ বছরের এক ছেলে কাঁধে ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে গ্রীন চ্যানেল দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে থামিয়ে ব্যাগটা খোলার কথা বলি। সে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দেয় যে তার কাছে এই ছোট ব্যাগে কোন চোরাচালান পণ্য নেই এবং আমি তাকে অযথা হয়রানি করছি। আমি বললাম, আমি আপনাকে শুধু ব্যাগের চেনটা খুলে দেখতে বলেছি। যদি কিছু না থাকে আপনি গ্রীন চ্যানেল দিয়ে চলে যাবেন। অনেক তর্কাতর্কির পর প্রায় জোর করেই তার ব্যাগ খুলি এবং দেখি ব্যাগে আর কিছু নেই শুধু ১০টা বেনারসী শাড়ীর একটা বাধা প্যাকেট। আমার অফিসাররাও ঐ যাত্রীকে গ্রীন চ্যানেল দিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করেছিলেন।

আমি শুনিনি। পরে তাদের ডেকে বললাম, জানেন এই ১০টা বেনারসী শাড়ীর দাম কত? তখন বাংলাদেশী টাকায় এক লাখ টাকা আর এই ছেলে পেত তার তিন ভাগের একভাগ মানে প্রায় তেত্রিশ হাজার টাকা। এখানেও ঐ একই মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। কোলকাতা থেকে এসেছে অথচ তার কোন লাগেজ নেই। তার অর্থই হল সে ক্যারিয়ার এবং কোন সন্দেহ না জাগানোর জন্য এই কৌশল নিয়েছে। এ জাতীয় আরো ডজন দেড়েক ঘটনা আছে।

কিছু দুঃখজনক স্মৃতিও আছে। একদিন কনভেয়ার বেল্টে মাল আসছে। দেখলাম একটি ব্যাগে ডাবল ক্রস তার অর্থ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আছে। ব্যাগটি নিয়ে গ্রীন চ্যানেল পার হওয়ার সময় যাত্রীকে ব্যাগ চেক করার কথা বলা হল। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন যে, তিনি মাননীয় সংসদ সদস্য। তারপরও তার লাগেজ চেক করা হয় এবং একটি ভিসিআর, একটি ফ্যাক্স মেশিন এবং দুটি ফোন পাওয়া যায়। তখন রাত নয়টা। তিনি শুল্ক দিতে অস্বীকার করেন ফলে মালামালগুলোর খালাস স্থগিত করা হয়। পরে রাত এগারটায় আমাকে অর্থমন্ত্রীর বাসায় যেতে হয় এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁকে জানাতে হয়।

অন্য একদিন তৎকালীন চীফ হুইপ আসেন। তার লাগেজে একটি ভিসিআর পাওয়া যায়। হুইপ সাহেবের পিএস এসে মালামাল ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করেন। পরে হুইপ সাহেবের স্ত্রী এসেও ভিসিআরটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয় করেন। কিন্তু আমি বলি, শুল্ক দেওয়ার টাকা এখন না থাকলে ডিটেনশন মেমো নিয়ে যান, কাল এসে টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে ভিসিআর নিয়ে যাবেন। ফলে তারা ডিএম নিয়ে চলে যান। পরদিন অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে কমিশনার মহোদয় এবং আমি সংসদ ভবনে চীফ হুইপ সাহেবের সাথে দেখা করে ক্ষমা প্রার্থনা করি। চীফ হুইপ সাহেব ডিএম আমার হাতে দিয়ে বলেন, পকেট থেকে টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে ভিসিআরটি বাসায় পৌঁছে দিবেন। অগত্যা আমি চাঁদাতুলে ১৮ হাজার টাকা জমা দিয়ে ভিসিআরটি তার বাসায় পৌঁছে দেই।

লেখক
শেখ হাফিজুল কবির
অবসরপ্রাপ্ত সদস্য
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২৫০০০০০০০
২০০০০০০০০
১৫০০০০০০০
১০০০০০০০০
৫০০০০০০০
০

চোরাচলানের অর্থনীতি

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

চোরাচালান শব্দটির সহিত কেবল সীমান্ত রক্ষী বা শুল্ক কর্মকর্তাদের নহে, প্রায় সকলেরই কমবেশী পরিচয় রহিয়াছে। কর্মটি যে খারাপ সেই বিষয়ে দেশের বিদ্বজ্জন, আইনজ্ঞ ও সুশীল সমাজ অর্থাৎ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা সীমান্তবর্তী মানুষ চোরাচালান আইনসিদ্ধ কি বেআইনী এই বিষয়ে তাহাদের কোনোরূপ মাথাব্যথা দেখা যায় না। চোরাচালান অর্থাৎ এই পারের মাল ঐ পারে লইয়া যাওয়া তাহাদের নিকট আর-আর দশটি ব্যবসায় কর্মের মতই একটি অর্থকরী কর্ম। সীমান্ত রেখাটির অপর পার্শ্বে বস্তা বোঝাই পণ্যটি পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই দুই পয়সা আয় হয়, তাহাতে ক্ষুণ্নিবৃত্তি হয় ছেলেপিলেদের স্কুলের খরচাপাতি উঠিয়া আসে, ঝড়ে ঘরের টিনের চালা উড়িয়া গেলে অর্থাভাবে মেরামত ঠেকিয়া থাকে না। সীমান্তরক্ষী কি শুল্ক বিভাগ কেন এহেন জীবিকাবৃত্তিতে বাধ সাধে তাহা তাহাদের নিকট স্বতঃস্পষ্ট নহে। কেন এধারকা মাল ওধারমে পাচার অবৈধ বলিয়া আইন ফাঁদা হইয়াছে সীমান্তবর্তী মানুষ কখনই তাহা পরিষ্কার বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

কেবল তাহারা কেন চোরাচালান জিনিসটা আসলে কী সেই বিষয়ে অর্থশাস্ত্রীদেরও আগ্রহের নিতান্ত অভাব। সেই যে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশ ভগবতী বাবু হ্যানসেন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া যৌথ উদ্যোগে "আ থিয়োরেটিক্যাল অ্যানালাইসিস অব স্মাগলিং" শিরোনামে কোয়ার্টালি জার্নাল অব ইকনমিক্সে একখানা তত্ত্ব পেশ করিয়াছিলেন ইহার পর চারি যুগেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে তথাপি হলফ করিয়া বলিতে পারিব না যে ইত্যবসরে চোরাচালানের বিষয়ে পণ্ডিজ্জন সবিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবতী বাবু বিষয়টি লইয়া আরো কিছুকাল নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কিন্তু এই পথে তাহার সাগরেদ জোটে নাই বলিলে ভুল হইবে না।

ভগবতী-হ্যানসেন বাবুসাহেব উর্পযুক্ত রচনায় দুইটি বিষয় স্পষ্ট করিয়াছিলেন। প্রথমত: তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন চোরাচালান একরূপ আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বটে। ইহা আইনসিদ্ধ কি বেআইনী তাহা ভিন্ন বিবেচনার বিষয়। গুরুতর দ্বিতীয় বিষয়টি হইল চোরাচালানের জনকল্যাণকর দিকটির প্রতি তাহারা অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাহাদের মোদ্দাকথা অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহারা বলিতেছেন, হইতে পারে সরকারের তুলনায় ব্যক্তিখাত অধিকতর দক্ষ (efficient), কিন্তু তাহা বলিয়া এবম্বিধ নিশ্চয়তা নাই যে চোরাচালানের কারণে জনকল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে যদিও চোরাচালানের মাধ্যমে কার্যত: সরকারী খাত হইতে ব্যক্তিখাতে সম্পদের স্থানান্তর ঘটিয়া থাকে। নিশ্চয়তা নাই তাহাতে এমনকী, চোরাচালানের মধ্য দিয়া জনকল্যাণ অর্জ্জনের সম্ভবনা তো রহিয়াছে! সে যাহাই হউক, নীতিবাগীশরা ঘোর আপত্তি তুলিয়া এমত যুক্তি খাঁড়া করিবেন যে, সরকার যাহা বেআইনী ঘোষণা করিয়াছে তাহা জনহিতকর কি গণবিরোধী এই লইয়া আলোচনা অচল।

তাহাদের বক্তব্যে সারবত্তা রহিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু যাহা আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করি তাহা হইল সরকার এবং সমাজ সর্বদা সমান্তরাল পথে চলে না; তাহারা পরস্পরের চোখের ভাষা পড়িয়া ঐক্যদর্শী নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এইরূপ দাবীও বাস্তবোচিত হইবে না। যশোহর কি সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী মানুষের সহিত আলাপ করিলে এই অভিজ্ঞতাই হয় যে চোরাচালান তাহাদের নিকট অবৈধ বিষয় নহে যদিও তাহারা সম্যক অবহিত যে কর্মটি বেআইনী বটে।

২০১০ খ্রিষ্টাব্দে "ইন্টারনেট জার্নাল অব ক্রিমিনোলজিতে" প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ম্যথুওলামিই গবেষণাক্রমে জানাইতেছেন যে নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবাসী মানুষ চোরাচালানের মধ্যে খারাপ কিছু রহিয়াছে এই রূপ আদৌ মনে করে না। কারণ অতিস্পষ্ট-এই ব্যবসায়টি তাহাদের জন্য লাভদায়ক। চোরাচালান তাহাদের নিকট জীবিকা আয়ের ব্যবসায় মাত্র। সংস্কৃত না-জানিলেও তাহারা সম্ভবতঃ সম্যক অবহিত যে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। এই লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিবার মতো মূর্খ তাহারা নহে।

অর্থশাস্ত্রের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে দুইটি অবিনশ্বর শক্তি-চাহিদা ও যোগান। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন ভূপৃষ্ঠের তাবৎ সরণ-পশ্চাদপসরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, তেমনি সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে রহিয়াছে চাহিদা ও যোগানের মিথস্ক্রিয়া। সীমান্তে চোরাচালানের চাহিদা রহিয়াছে। ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে চোরাচালানের যোগানদার হইল ভারতীয় নাগরিক, বাংলাদেশী পণ্যের ক্ষেত্রে চোরাচালানের যোগানদার হইলে বাংলাদেশী নাগরিক। সীমান্তে বলা যাইতে পারে যে- সীমান্ত রেখা বরাবর চোরাচালানের সরগরম বাজার রহিয়াছে। যদি চোরাচালানের চাহিদাকারী ও যোগানদারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহা হইলে উক্ত বাজার কর্মক্ষম হইবে অর্থাৎ চোরাচালান সংঘটিত হইবে। ইহাতে উভয় পক্ষই লাভবান হইবে। সীমান্তরক্ষীরা তৎপর থাকিলে চোরাচালানের বাজার নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। তখন চাহিদা থাকিবে, যোগান থাকিবে, কিন্তু চোরাচালান সংঘটিত হইবে না। যাহারা চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালাইতে ইচ্ছুক তাহারা এই বিষয়টি অনুধাবন করিলে উপকার লাভ করিবেন। পাঠক হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, উপরে চোরাচালানী পণ্যের চাহিদা ও যোগানের কথা না বলিয়া বলিয়াছি চোরাচালানের চাহিদা ও যোগানের কথা। অন্যত্র, সেই ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে, রাজস্ব চত্বরে দুর্নীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুর্নীর্তির চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তে আমি রাজস্বফাঁকির চাহিদা ও যোগানের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়াছিলাম, এবং একই সুরে দুর্নীতির বাজারের সক্রিয়তা যে রাজস্বফাঁকির বাজারের উপর নির্ভরশীল এই প্রস্তাবনা করিয়াছিলাম। চোরাচালানের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি ফলোদায়ক। ইহার কারণ অচিরেই ব্যাখ্যা করিতেছি।

প্রথমতঃ প্রণিধানযোগ্য যে চোরাচালানের মধ্য দিয়া যে কর্ম সংগঠিত হয় অবৈধ বাণিজ্যের মধ্য দিয়া একই কার্য সংগঠিত হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও চোরাচালান ও অবৈধ বাণিজ্য পদ্ধতিগতভাবে ভিন্ন। অবৈধ বাণিজ্য ঘটে বৈধ বাণিজ্যের ছত্রছায়ায়। ইহাতে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের বিবরণ এবং/অথবা পণ্যের মূল্য বিকৃতভাবে ঘোষণার বিষয়টি জড়িত। মোদ্দাকথা, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে বা সংজ্ঞায়িত শুল্কবন্দরের মধ্য দিয়া অবৈধ বাণিজ্য সংঘটিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য হয় শুল্ক ফাঁকি অথবা নিষিদ্ধ পণ্যের বাণিজ্য অথবা যুগপৎ উভয়ই। অন্যদিকে, চোরাচালান সরকার নির্ধারিত বাণিজ্য পথে বা ঘোষিত শুল্ক ঘাঁটির মধ্য দিয়া ঘটে না। চোরাচালান ঘটে অবৈধ পথে যেখানে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের বর্ণনা বা মূল্যের বিষয়ে মিথ্যা ঘোষণা প্রদানের প্রসঙ্গ নাই। এই সূত্রে বলিতে প্রলুব্ধ বোধ করিতেছি যে, চোরাচালান বিষয়ে যৎকিঞ্চিত যে আলোচনা অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় তাহাতে চোরাচালান ও অবৈধ বাণিজ্যের ধারণা গুলাইয়া ফেলিবার প্রকট উদাহরণ আছে। সন্দেহ নাই ঐ সব অর্থশাস্ত্রী না পাহাড়তলীর সাগরিকা রোডে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন না তাহারা শুল্ক আইনের (১৯৬৯) ২ (এস) ধারা পাঠ করিয়াছেন। দুভার্গ্যই বটে।

দ্বিতীয়তঃ অবৈধ বাণিজ্যের মূল্য উদ্দেশ্য হয় শুল্ক ফাঁকি নয় নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি। এই কথা বিলকুল সত্য চোরাচালানের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি হইতে পারে আবার নিষিদ্ধ পণ্যও পাচার হইতে পারে। কিন্তু চোরাচালানের মৌলিক উদ্দেশ্য শুল্ক ফাঁকিও নহে নিষিদ্ধ পণ্য পাচারও নহে। চোরাচালানের আদি ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্যে হইতেছে ব্যবসায় অর্থাৎ পণ্যের বিকিকিনি তাহা নিষিদ্ধ পণ্যের হউক বা না-হউক, অথবা তাহাতে শুল্ক ফাঁকি হউক বা না-হউক। ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা, অতএব চোরাচালানের ক্ষেত্রেও মুনাফা থাকিতে হইবে। যদি মুনাফা অর্জন সম্ভব না-হয় তবে চোরাচালানের চাহিদা ও যোগান থাকিবে না, 'চোরাচালান বাজার' অকার্যকর তথা অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবে।

চোরাচালানের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিষয়টি হইল মুনাফার হার। এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল অর্থশাস্ত্রের অপরচুনিটি কস্ট-এর ধারণা। অন্যান্য ব্যবসায়ের তুলনায় মুনাফার হার বেশী না-হইলে মানুষ চোরাচালানের প্রতি ঝুঁকিবে কেন? কার্যতঃ যদি মুনাফার হার কমিয়া যায় তবে চোরাচালানীরা এই ব্যবসায় ছাড়িয়া আরও মুনাফাজনক ব্যবসায় তালাশ করিয়া লইবে। মুনাফার পরিমাণ বেশী হইতে হইবে কারণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ধৃত হইলে সম্পূর্ণ চালানটি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। যদি মুনাফার হার বেশী হয় তাহা হইলে ১০ দফা চোরাচালানের মধ্যে ১ দফা ধৃত হইলেও তাহা কালে পোষাইয়া যাইবে। মুনাফার হার বেশী হইবে তখনই যদি ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ব্যবধান ব্যাপক হয়।

চোরাচালানী পণ্যের ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের ব্যবধান যত বেশী হইবে চোরাচালান করিয়া মুনাফা অর্জ্জনের সুযোগও তত বৃদ্ধি পাইবে। ২০১২ হইতে বাংলাদেশে সোনা চোরাচালান যারপরনাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত দেড়-দুই বৎসর যাবৎ বিমান বন্দরে শত শত কিলোগ্রাম সোনা ধরা পড়িতেছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সোনা পাচারের করিডোরে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ মধ্যপ্রাচ্য হইতে ভারতগামী সোনা বাংলাদেশে ধরা পড়িতেছে। ১০ গ্রাম সোনা দুবাইতে মাত্র ৩৭-৩৮ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া ভারত সীমান্তে ৪০ হাজার টাকায় বিক্রয় করা সম্ভব। ভারত ব্যাপক পরিমাণে সোনার গহনা রপ্তানি করে অথচ দীর্ঘকাল সোনার আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিল। এখন এই নিষেধাজ্ঞা নাই। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট সামাল দিতে গিয়া সম্প্রতি দেশটি সোনার উপর ধার্য্য আমদানি শুল্কের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়াছে। ২০১২'র এপ্রিলে আমদানি শুল্কের হার ২ শতাংশ হইতে ৪ শতাংশে উন্নীত করা হইয়াছে; ২০১৩'র জানুয়ারিতে এই হার ৬ শতাংশে, জুন মাসে ৮ শতাংশে এবং আগস্টে ১০ শতাংশে উন্নীত করা হইয়াছে। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এই উর্ধগামী শুল্ক কাঠামো সোনার চোরাচালানকে অবধারিত করিয়া তুলিয়াছে। সোনার মাসিক আমদানি দেড় লক্ষ কিলোগ্রাম হইতে ২০ হাজার কিলোগ্রামে নামিয়া আসিয়াছে; সমান তালে চোরাচালান হইতেছে কারণ সোনার আভ্যন্তরীক চাহিদা হ্রাস পায় নাই। আমদানির পরিবর্তে এক কিলোগ্রাম সোনা চোরাচালান করিলে অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ রুপি। বাৎসরিক সোনা চোরাচালানের পরিমাণ ২০০ টনে ঠেকিয়াছে। ইহার অন্ততঃ ৫-৬ শতাংশ বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করে বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গেও অনুমান।

উর্পযুক্ত তৃতীয় বিষয়টির গর্ভে চতুর্থ বিষয়টি সুপ্ত রহিয়াছে; আর তাহা হইল এই যে চোরাচালান এক দফা কর্ম হইতে পারে না-ইহা দীর্ঘস্থায়ী একটি ব্যবসায় প্রকল্প। এই ব্যবসায়টি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর হাতে ধৃত হইলে পুরা চালানটি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাবে। সুতরাং চোরাচালানকারীর ঝুঁকি বহনে সক্ষমতা থাকিতে হইবে। চালান পিছু ঝুঁকির পরিমাণ যত হ্রাস পাইবে সফল পাচারের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা অর্থশাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া ডুওপলীর ক্ষেত্রে, গেইম থিওরী পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন তাহাদের কথা মাথায় রাখিয়া এইরূপ বলিতে পারি যে, চোরাচালান সীমান্তরক্ষীর শ্যেন চক্ষু ফাঁকি দিয়া পণ্য পাচারের একদফা খেলা নহে, ইহা বস্তুতঃ বহুদফা খেলা যাহাকে রিপিটেড গেইম বলা হইয়া থাকে।

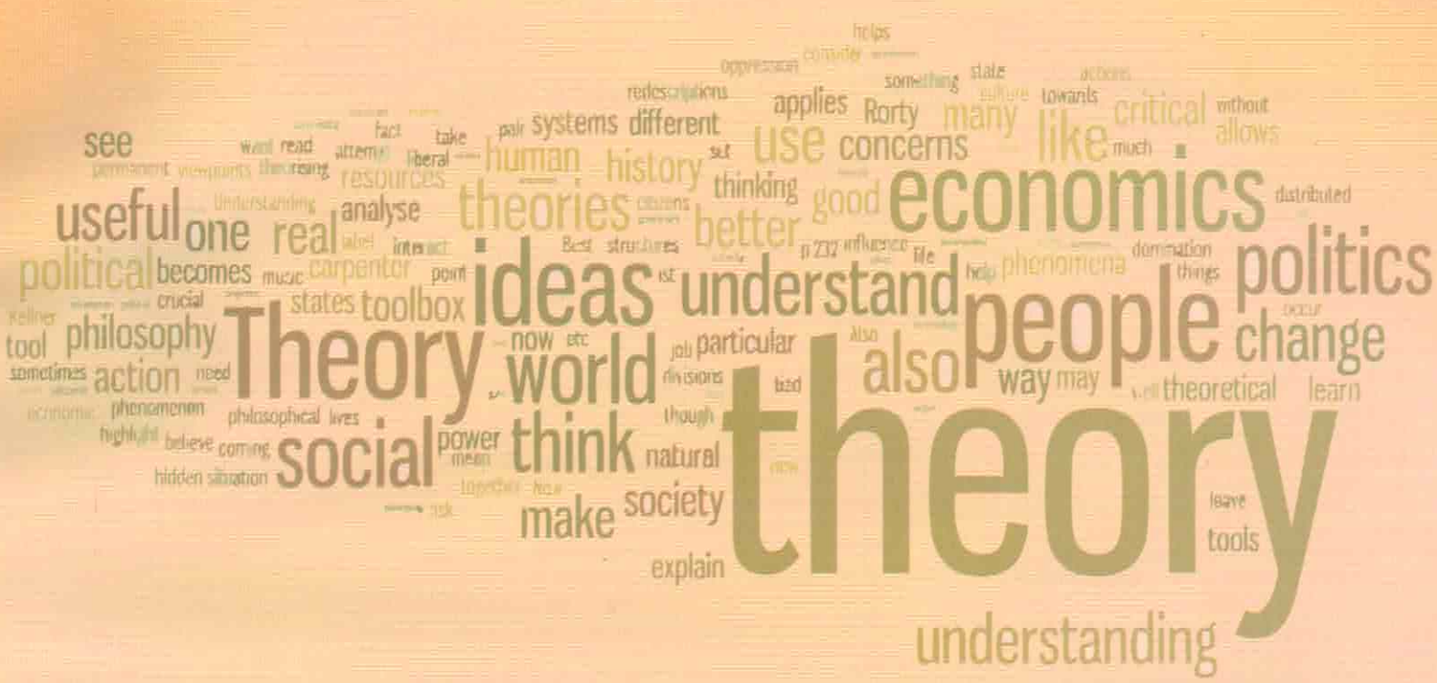

ভগবতী-হ্যানসেন বাবুসাহেবরা চোরাচালানের অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিবেচনা করিয়াছেন যে চোরাচালান বৈধ বাণিজ্যকে প্রতিস্থাপন করে। যেমন, যদি চোরাচালানের মাধ্যমে সিগারেট দেশাভ্যন্তরে প্রবেশধিকার লাভ করে তবে বৈধ পথে সিগারেটের আমদানি হ্রাস পাইবে। এই বিবেচনায় চোরাচালান বৈধ বাণিজ্যের প্রতিস্থাপক বটে। কিন্তু চোরাচালানের আরও একটি সমগুরুত্ববহ প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে যাহা ভগবতী-হ্যানসেন বাবুসাহেবরা বিবেচনায় গ্রহণ করেন নাই। তাহা হইল এই যে চোরাচালান হইলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন হ্রাস পাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদেশী সিগারেট যদি চোরাচালানের মাধ্যমে দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় তবে সমানুপাতে সমতূল্য দেশজ সিগারেটের উৎপাদন হ্রাস পাইবে। গত শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর বিদেশী "লন্ডন" সিগারেটের চোরাচালানের কারণে দেশজ "গোল্ডলীফ" সিগারেটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় উপস্থাপিত একটি নিবন্ধে বিষয়টির প্রতি পণ্ডিজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিলাম।

অর্থশাস্ত্রের প্রিয়ভাজন বিষয় হইল যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অপটিমাইজেশানের সূত্র তালাশ করা। যেমন, বাজারের কাঠামো পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ হইলে অর্থশাস্ত্রীয় প্রশ্ন হইবে একটি পণ্য কী পরিমাণে উৎপাদন তথা বাজারজাত করিলে ব্যবসায়ীর মুনাফা সর্বোচ্চ হইবে। যদি ইহা একচেটিয়া বাজার হয় তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে ব্যবসায়ী পণ্যের দর (একক মূল্য) কত নির্ধারণ করিবেন যাহাতে তাহার মুনাফা সর্বোচ্চ হয়। ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের সাহায্যে এই ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা সহজ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। যেই পরিমাণ উৎপাদন তথা বাজারজাত করিলে মার্জিনাল কস্ট এবং মার্জিনাল রেভিনিউ সমান হইবে সেই পরিমাণ করাই শিরোধার্য কারণ এই অবস্থায় মুনাফা সর্বোচ্চ হইয়া থাকে। এই হইল মোদ্দা কথা। জ্যামিতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে বলিতে হয় মার্জিনাল কস্ট রেখা এবং মার্জিনাল রেভিনিউ রেখা যেইখানে ছেদ করিবে সেই বিন্দু সবোচ্চ মুনাফা দ্যোতনা করিবে। প্রায় অর্ধশতাব্দী হইল কিছু বীজগণিতের সমীকরণ না দিলে অর্থশাস্ত্রীয় রচনা দেখিতে মর্যাদাবান হয় না। নিদেনপক্ষে জ্যামিতির নকশা তো দিতেই হয়। আপাতত একটি সরল নকশা বা রেখাচিত্র দিয়া দেখা যাইতে পারে চোরাচালানের বাজারে চাহিদা-যোগান, মূল্য-ব্যয় ইত্যাদি কী-প্রক্রিয়ায় খেলা করে। এই সূত্রে বলিয়া রাখি যশোহর-সাতক্ষীরা সীমান্তরেখা বরাবর কাঁধে বস্তা চাপাইয়া পণ্য পাচারের যে প্রাত্যহিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে এই স্থলে চোরাচালানের বাজারটি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ।

রেখাচিত্র-১

Smuggling under Constant cost conditions

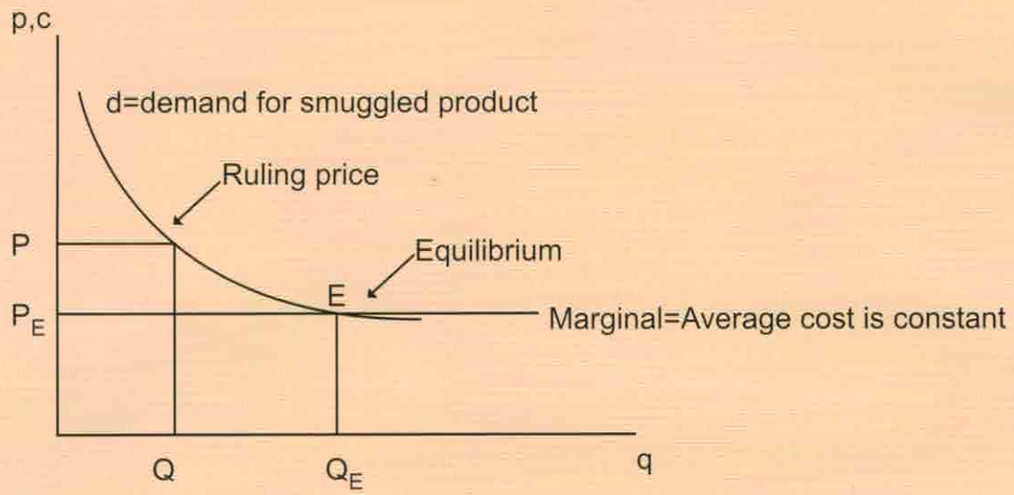

এই রেখাচিত্রে d দিয়া চাহিদা, p দিয়া মূল্য, c দিয়া উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি বোঝানো হইয়াছে। এই রেখাচিত্রে মাত্র ২টি রেখা রহিয়াছে। d হইল চাহিদা রেখা অন্য দিকে c হইলে উৎপাদন ব্যয় রেখা । যদি চোরাচালানের আধিক্যের সঙ্গে-সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যয় হ্রাস (বা বৃদ্ধি) না পায় তাহা হইলে c একই সঙ্গে গড় ব্যয় (Average Cost) এবং প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) বুঝাইবে। E বিন্দুটি প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের ভারসাম্য ইঙ্গিত করিতেছে। তাহা হইলে চোরাচালানের আদর্শস্থানীয় পরিমাণ হইল Qe। অর্থাৎ Qe পরিমাণ চোরাচালানেই সর্বাধিক মুনাফা হইবে। যদি চোরাচালানের বাজারে পণ্যের মূল্য Pe না-হইয়া p হয় তবে চোরাচালানের পরিমাণ Qe না-হইয়া কম অর্থাৎ Q হইবে।

যদি আইন প্রয়োগকারী বাহিনী তৎপর হইয়া চোরাচালানের কোনো চালান বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম হয় তবে ঐ চালানটির ব্যয় সার্বিক ব্যয়ের সহিত যুক্ত হইবে। ইহার ফলে ব্যয় রেখাটির উল্লম্ফন ঘটিবে। নিম্নের রেখাচিত্রে এই বিষয়টিও দেখানো হইল। যখন আইন প্রয়োগ নাই বা আইন প্রয়োগ অকার্যকর, তখন ব্যয়যোগ হইবে C এবং যখন আইন প্রয়োগের (এনফোর্সমেন্ট) ফলে বাজেয়াপ্তের ঘটনা ঘটে তখন চোরাচালানের ব্যয়যোগ হইবে C_E।

রেখাচিত্র-২

Smuggling under Constant cost conditions

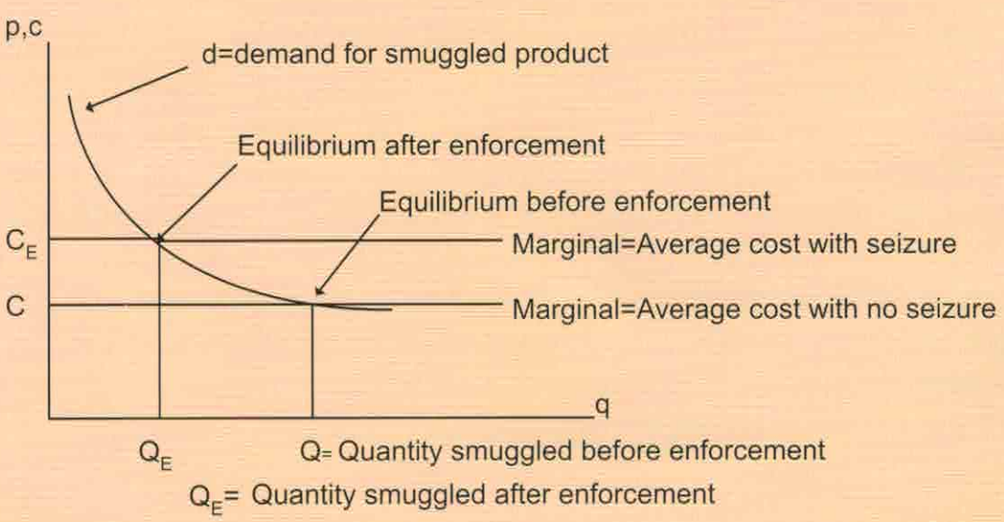

যখন আইন প্রয়োগ অকার্যকর তখন চোরাচালানের পরিমাণ Q এবং যখন আইন প্রয়োগের ফলে চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয় বৃদ্ধিলাভ করে তখন চোরাচালানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া Q_E-তে নামিয়া আসে। উপরের রেখাচিত্রীয় ব্যাখ্যাটি আহামরি কিছু না হইলেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আইন প্রয়োগ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যকর করিতে পারিলে চোরাচালানের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। বস্তুতঃ নোবেল বিজয়ী অর্থশাস্ত্রী গ্যারি বেকার সাহেবকে অনুসরণ করিয়া 'ইপ্সিত উপযোগ বিশ্লেষণের' (এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি অ্যানালাইসিস) মাধ্যমে দেখানো সম্ভব যে বাজেয়াপ্ত হইবার ঝুঁকি যত বৃদ্ধি পাইবে চোরাচালানের প্রার্দুভাব ততই হ্রাস পাইবে। আপাতত এই অনুশীলন স্থগিত রাখা হইল।

দশটি চালান সীমান্তের অপরপারে পাচারের সময় যদি একটি ধরা পড়ে তবে ঝুঁকির পরিমাণ যতটুকু একশত চালান পাচারকালে মাত্র একটি ধরা পড়লে ঝুঁকির পরিমাণ সমানুপাতিক হারে কম। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ঝুঁকি ১০ শতাংশ, দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে ঝুঁকি মাত্র ১ শতাংশ। যখন চোরাচালানকারীর নিকট প্রতীয়মান হয় ঝুঁকির মাত্রা কম তখন স্বভাবতইঃ সে চোরাচালানে অধিকতর বিনিয়োগ করিবে।

আইন প্রয়োগের সফলতার উপর চোরাচালানের পরিমাণ নির্ভর করে এই তত্ত্বটি রেখাচিত্রের সাহায্যেও প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এই জন্য আমরা একাদিক্রমে ৪টি সূত্র বর্ণনা করিব।

সূত্র-১: আইন প্রয়োগ যতই কার্যকর হইবে চোরাচালানী পণ্য আটক ও বাজেয়াপ্তির মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাইবে। এই বাজেয়াপ্তির ফলে চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ আইনের কার্যকারীতা এবং চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক ধনাত্মক।

সূত্র-২: চোরাচালানী যে মূল্যে স্থানীয় বাজারে পণ্য ক্রয় করে এবং যে মূল্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তাহা পাচার করে তাহাকে মূল্য প্রভেদ বলা যাইতে পারে। 'মূল্য প্রভেদ' বেশী হইলে চোরাচালান উৎসাহিত হইবে। কিন্তু মূল্য প্রভেদ কার্যত: হ্রাস পাইবে যদি চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয় হ্রাস পায়। আমরা সূত্র-১ ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছি যে আইন প্রয়োগ কার্যকর হইলে চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুত্র-২ হইল এই যে চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয় ও মূল্যপ্রভেদ এই দুইয়ের সম্পর্ক ঋণাত্মক। অতএব চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলে মূল্য প্রভেদ হ্রাস পাইবে।

সূত্র-৩: মূল্য-প্রভেদ বেশী হওয়ায় অর্থ হইল চোরাচালানের অধিকতর মুনাফাজনক হওয়া 'মূল্য প্রভেদ' ও চোরাচালানকারীর মুনাফার পরস্পর সম্পর্ক ধনাত্মক। 'মূল্য প্রভেদ' সংকীর্ণ হইলে মুনাফা হ্রাস পাইবে, অপর দিকে 'মূল্য প্রভেদ' প্রশস্ত হইলে মুনাফাও উচ্চতর হইবে।

সূত্র-৪: চোরাচালানের মাত্রা কম না বেশী হইবে তাহা নির্ভর করে মুনাফার ওপর। চোরাচালানকারীর নিকট সীমান্তের অপর পারে পণ্য পাচার এক প্রকার ব্যবসায় ভিন্ন আর কিছু নহে। মুনাফার হার যতই বেশী হইবে সে চোরাচালানের প্রতি তত বেশী আকৃষ্ট হইবে। মুনাফা হ্রাস পাইলে একজন চোরাচালানকারী পণ্য পাচারের পরিবর্তে অন্য ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিবে যাহাতে মুনাফার হার অধিকতর। অর্থাৎ চোরাচালানের মাত্রা এবং চোরাচালানজনিত মুনাফার পারস্পরিক সম্পর্ক ধনাত্মক।

এই চারটি সূত্র মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থান্বেষি ও যৌক্তিক ব্যবসায়ী প্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চারটি সূত্রকে সংগ্রন্থিত করিলে প্রতীয়মান হয় যে আইন প্রয়োগের কার্যকারীতা যতই বৃদ্ধি করা যাইবে, চোরাচালানের মাত্রা ততই হ্রাস করা সম্ভব হইবে। রেখাচিত্র ৩-এ বিষয়টি প্রদর্শিত হইয়াছে।

রেখাচিত্র-৩

Impact of Enforcement on the Level of Smuggling

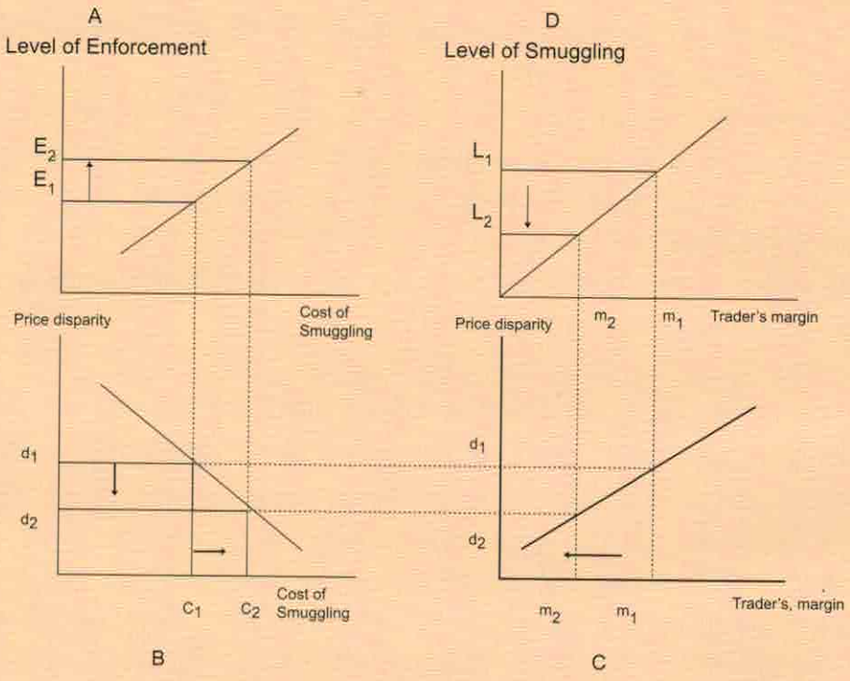

এই রেখাচিত্রে কার্যত: ৪টি রেখাচিত্র রহিয়াছে যাহারা পরস্পর সম্পর্কিত, ইহারা যথক্রমে A, B, C এবং D চিহ্নিত। কার্যকরণ সূত্র যথাক্রমে A হইতে B, B হইতে C, E হইতে D - এই ধারায় প্রদর্শিত। A-তে দেখানো হইয়াছে আইন প্রয়োগ বৃদ্ধি পাইলে চোরাচালানের নির্বাহী ব্যয় বৃদ্ধি পায়, B-তে দেখানো হইয়াছে নির্বাহী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে চোরাচালানী পণ্যের মূল্য প্রভেদ হ্রাস পায়, C-তে দেখানো হইয়াছে পণ্যের মূল্য প্রভেদ হ্রাস পাইলে চোরাচালানের মুনাফা হ্রাস পায় এবং D-তে দেখানো হইয়াছে চোরাচালানের মুনাফা হ্রাস পাইলে চোরাচালান হ্রাস পায়।

মোদ্দাকথা, চোরাচালানের প্রকোপ হ্রাস করিতে হইলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কার্যকরভাবে তৎপর হইতে হইবে। চোরাচালানী পণ্যের আটক ও বাজেয়াপ্তি যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই ইহা হইতে প্রাপ্য মুনাফার হার হ্রাস পাইবে এবং ফলশ্রুতি চোরাচালানের মাত্রা অবনমিত হইবে।

চাকুরি জীবনের শৈশবে যশোর-খুলনা এলাকায় কাজ করিয়াছি। সেই সময় যশোর শহরে ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি, ইলেক্ট্রনিক টু-ইন-ওয়ান ইত্যাদি পণ্যসামগ্রীর সহজলভ্যতা দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতে চোরাচালানের উদ্দেশ্যেই এই সব ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের মওজুদ গড়িয়া তোলা হইত। একটি ক্যাসিও ঘড়ি বাংলাদেশের বাজারে বিক্রয় করিয়া যদি ৫০ টাকা লাভ করা সম্ভব হইত, সীমান্তে অপর পার্শ্বে পাচার করিতে পারিলেই এই লাভের পরিমাণ দাঁড়াইতো ২০০-৩০০ টাকা। এই উচ্চ মুনাফাই ছিল চোরাচালানের মূল প্রণোদনা। বাজার করিবার চটের ব্যাগ ভরিয়া ১০০ টি ক্যাসিও ঘড়ি সীমান্তের অপর পার্শ্বে পৌঁছাইতে পারিলেই ব্যাপক মুনাফা।

এই খুচরা চোরাচালান যশোহর, সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী সাধারণ মানুষের উচ্চ আয়ের প্রধান কারণ। এমতাবস্থায় আপাতত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে চোরাচালানের ভূমিকা জনকল্যাণমুখী। সমস্যা হইল এই যে ঐ ক্যাসিও ঘড়ি বা টু-ইন-ওয়ান বাংলাদেশ ব্যাংকক হইতে সংগ্রহ করিতে হার্ডকারেন্সী অর্থাৎ ডলার-পাউন্ডের বিনিময়ে। পক্ষান্তরে চোরাচালানের মাধ্যম ছিল বাংলাদেশী টাকা বা ভারতীয় রুপী। এইখানেই রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এইখানে রাষ্ট্রকে জয়ী হইতে হইবে কারণ বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী হইলেও এইখানে জনগণের শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন বলবৎ। আইন দ্বারা চোরাচালান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তাই কখনও-কখনও চোরাচালান জনহিতকর প্রতীয়মান হইলেও আইন প্রয়োগে ইহার দমনই শিরোধার্য।

লেখক
ফয়জুল লতিফ চৌধুরী
যুগ্ম সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

যে গল্প লেখা হল না

মোঃ জামাল হোসেন

অফিসে কাজের ফাঁকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা জাহিদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ কাজের চাপ একটু কম। গুগলে ব্রাউজিংয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে জাহিদ ডেস্কটপের সামনে বসেছে। পাশে চায়ের কাপ– তা থেকে গরম ভাপ উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে মানুষ সকালে চায়ের কাপ পাশে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ত। এখন সময় বদলেছে। খবরের কাগজের স্থান দখল করেছে কম্পিউটার।

জাহিদ নেট ব্রাউজ করছে একটা গল্প লেখার উপাদান সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে। ইন্টারনেট থেকে লেখার মসলা সংগ্রহের এ কৌশলটা সে শিখেছে লেখক আনিসুল হকের কাছ থেকে। আনিসের গদ্য কার্টুনের চুটকিগুলো সব নেট থেকে হাতিয়ে নেয়া– অনেকটা পরের ধনে পোদ্দারি।

লেখালেখি জাহিদের আলগা শখ। তার এ শখের কথা ইতমধ্যে চাউর হয়ে গেছে। এতে জাহিদের 'খাল কেটে কুমির আনা'র অবস্থা হয়েছে। এখন প্রায়ই লেখার ফরমায়েশ আসছে– দিন দিন ফরমায়েশের সংখ্যা বাড়ছে। জাহিদ অর্ডার অনুযায়ী মাল ডেলিভারী দিতে পারছে না।

সম্প্রতি এক সহকর্মী জাহিদকে অনুরোধ করেছে একটি লেখা পাঠাবার জন্য– সেটি আবার হতে হবে মজাদার। জাহিদ ভাবল– মোটে মায় রান্ধে না আবার গরম আর পান্তা।

সহকর্মীটি স্বভাবে খাঁটি জোঁক। জোঁক যেমন গায়ে সেঁটে থাকে ভদ্রলোকও তেমনি জাহিদের পেছনে আঠার মত লেগে আছে। তাঁর লেগে থাকার ক্ষমতা অসাধারণ। কলিগ প্রবর অনুরোধ করেই বসে নেই– ফোনে তাড়ার পর তাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এখন সেলফোনের স্ক্রীনে তাঁর নম্বর দেখলে জাহিদ রীতিমত আঁতকে উঠছে।

সহকর্মীর অনুরোধে জাহিদ ঢেঁকি গিলে পড়েছে মহা ফাঁপরে। সে এখন ঢেঁকিটি হজমও করতে পারছেনা আবার উগড়েও ফেলতে পারছে না।

অনুরোধ রক্ষার্থে কিছু একটা লেখবার জন্য জাহিদ গত কয়েকদিন ধরে অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে– লেখা আসছে না। জুতসই সাবজেক্টও জাহিদ খুঁজে পাচ্ছেনা। আবার সাবজেক্ট মিললেও সেটি গল্পে রূপ নিচ্ছে না। মাঝ পথেই গল্প-ভাবনা নদীর পানির মত বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে উর্ধ্বলোকে।

স্বাধীনতার মাস। জাহিদ তাই একজন বীরাঙ্গনাকে নিয়ে কিছু লেখার কথা ভাবল। গল্পের একটা ছকও তার মাথায় ঘুরছে। ছকটি হল এরূপ– দীর্ঘকাল রোগে ভোগার পর গতকাল নুশরাত জাহান ব্যাংকক হাসপাতালে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। অন্তিম সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র রুমী নোমান খাঁন।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নুশরাত জাহান ছেলেকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। ছেলে কাছে আসতেই তিনি ছেলের হাতে একটি মুখবন্ধ পুরনো খাম তুলে দিলেন। তারপর নুশরাত জাহান অনেক কষ্টে কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন– খোকা, এটি রাখ, আমার মৃত্যুর পর খুলবি। বিগত চল্লিশ বছর তুই যা জানতে চেয়েছিস এর ভিতরেই তুই পেয়ে যাবি তার উত্তর।

কথা শেষ করতেই নুশরাত জাহানের মাথা ডানে এলিয়ে পড়ল– তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বন্ধ খামটি হাতে নিয়ে রুমী নোমান নির্বাক বসে রইল।

কল্পনায় জাহিদ গল্পটির নাম ঠিক করেছিল, "বীরাঙ্গনা ও একটি মুখবন্ধ খাম"। কিন্তু এ পর্যন্তই ছকমত গল্পটি আর এগোয়নি, কারণ– বেশ কিছুদিন যাবৎ জাহিদের লেখার কনস্টিপিউশন চলছে। কেতাবি ভাষায় যাকে বলা হয় রাইটার্স ব্লক।

কনস্টিপিউশন থেকে মুক্তি পেতে লোকেরা যেমন শাক-সব্জি, ইসপগুল, এলোভেরা খায় তেমনি জাহিদও রাইটার্স ব্লক থেকে মুক্তি লাভের জন্য লভ্য সবকিছুই অনুশীলন করেছে, কিন্তু লেখার কোষ্ঠ-কাঠিন্য কাটাতে পারেনি। অথচ জাহিদ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছে তার বন্ধু-সহকর্মীরা অবিরাম লিখে চলেছে।

জাহিদের এক সহকর্মী আরিফুল ইসলামের কথাই ধরা যাক– তার প্রজনন ক্ষমতা অবিশ্বাস্য (লেখালেখির ক্ষেত্রে)। যদ্যপি তিনি কলম হাতে নেন, অমনি গোটা তিনেক কবিতা জন্ম নেয়। সে কবিতায় গ্রীক সুন্দরী ভেনাসের নগ্ন বক্ষ থেকে শুরু করে তীর্থ স্থানের পবিত্রতা বাঙ্ময় হয়ে উঠে শব্দের আঁচড়ে।

জাহিদ শুনেছে আরিফ রেগুলার পেগ ও পেঁপে ইস্তেমাল করে। এ দুটোর পান/ভোজনের সাথে কবিতা রচনায় কোন ধনাত্মক সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে জাহিদও পেঁপে ভক্ষণ শুরু করেছে। এতে জাহিদের শারীরিক কিছু উপকার হলেও– কবিতা হয়নি। পেঁপে থেরাপি যে কাজে লাগেনি তা বুঝা যায় তার নিম্নরূপ পদ্য রচনার প্রচেষ্টা থেকে ঃ

আমাদের মায়মুনার বাপ
সারা রাত স্বপ্নে দেখে সাপ
সকাল বেলা কোষ্ঠ হয় না সাফ
সারাদিন মেজাজ থাকে না খোশ
কথায় কথায় করে ফোঁস ফোঁস ॥

একদিন জাহিদ সহকর্মী আরিফকে জিজ্ঞেস করল– গুরু, নিয়মিত পেঁপে খাচ্ছি, কিন্তু লেখা তো বেরুচ্ছে না।
সহকর্মীর প্রশ্নের জবাবে আরিফ গম্ভীর স্বরে বলল– শিষ্য, তুনে, স্রেফ পেঁপে কিয়া, পেগ তো নেহী কিয়া। দারু পি লাও ব্যাটা– লেখা জরুরি হোয়া।
আরিফের কথায় জাহিদ ভাবনায় পড়ে গেল। এ বয়সে নতুন করে পেগ ... ?

জাহিদের আরেক বন্ধু ড. আব্দুল হান্নান তালুকদার কি অবলীলায় জীবনকে পদ্যময় করে তুলেছেন। স্ত্রী আগরকে কানাডায় ডেসপ্যাচ করে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভার। এখন সমুদ্র সৈকতে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে লিখছেন–

এসো, এসো হে প্রিয়ে
ডুবি দোহে সাগরের জলে
ডুবন্ত (ওই) দিবাকর সম
জুঁড়াতে বিরহী হৃদয় মম।

তার মতও হতে পারলাম কই? এমন স্বগতোক্তি করে নিজের অজান্তেই জাহিদ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে।

পাহাড় দেখলে যার মাথা চক্কর দেয়, সমুদ্র সৈকতের কথায় যার মনে পড়ে চোরাবালির কথা– সাগর-জল মনে জাগায় ডুবে যাওয়ার শঙ্কা এ হেন লোকের আর যাই হোক কবিতা হবার নয় এ বিষয়ে জাহিদ এখন নিশ্চিত।

ঠিক আছে কবিতা না হয় হল না কিন্তু গদ্য? তারও তো শনির দশা। অথচ জাহিদের জুনিয়র সহকর্মী অরুনের কি দুর্দান্ত ফর্ম। এই যুবকের কলমে গল্পোপন্যাস ছাগলের ল্যাদার মত অবিরাম নিঃসৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যে অরুণ ঔপন্যাসিকদের তালিকায় নিজের নাম নিবন্ধিত করে ফেলেছে। কালি-কলমের শিল্পিত দ্রবণে সে সমাজের উপরতলার লোকদের চায়-চরিত্র, ভোগ-সম্ভোগের চিত্র এঁকে চলেছে চমৎকারভাবে (ইদানীং সে কবিদের ভাত মারার তালে আছে)।

এসব বরেণ্য লিখিয়েদের মাঝে জাহিদ নিজেকে নিতান্তই অধম–অভাজন মনে করে। সে তার অবস্থাকে তুলনা করে অপরিণত পাতি লেবুর সাথে, অনেক চিপা-চিপির পরও যা থেকে দু'এক ফোঁটার বেশী রস নির্গত হয় না– তাও কালেভদ্রে।

ইদানীং লেবুতে রাম চিপা দিয়েও জাহিদের কাজ হচ্ছে না। তার এক কালের সুহৃদ সহকর্মী শাহরুখ সালেহীন কয়েকদিন আগে তো বলেই ফেলল– কি ভাইজান, পোতাইয়্যা গেছেন না কি?
জাহিদ– ভাই, শুধু পোতাইলে ভালই হত, ভোঁতাইয়্যাও গেছি।

জাহিদ ভাবনা থেকে বাস্তবে ফিরে এল। তার মনে পড়ল সহকর্মীর ফরমায়েশী লেখা জমা দেবার ডেট লাইন দ্রুত এগিয়ে আসছে। জাহিদ ডেস্কটপের ওয়ার্ড ফাইল খুলল– চেষ্টা করল ছক কাটা গল্পটির একটি অবয়ব দিতে। এমন সময় জাহিদের বন্ধু আহমদ ফাজায়েল কোরায়েশী এসে উপস্থিত।

ফাজায়েল একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। সে অকৃতদার– সংসারের ঝুট ঝামেলা নেই। হাতে তার অঢেল সময়। বন্ধুদের অফিসে অফিসে ঢু মারা তার রুটিন ওয়ার্ক।

বন্ধু মহলে রসিক হিসেবে ফাজায়েলের বিশাল খ্যাতি। তার সঙ্গ উপভোগ্য। জাহিদরা 'ফাজায়েল'কে সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃত করে ফাজিল নামে ডেকে থাকে।

অসময়ে ফাজিলের আগমনে যে লেখার বারোটা বাজল জাহিদ তা ভালমতই বুঝতে পারল। কারণ ফাজিল মহোদয় সহজে উঠবার পাত্র নন।

সাধারণত একজন আর একজনের সাথে দেখা হলে বলা হয়–কিরে, ক্যামন আছিস? কি করছিস? শরীর ক্যামন? কিন্তু জাহিদের এ বন্ধুটি এ কথাগুলোই বলবে একটু অন্যভাবে–কিছুটা আদি রস মিশিয়ে। যেমন–জাহিদকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে দেখে সে বলল– কীরে, কি ছিড়ছিস বুড়ো খোকা?

জাহিদ– (বাজে ধরনের একটা জবাব দিতে গিয়েও সংযত হল। ভদ্র ভাষায় বলল) দোস্ত, কিছু ছিড়ছি নারে, ইন্টারনেট ঘাটছি। লেখালেখির জন্য মজাদার বিষয় অনুসন্ধান করছি। তা এ অসময়ে তুই কি মনে করে?
ফাজিল– বড্ড চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। আগে চা-চু এর অর্ডার দে তারপর বলছি কেন এসেছি।
অগত্যা অন্তর্জাল সংযোগ ছিন্ন করে জাহিদ তার পিয়নকে চায়ের অর্ডার দিল। তারপর বন্ধুর দিকে মনোযোগ দিয়ে বলল–বল হে ভবের পাঠা, তব আগমন হেতু।
ফাজিল– এ্যাই, তোদের তো বিরাট অসুবিধা হয়ে গেল?

জাহিদ– তার মানে? কি অসুবিধা? খুলে বল–ত? (কিছুটা চিন্তিত ভঙ্গিতে)।
ফাজিল– তোদের এয়ারপোর্টে কাস্টমসের দায়িত্বে এখন নাকি একজন লেডী কমিশনার?
জাহিদ– হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছিস মিঃ শাখামৃগ। তাতে তোর অসুবিধা কি? লেডী কমিশনার অন্য জায়গায় থাকতে পারলে এয়ারপোর্টে থাকতে পারবেনা কেন? এখনতো মহিলা পুরুষ তফাৎ নাই। তাছাড়া এটি নারীর ক্ষমতায়নের যুগ। একজন সাংবাদিকের সেটি ভুললেতো চলবে না বাছাধন। ক'দিন অপেক্ষা কর সোনা, মহিলা আইজিপি, মহিলা সেনাপ্রধান, মহিলা প্রধান বিচারপতি এলো বলে।

ফাজিল– আরে যে দেশে পজিশন এবং অপজিশনে মহিলা সেখানে মহিলা সেনাপ্রধান, বিচারপতি আর এমনকি। তবে চিন্তা করতেছি বর্তমান কমিশনার লোকজনের সোনা ধরবে ক্যামন করে!
জাহিদ– তুই তার সম্পর্কে জানিস না। সে আমাদের জিনিয়াসদের অন্যতম। ভেরি স্মার্ট এন্ড এ্যাক্টিভ। সোনা যেখানেই লুকানো থাক না কেন সে ঠিক খুঁজে নেবে।

কথাটা শুনে বন্ধুটি সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ বেকিয়ে শুধু হাসল। জাহিদ তার হাসির অর্থ খুঁজতে যাচ্ছিল। এমন সময় পিয়নটা চা নিয়ে ঢুকল। দু'জনে আয়েশ করে চা খেল। চা খেয়েই ফাজিল বিদায় নিল। প্রেস ক্লাবে নাকি তার কি এক জরুরি কাজ আছে। যাবার আগে মুচকি হেসে সে জাহিদকে বলল– দোস্ত, তুই আগের মত ভোদাই–ই রয়ে গেলি।

জাহিদের বন্ধুটি ছন্নছাড়া হলেও সাংঘাতিক ট্যালেন্ট। তার উইট এন্ড হিউমার সেন্স অসাধারণ। তার প্রতিটি কথার ভিতর একটা কিছু থাকে।

জাহিদ ভাবতে লাগল বন্ধু ফাজিল তাকে 'ভোদাই' বলে গেল কেন? সামান্য সময়ের অবস্থান ও কথা-বার্তার মধ্যে সে জাহিদের 'ভোদাইয়ত্বের' কি দেখল?

জাহিদ তার এবং বন্ধুর মধ্যকার কথোপকথন রিওয়াইন্ড এন্ড রিভিউ করতে শুরু করল। প্রথমবার আপত্তিকর কিছুই পেলোনা। "একবার না পারিলে দেখ শতবার" থিওরী অনুসরণ করে জাহিদ আবার রিওয়াইন্ড করল। 'সোনা ধরা' জায়গায় চোঁখটা আটকে গেল। এবার জাহিদ বুঝতে পারল তার বন্ধুটি কি ইঙ্গিত করে গেল, মনে মনে জাহিদ হাসল। খানিকটা কনফিউসডও হল। সত্যিই তো এই লেডী কমিশনার মানুষের সোনা ধরবে ক্যামনে?

কনফিউশন দূর করার লক্ষ্যে জাহিদ কাস্টম হাউসের কমিশনার রাজিয়া সুলতানাকে ফোন করল। সে জাহিদের ব্যাচমেট, বয়সেও কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠতর। জাহিদকে রাজিয়া বড় ভাই মানে। তার সাথে জাহিদের ফোনালাপ নিম্নরূপ–
জাহিদ– হ্যালো, ক্যামন আছো?
রাজিয়া– ভাল, আপনি ক্যামন আছেন ভাইজান?
জাহিদ– ভালরে বোন–ভাল, তবে একটা বিষয়ে একটু টেনশনে আছি।
রাজিয়া– ক্যান, টেনশন কীসের?
জাহিদ– টেনশন তোমাকে নিয়া ভাই, এয়ারপোর্ট বড় ঝামেলার জায়গা। মহিলা মানুষ তুমি ক্যামনে সামলাবা। একটু এদিক সেদিক হলেই পুরো ব্যাচের বদনাম। বুঝনা, আমাদের ব্যাচটারতো একটা আলাদা সুনাম আছে। তাছাড়া তোমার আগের কমিশনার সাদেকী সাহেবের পারফর্মেন্সতো ছিল এক্সিলেন্ট। গতবার সে সারা বছরে দেড়শ লোকের সোনা ধরে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছে (তাঁকে একটা সোনার প্রতীক উপহার দেওয়া সমীচীন ছিল)। সাদেকীর সেই অর্জনকে অতিক্রম করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে কী না? কে জানে? টুট্টা হাফিজ হলে কথা ছিলনা– সে বদের হাড্ডি। সোনা দেখলেই খপ করে ধরে ফেলে।

রাজিয়া– আরে ভাই কন কি? দোয়া করেন। দ্যাহেন কি করি। দেড়শতো মামুলি ব্যাপার। আমার টার্গেট পাঁচশ। এয়ারপোর্ট দিয়ে সোনা (!) সাথে নিয়ে চলাচল চিরতরে বন্ধ করে দিব।
জাহিদ– বাঁচাইলা বইন। চিন্তামুক্ত হইলাম। তুমি যে ব্যাচের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে পারবা এতে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। তোমার লক্ষ্য যেমন অনন্য, তেমন অনবদ্য। মে গড ব্লেস ইউ।
রাজিয়া থ্যাংকয়্যু; থ্যাংকয়্যু ভাই বলে ফোন রেখে দিল।

সহকর্মীর দৃঢ় মনোবল এবং লক্ষ্যমাত্রার কথায় জাহিদ টেনশন ফ্রি হয়ে আবার ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে মন দিল। কিন্তু ব্রাউজিংয়ে মন লাগল না, মাথায় থাকা ভাবনাগুলোও হয়ে গেলো এলোমেলো। অগত্যা জাহিদ দাপ্তরিক কাজে ফিরে এল।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। জাহিদ ন'টার আগেই অফিসে এসেছে। বাসা থেকেই ঠিক করে এসেছে আজ সে বীরাঙ্গনাকে নিয়ে অসমাপ্ত গল্পটা লিখে ফেলবে। যথারীতি ডেস্কটপ খুলে বসেছে ব্রাউজ করে মুক্তিযুদ্ধের কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মজিলায় সার্চ দিয়েছে মাত্র ঠিক এ সময়ে কাকতালীয়ভাবে ফাজিল এসে হাজির। ফাজিলকে দেখে জাহিদের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল– শালা বান্দর আসার আর সময় পেলনা। তবে মুখে কিছু বলল না– বন্ধু বলে কথা। তাছাড়া ফাজিল লোক ভাল।

চেয়ারে ধপ করে বসেই ফাজিল বলল– কিরে সোনাধরা কাস্টমস অফিসার, খবর কি? পেপার পত্রিকায় দেখছি তোরা বেশ সোনা-টোনা ধরছিস। তা এত সোনা রাখছিস কোথায়?
জাহিদ– কেন! জানিস না? সব সোনা পাঠিয়ে দিচ্ছি ড. আতিউর রহমান সাহেবের কাছে।
ফাজিল– (কিছুটা বিস্মিত হয়ে) আতিউর রহমান! সে আবার কে?
জাহিদ– সে আমার দুলাভাই। বিয়ের সময় বোনকে গহনা দিতে পারি নাই তো তাই এখন যেখানে যত সোনা-দানা পাই সব পাঠিয়ে দেই তাঁর কাছে। যাতে বোনকে মনের মত করে গহনা বানিয়ে দিতে পারেন।
ফাজিল– ভনিতা ছাড়। সোনা আতিউর রহমানের কাছে পাঠানোর ব্যাপারটা খুলে বল।
জাহিদ– শোন্ গণ্ডমূর্খ। ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। কাস্টমস যত সোনা ধরে সেগুলো সাথে সাথেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংকে।
এতক্ষণে ফাজিল জাহিদের রসিকতা ধরতে পারল। সে হোহো করে হেসে উঠে বলল– মাইরি, জব্বর বলেছিস।
ফাজিল– আচ্ছা দোস্ত, এত সোনা অবৈধভাবে আসে কেন?
জাহিদ– দেখ, বন্ধু এর কোন জবাব এক কথায় দেওয়া সম্ভব না। এর কারণ বহুবিধ। তা বিস্তারিত বলতে গেলে বাল্মিকী'র মহাভারত হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং তুই ফকির আশরাফের 'সোনা ডলার টাকা' বইটা পড়ে নিস।
ফাজিল– সে না হয় হল। কিন্তু তুই সোনা ধরা নিয়ে একটা ঘটনা শোনাতে চেয়েছিলি– গল্পটা শুনা হয়নি। আজ সময় আছে গল্পটা শুনিয়ে ফেল। বাই দ্যা ওয়ে চা দিতে বল। চা খেতে খেতে তোর গল্প শুনি।
জাহিদ– শোন্ তাহলে। ঘটনাটি আমার এক দাদার কাছ থেকে শোনা। কাস্টমস ক্যাডারে চান্স পাওয়ার পর তাঁর দোয়া নিতে গেলে দাদাজান এ কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।

জাহিদ শুরু করে– ঘটনাটি স্বাধীনতা পূর্বকালের– ঘটনাস্থল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী এয়ারপোর্ট। ঘটনার নায়ক করাচী এয়ার পোর্টে কর্মরত এক বাঙ্গালী কাস্টমস অফিসার।
কাজে-কর্মে তুখোড় এ কর্মকর্তার নাম মোহাম্মদ আসলাম বেঙ্গল। নোয়াখালীর পোলা আসলাম এয়ারপোর্ট কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে পদস্থ ছিল। আসলামের নামে করাচী এয়ারপোর্টের তাবৎ চোরাচালানী থাকত কম্পমান। স্মাগলাররা চেষ্টা করত তার শিফট এড়িয়ে চলতে।

একদিন আসলাম একটি গোপন সংবাদ পেল। সংবাদদাতা জানালেন, পরদিন আসলামের শিফট চলাকালে একটি স্বর্ণের চালান পাচার হবে। ইনফর্মার শুধু এটুকু বলেই লাইন কেটে দেয়– বিস্তারিত কিছু বলে না। ফলে আসলাম পড়ল অথৈ সাগরে। তার অবস্থা হল সাগর জলে সুঁই খোঁজার মত।

পরদিন আসলামের ডিউটি চলছে। ফ্লাইট নেমেছে– যাত্রী সংখ্যা সাড়ে চার'শ। এক এক করে যাত্রীরা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে আসলাম যাত্রীদের উপর নজর রেখে চলেছে।
ঘন্টা খানেক নজরদারির পরও আসলামের চোখে সন্দেহজনক কিছুই ধরা পড়ল না। সে ভাবল– সম্ভবত ইনফর্মেশনটি ভুয়া। এদিকে তার শিফটও প্রায় শেষ– কিছুক্ষণ পরই বাড়ী ফিরতে হবে।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আসলাম চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই তার চোখ পড়ল এক ভদ্রমহিলার উপর। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে মহিলা ইমিগ্রেশন পেরিয়ে কাস্টমসের গ্রীন চ্যানেলের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মহিলা মধ্য বয়সী হলেও অপূর্ব সুন্দরী। তার পরনে দামি শাড়ী– চুল বয়কাট, চোখে-মুখে আভিজাত্যের স্ফুরণ, চলার ভঙ্গি– ড্যাম স্মার্ট।

আসলামের মুগ্ধ চোখ মহিলাতে আটকে গেল। এক পর্যায়ে তার দৃষ্টি মহিলার অপরূপ মুখাবয়ব থেকে বক্ষোপটে নিবদ্ধিত হল। বয়স অনুপাতে মহিলার বুকের গঠন আসলামের চোখে একটু বেশী মাত্রায় তীর্যক মনে হল। আসলামের মনে সামান্য খটকা লাগল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে গেল। আসলামের মনে প্রশ্ন জাগল– ভদ্র মহিলার বক্ষ ধাতব কিছু দ্বারা আবৃত নয়তো? আসলাম একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিল।

একটি ধাতব পাইপের মত লাঠি হাতে আসলাম মহিলার নিকটবর্তী হল। মহিলাকে পাশ কাটতে গিয়ে আসলাম অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে হাতের লাঠি দিয়ে তার বাম বুক লক্ষ্য করে একটি খোঁচা মারে। ভাবখানা এমন যে, ব্যাপারটি নিতান্তই অসাবধানতাবশত ঘটে গেছে। এতে টং করে একটা শব্দ হল। দু'টি ধাতব বস্তুর পারস্পরিক সংঘর্ষেই এমন শব্দ হতে পারে। শব্দটি ভদ্র মহিলার শরীরে ধাতব বস্তুর উপস্থিতিকে দৃঢ় করল। নিজের অজান্তেই আসলাম বলে উঠল 'ইউরেকা'। মহিলাকে আটক করে বডি সার্চের ব্যবস্থা করা হল।

দেখা গেল, সত্যি সত্যি মহিলার অন্তর্বাসটি স্বর্ণের। ইন্টারোগেশনে বের হল মহিলা আন্তর্জাতিক স্বর্ণ চোরাচালানী দলের সদস্য। অতীতে বেশ কয়েকবার এ কায়দায় সে স্বর্ণ পাচার করেছে। কিন্তু এবার আসলামের অভিজ্ঞ গোয়েন্দা চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি।

ঘটনাটি বলার পর বন্ধু ফাজায়েলের দিকে তাকিয়ে তার মুখে জাহিদ দুষ্টু হাসি দেখতে পেল। হাসতে হাসতে সে নিজে নিজেই আওড়ালো, হুঁম– বটে, লক্ষ্যভেদী ধাতব খোঁচা। তারপর ফাজায়েল কোরায়েশী প্রস্থানোদ্যত হয়ে জাহিদের উদ্দেশ্যে বলল– বাছাধন, এ যুগে অমন খুঁচাখুঁচি করতে যেওনা– খোঁচা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে।

বন্ধুর গমন পথ থেকে জাহিদের দৃষ্টি ডেস্কটপের স্ক্রীনে ফিরে এল। সেখানে ভেসে উঠেছে Page can't open। জাহিদের হতাশা সীমা ছাড়াল। তার মনে হল– বীরাঙ্গনার গল্পটা বুঝি কল্পনাতেই থেকে যাবে– কোন দিন কালো অক্ষরে রূপ নেবে না।

জাহিদের হৃদয় চিরে বেরিয়ে এল একটি দীর্ঘশ্বাস! ক্ষণকালের জন্য সে হারিয়ে গেল কল্পলোকে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মুখবন্ধ একটি খাম। খামের উপর এক অপরূপার ছবি– এলোচুল, টানা টানা চোখ দু'টি অতি বিষণ্ন। ছবিটি দেখে জাহিদ চমকে উঠল। নিজের অজান্তেই সে বলে উঠল– কে তুমি? কি আছে তোমার ঐ মুখবন্ধ খামে?
এর উত্তরে অপরূপার ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠল স্মিত হাসি। সে হাসি মোনালিসার হাসির চেয়ে রহস্যময়– অবোধ্য।

লেখক
মোঃ জামাল হোসেন
কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম

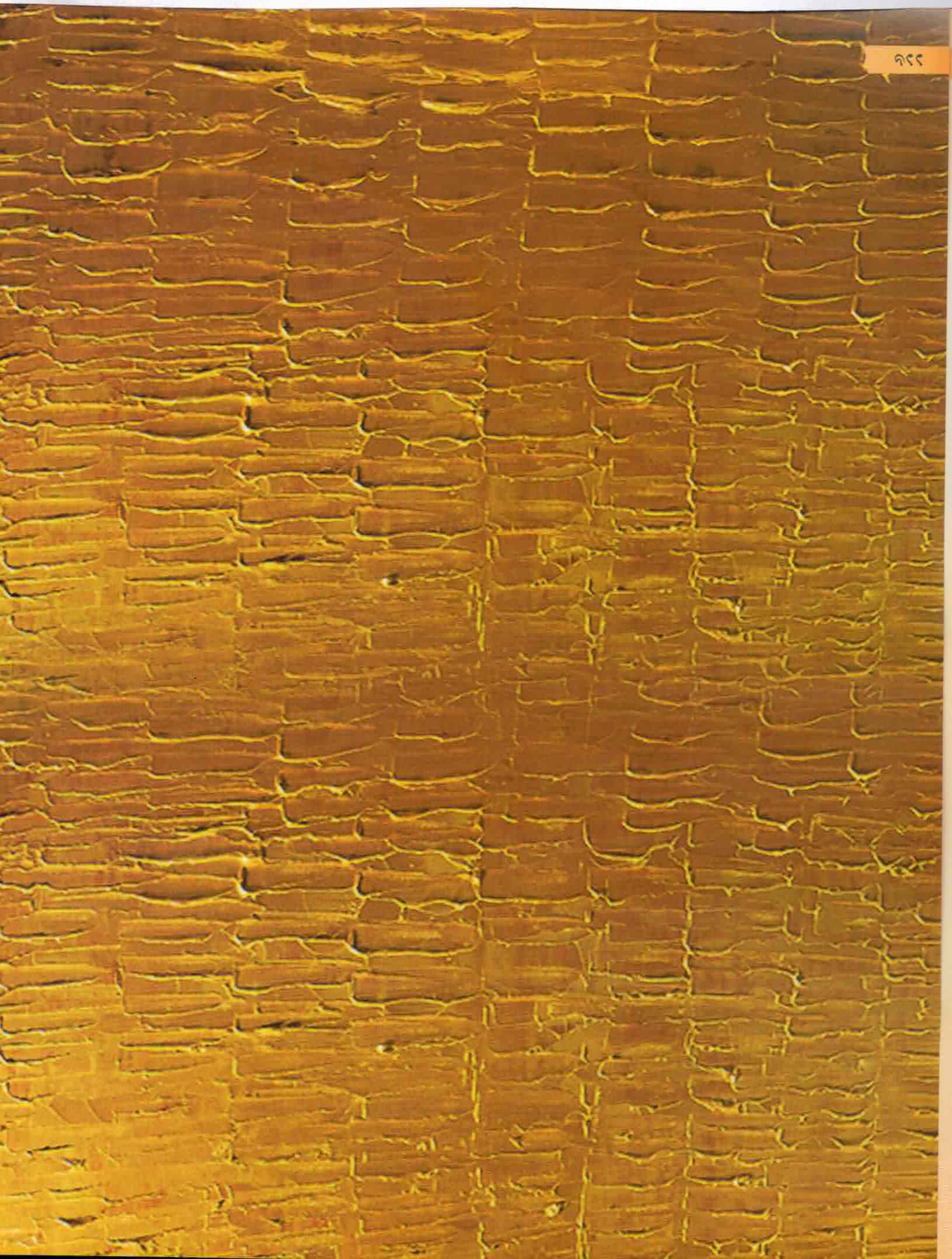

এতো সোনা যায় কোথায়?

মইনুল খান

– এই যে আপনারা গোল্ড ধরছেন, এটি কোথায় যায়?

– সরকারী খাতে জমা হয়।

– এটি মূল্যবান জিনিস, এটি কী কোনভাবে তছরুপ হয় না? কেউ কী এগুলো মেরে দেয় না? একটা দুইটা পকেটে নিলেতো দেখার কেউ নাই।

– কীভাবে সম্ভব?

– কেন কেউ একটা দুইটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলেতো ব্যাস! কে দেখে?

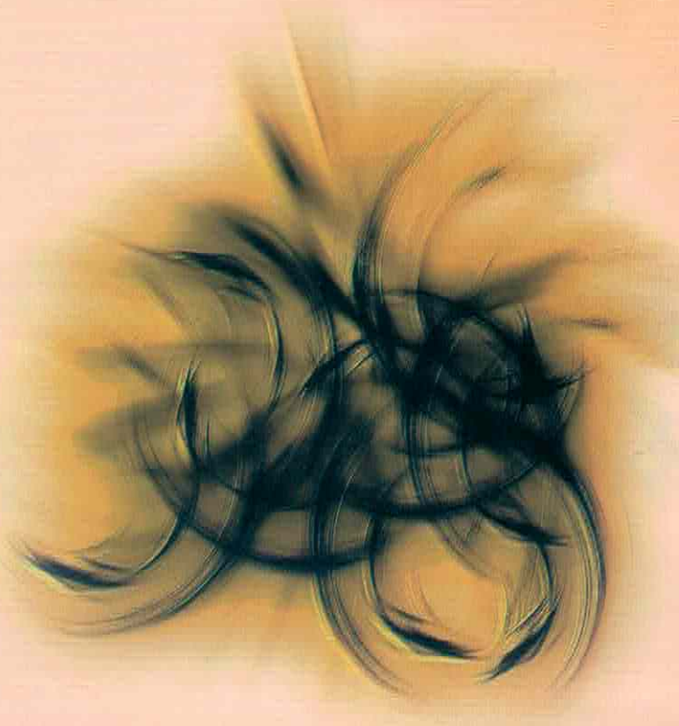

প্রশ্নগুলো সাংবাদিকের। গোল্ড চালান ধরা পড়েছে। হযরত শাহজালাল এয়ারপোর্টে। এটি হঠাৎ ধরা পড়েনি। এর পেছনে ইন্টেলিজেন্স প্রয়োগ করা হয়েছিলো। অনেক মেধা খাটিয়ে সোর্স নিয়োগ করে এর পিছু নেয়ার ফল এটি। সামনে গোল্ড বারের সারি। টেবিলে সাজানো হয়েছে। থরে থরে। সবগুলো এক ওজনের। হলমার্কযুক্ত। এর মানে হলো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্বর্ণকার দ্বারা সিল করা। প্রতিটি বারের গায়ে খোদাই করে লেখা। বারগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থও এক। স্কয়ার শেপের। এগুলো তাপে গলিয়ে অলংকার তৈরি হয়। অন্যকাজেও ব্যবহার হতে পারে।

এটি যেভাবে আছে, হয়তো সেভাবে রেখে দেয়া হতে পারে। বারের গায়ে ওজন দেখানো হয়েছে। একেকটি ১০০ গ্রামের বার। ১০ সারিতে ১২টি কলাম। ১২০টি বার। হিসাবে বোঝা যায় যিনি বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি হিসাবমতো কিনেছিলেন। ১০০টি বারে হয় ১২,০০০ গ্রাম। মানে ১২ কেজি। বাজার মূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা। হলমার্ক সাইন থাকাতে ওজনে তেমন তারতম্য হবে না। তবুও গোয়েন্দা অফিসার ওজন নিলো। ঠিক তাই হলো।

সাংবাদিকের এই প্রশ্ন নতুন নয়। রাগ হলো না। রাগ হবে কেন? সরকারী কর্মকর্তা। কোন কিছুতে আবেগ দেখানো সঙ্গত নয়। রাগ সাধারণ লোকের জন্য। সরকারী কর্মকর্তা ভিন্ন প্রকৃতির। অন্যরা যা পারে, তা এরা পারে না। এদের চলাফেরা, কথাবার্তায় ও আচরণে আছে শৃঙ্খলতা। এরকম একটি বিধি হচ্ছে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৭৯। এতে বলা আছে কী করা যাবে, কী করা যাবে না। মাথা ঠাণ্ডা। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে ব্রেইনের ভেতরে যুক্তির চেম্বারটি ভালোভাবে কাজ করে।

এই যে প্রশ্ন তা কী উড়িয়ে দেয়ার মতো? মুচকি হাসলাম। মুচকি হাসার মধ্যে দিয়ে অনেক পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায় সহজে। মোনালিসার হাসি। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এঁকেছেন। এই ছবি কেন বিখ্যাত? কেউ ব্যাখ্যা করেন ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। যার যেমন সুবিধা, তেমন হয়তো। যিনি প্রশ্ন করেছেন, তিনি বুঝলেন আমি তার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়েছি। একসাথে প্রশ্ন নামক তীরের যে ধার তা কিছুটা ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। একজন বলেছিলেন, পৃথিবীতে অনেক সমস্যার সমাধান হয় দুটো কৌশল দিয়ে। একটা হলো নীরবতা (সাইলেন্স), আরেকটি হলো হাসি (স্মাইলিং)। নীরবতা পালন করলে, কোন শত্রু খোঁচাতে পারবে না। রিএ্যাক্ট করলে সুযোগ পেয়ে যাবে শত্রু। আবার হাসি দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন সামাল দেয়াটা সহজ হয়। মিলন নামের এক বন্ধু একটা এসএমএস বার্তা দিয়েছিলো চমৎকার কথা দিয়ে। বার্তাটির মর্ম হলো, যখন তুমি আনন্দের ভাবে থাকো তখন কাউকে প্রমিজ করো না। করলে এমন প্রমিজ বের হবে তা পরে রাখা যাবে না। এতে তোমার বন্ধুরা আহত হবে। আবার যখন দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকো, তখন কোন জবাব দিও না। কারণ এতে জবাবে রাগের আবেগ চলে আসবে। এতে পরিবেশ আরো জটিল হবে। সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরো নতুন সমস্যা যোগ হবে। আর যখন রাগান্বিত হও, তখন সিদ্ধান্ত নিও না। কারণ এতে কস্ট-বেনিফিট এনালাইসিস করার পথ সংকুচিত হয়। কথাগুলো বন্ধু মিলনের নয়, বুঝা যায়।

হয়তো কোন মনীষীর ভাণ্ডার হতে কপি করে বার্তাটি ছেড়েছে। কপি হলেও এর গভীরতা অনেক। কথাগুলো ভাবার সময় পেলাম দৈব কারণে। একজন ক্যামেরাম্যান ছুটোছুটি করার কারণে স্পিকার আর ক্যামেরার সংযোগটি ছিঁড়ে গেছে। কিছুক্ষণ সময় পাওয়া গেলো। প্রশ্ন শুনে জবাব দেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

সংযোগ দ্রুত পুনঃস্থাপন হয়ে গেলো। আবার ক্যামেরাগুলোর লাইট অন হলো। সঙ্গে সঙ্গে ডজনখানেক ক্যামেরাও। স্পিকারগুলো হাতে নিয়ে আবার একেক করে প্রশ্ন। যাদের হাতে স্পিকার তাদের অনেকে পরিচিত।

চোরাচালান ধরা পড়ার কারণে এই লোকগুলো বারবার এসেছে এয়ারপোর্টে। ক্যামেরার বাইরেও অনানুষ্ঠানিক কথা হয়েছে এদের সাথে। ইন্টারভিউর সুবাদে একসাথে চা খাওয়ার সুযোগ হয়েছে। মুখচেনা লোকগুলোর এমন প্রশ্ন কেন? কেন এই সন্দেহ? তবে আশ্চর্য হলাম না। কেন রাগ হবো! যেখানে দুর্বলতা নেই, সেখানে স্পষ্টভাষী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজ করতে গিয়ে 'এ্যাক্ট অব অমিশন' বা ভুল হতে পারে। দেখতে হবে 'এ্যাক্ট অব কমিশন' বা ইচ্ছাকৃত ভুল কি না? কেউ যদি ফিডব্যাক দিয়ে ভুল ধরিয়ে দেয়, তা সহজে মেনে নিতে হবে। ভালো পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এতে দোষের কিছু নেই। মিডিয়া হচ্ছে জনগণের দর্পণ। তারা যে প্রশ্ন করেন তা প্রতিনিধিত্বকারী। তারা জনগণের মাঝে মিশে, তারা জানে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি কী? জনগণের ভাবনাগুলো তাদের কৌতূহলে থাকে। তাদের কৌতূহল জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। পাবলিক পারসেপশন নেতিবাচক হলে, তার পেছনে হয়তো কারণ আছে। কারণটি জানা থাকলে আবার এটিকে বিবেচনায় এনে সমাধান করা সহজ। ভিত্তি না থাকলে সেটিও তুলে ধরা উচিত। ভুলটি ভেঙ্গে যাবে। নইলে এটি থেকে যাবে সত্য হয়ে। পদে পদে সম্মুখীন হতে হবে এধরনের প্রশ্নের। সাংবাদিকের অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়ে গেছে। কী ঘটেছিলো, কেন ঘটেছিলো, কারা জড়িত, কী পরিমাণ, ধরা পড়ার পরবর্তী কার্যক্রম কী? কাগজে নোট করে রেখেছিলাম তথ্যগুলো। এগুলোর বাইরেও জবাব দিলাম। সাংবাদিক রিতা রহমানের প্রশ্নটিতে সবার কৌতূহল বেড়ে গেলো। এটি যেন সবার প্রশ্ন। রিতা একটি বেসরকারী টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার। দীর্ঘদিন আছে এই জগতে। একবছর আগে এসেছে এই চ্যানেলে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে সাংবাদিক। জেন্ডারেও মহিলা, আগ্রহ ও কৌতূহল প্রবল। ঝুঁকি নেয়াতে কোন বালাই নেই।

– এতো গোল্ড যায় কোথায়? কী করেন এই গোল্ড দিয়ে?

আবার অকাট্য প্রশ্ন। এতে তীর মেশানো ঝাঁজ। তীরের আঘাত দেখা যায়, কথার আঘাত দেখা যায় না। এটি কেবল অনুভব করা যায়। কথা মানুষকে তীরের মতো বিঁধতে পারে। আরেকবার বুঝলাম। সহাস্যে তাদের ধন্যবাদ দিলাম প্রশ্নটি করার জন্য। এটি নিশ্চয় আপনার একার প্রশ্ন নয়। এধরনের জিজ্ঞাসা একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এর যথাযথ জবাব থাকা দরকার। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার খাতিরে এটি হওয়া উচিত। আমি আপনার জায়গায় থাকলে হয়তো একই প্রশ্ন করতাম। পরিবেশ হালকা হলো। সাংবাদিকের আক্রমণাত্মক ভাব কেটে গেলো। যেভাবে অনানুষ্ঠানিক কথা বলি, সেভাবে শুরু করলাম। সহজ ভঙ্গিমায়, সহজ ভাষায় বলতে লাগলাম, কীভাবে ধরা হয় সোনার চোরাচালান, কীভাবে গণনা হয়, কীভাবে জমা হয়। শেষে এটি কীভাবে নিষ্পত্তি হয়। একেক করে সবগুলো পদ্ধতির বর্ণনা হলো। হিসাব, রেজিস্ট্রার, পরিবেশ, পরিস্থিতি, চেকিং, কাউন্টার চেকিং প্রসঙ্গ আসলো। আরো স্পেসিফিক হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। রিতা বললেন, আরেকটু বিস্তারিত বলুন। সোনা ধরার পুরো প্রক্রিয়াটাতে থাকে একটা স্বচ্ছতা। কোন চালান এমনি এমনি ধরা দেয় না। এর নিজস্ব কোন মুভমেন্ট নেই। এর কোন হাত-পা নেই। এটি নিজে চলতে পারে না।

এটি বহন করে কোন প্যাসেঞ্জার বা বিমানবন্দরে কর্মরত কর্মচারী। যতগুলো সোনার বড় চালান ধরা পড়েছে, সেগুলোতে মালিক পাওয়া যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এরা বাহকমাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহক মালিককে চিনে না। গ্রহণ ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় তারা কতিপয় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে। এগুলোর সাহায্যে তারা কার কাছ থেকে সোনার চালান গ্রহণ করতে হবে এবং কীভাবে বহন ও হস্তান্তর করতে হবে সেটুকু হয়তো জানে। আর চিনলে হয়তো তারা দ্বিতীয় স্তরের বাহক। এর উপর হয়তো আরেক স্তরের বাহক আছে। যিনি মালিক তিনি গডফাদার। কখনো সামনে আসেননা। হয়তো বসে আছেন কোন এক নিরাপদ অবস্থানে। সমাজে একজন নামি ও দামি ব্যক্তি হতে পারে। প্রতিষ্ঠিত বলে হয়তো চিনি। সভা-সেমিনারে হয়তো দেখবো। তার ইন্ধন ও ইশারায় হয়তো এসব কাজ হচ্ছে। রিমোট কন্ট্রোল চালানো আর কী। তিনি কী এমনি এমনি এটি করছেন? নিশ্চয় না। যারা ধরা পড়ছেন, তিনি তাদের সার্বিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। বিনিময়ে বাহকদের দেন একটা অংশ। এই অংশে বাহকের সংসার ভালোভাবে চলে। একজন সুইপার, ক্লিনার, নিরাপত্তা গার্ড বেতন পান তিন হাজার টাকা। তিনি বাড়তি বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পেলে তার সংসার ভালোভাবে চলার কথা। এটি দিয়ে হয়তো এই সুইপার-ক্লিনার-নিরাপত্তা গার্ডের সংসার চললেও ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হয় চোরাচালানকৃত স্বর্ণের মালিকের। এসব নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীর দুর্দশার সুযোগ এরা নিয়ে থাকে। এসব কর্মচারীর বেশ-ভূষা দেখলে মনে হবে এরা অনেক বিত্তের মালিক নন। হলে এই পরিচয়ে হয়তো বেশিদিন জড়িত থাকতো না। মানুষের টাকা-পয়সা হলে ভিন্ন কিছু করতে চায়। পরিচয় দেয়ার মতো কিছু করে। একপর্যায় ছেলে-মেয়ে, সংসার, সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয়। পেশা হিসেবে চোরাচালানের বাহক হওয়া নিশ্চয় সুখকর নয় । একজনকে ধরা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি এধরনের কাজে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। এখন ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। গ্রামে মসজিদ দিয়েছেন। দান-খয়রাত করছেন। এক পর্যায়ে মানুষ হয়তো পরিবর্তন হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে একটি বিখ্যাত ডায়ালগের রেফারেন্স এলো। ধনী হওয়ার রহস্য বলতে একজন সফল ব্যক্তি বললেন তার প্রথম মিলিয়নের পেছনে আছে পাপ, তাই এই প্রথম ফরচুন নিয়ে প্রশ্ন না করা ভালো। পরের মিলিয়নের পেছনে আছে সাদা রং যা তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। এখন তিনি মাল্টিমিলিয়নিয়ার। তবে এটি হয়তো সবার জীবনে নাও হতে পারে। এটি কেবল রেফারেন্স। আরো কিছু ঘটনা ও সূত্র আসলো। আলোচনা কিছুটা লাইনচ্যুত। রিতাকে কিছুটা অস্বস্থিতে দেখা গেলো। একপর্যায়ে রিতা আবার বললো,

– সোনা যায় কোথায়? উত্তরটি সরাসরি পেলাম না। দয়া করে বিস্তারিত বলবেন কি?

হ্যাঁ আসছি। এটি বললাম সোনা ধরার প্রক্রিয়াটি বুঝানোর জন্য। এই যে বাহকশ্রেণির লোক ধরা পড়ছে, বন্ধু মহলে তারা পরিচিত। তারা কী কখন কীভাবে করছে বন্ধুমহল জানে, খোঁজ-খবর রাখছে। কেউ বেশি পেলে বা ভালো থাকলে অথবা ভাগ-বাটোয়ারায় কম-বেশি হলে এদের একজন তৈরি থাকে সংবাদটি দেয়ার জন্য। এসম্পর্কে আর কিছু না বলাই ভালো।

– এরা কীভাবে কাজ করে, কারা তাদের নিয়োগ করে?

বিষয়টাতে স্পর্শকাতরতা আছে, তাই এবিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। এই ধরার প্রক্রিয়ায় মনিটরিং হয়, সভা হয়, আলোচনা হয়, ঝুঁকির বিষয়টা বিবেচনায় আনা হয়। কোন কাজ করলে ঝুঁকি থাকলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়। নিজেরা না পারলে অন্য ফোর্সের সহায়তা নেয়া হয়। তবে অবশ্যই ঝুঁকি অনুযায়ী নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় আনা হয়। কোন কাজ করতে গেলে সমস্যা হলে কেউ দায় নিতে চায় না। উপর হতে নিচের দিকে গড়ায় দায়-দায়িত্ব। তবে ভালো ম্যানেজার নিজেদের যেমন নিচের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়টাতে বেশ সচেতন। তিনি নিজেকে টিমের একজন হিসেবে মনে করেন। টিমের যে কোন সমস্যা নিজের সমস্যা মনে করেন। এটি পেশাদারিত্বের লক্ষণ। সবকিছু বিবেচনায় এনে ঘটনার সময় প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা হয়। কারা ঐ টিমে স্থান পাবে, কী দায়িত্ব হবে টিম সদস্যদের, কখন হবে, ইত্যাদি বিষয় অনেকটা তাৎক্ষণিকভাবে হয়। ফলে কেউ কিছু আন্দাজ করার আগে অভিযানটি হয়ে যায়। চোরাচালানীদের আউটস্মার্ট না করতে পারলে কোন চালান ধরা পড়বে না। পড়লেও এর কৃতিত্ব নেয়া যাবে না। যখন ধরা হয় বাহক নিজে জানেন তিনি কী

পরিমাণ বহন করছেন। তাকে ধরার পর সাথে সাথে কাস্টমস হলে আনা হয়। এটি একটি নিরাপদ স্থান। চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী। কোন আসামী থাকলে আসামীকে তল্লাশি করার আগে এয়ারপোর্টে কর্মরত সকল সংস্থার লোককে উপস্থিত থাকার আহবান করা হয়। রাষ্ট্রীয় অন্যান্য গোয়েন্দার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। তাদের উপস্থিতিতে আসামীকে তল্লাশি করা হয়। আসামীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার ব্যাগ খোলা হয়। এরপর চলে গণনা। সাথে সাথে ইনভেনটরি সম্পন্ন করে আটক তালিকা করা হয়। টেবিলে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয় ইতোমধ্যে ইনভেনটরিকৃত সোনার বারগুলো।

– এর মধ্যে দুএকটি মিসিং হতে পারে না?

প্রশ্নের মধ্যে আছে বাড়তি সন্দেহ। হওয়াটা স্বাভাবিক। চারদিকে যে সব উন্মোচিত হচ্ছে তাতে এরকমটা হওয়া স্বাভাবিক। সামাজিক অনুষ্ঠানে এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় বিব্রতবোধ করেন। কাস্টমস বিভাগের একজন বন্ধু কলিগ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ধরার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা উচিত। মিডিয়াতে জানানো উচিত। তাদের দেখানো উচিত। তাহলে এসম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর হবে। বন্ধুর স্ত্রীর সোনার প্রতি আকর্ষণ নেই। এটি তার গর্ব। সৌন্দর্য রক্ষার্থে দুএকটি আর্টিফিসিয়াল গহনা পরেন। এটাকে আবার ইমিটেশনের জুয়েলারি বলে। আত্মীয় ও বন্ধুমহলের কাউকে বিশ্বাস করানো যায় না, এটি স্বর্ণের নয়। এই নিয়ে বন্ধু ও তার স্ত্রীর মধ্যে প্রায় বাদানুবাদ চলে। এ ধরনের চাকরি করার দরকার কী? নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও দোষী! সামাজিকভাবে চলাফেরার এখতিয়ার সবার আছে। চলাফেলার স্বাধীনতা সার্বজনীন। এরকম শৃঙ্খলিত পরিবেশ কী কাম্য? বন্ধু চাকরি করেন, স্ত্রীতো করেন না। তার স্বামীর এই অপবাদ তিনি নিবেন কেন? বন্ধুর এই আক্ষেপ উড়িয়ে দেবার নয়।

রিতা রহমানের প্রশ্নের জবাবে বললাম, এই যে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে আশে-পাশে ডজনখানেক ক্যামেরা চলছে। আপনার মুভমেন্ট ঐ ক্যামেরায় ধারন হচ্ছে। কে কী করছেন, তা রেকর্ডেড হচ্ছে। কোন সূক্ষ্ম বিষয় চলে যাচ্ছে ঐ ক্যামরোর হার্ডডিস্কে। আপনারাওতো ছবি তুলছেন। চারদিক হতে ফ্ল্যাশ হচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে দেখানো হচ্ছে। আপনাদের ক্যামেরা অন। নানা সংস্থার লোকজন ছবি তুলছে। হিসাব রেকর্ড করছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যে যার মতো প্রতিবেদন তৈরি করছে। পৌঁছে দিচ্ছে স্বর্ণ আটকের ঘটনা। উপর মহল তাদের প্রতিবেদন দেখে অবহিত হচ্ছেন। কাস্টমস গোয়েন্দা পৃথকভাবে রিপোর্টিং করে আঞ্চলিক কাস্টমস গোয়েন্দা সংস্থা রাইলো নামক সংস্থায়। এটির বর্তমান সদর দপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অরগানাইজেশন (ডব্লিউসিও) এই রাইলো রিপোর্টিং হতে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেয়। এরা বার্ষিক ও নিয়মিত প্রতিবেদনে এগুলো প্রকাশ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন ঘটনা একসাথে কত জায়গায় রিপোর্টিং হচ্ছে এবং কত জায়গায় চলে যাচ্ছে। আবার মিডিয়া ঘটনাটি সাথে সাথে প্রচার করছে। মিডিয়ার মাধ্যমে সারাদেশের মানুষ অবহিত হয়। পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে থাকে এক ধরনের স্বচ্ছতা। এখান হতে কোন বার মিসিং হওয়ার সুযোগ আছে কি না, আপনি বলুন।

রিতা ক্যামেরা ছেড়ে এবার টেবিলের সামনে আসলো। সাথে আরো দুজন। আগ্রহ নিয়ে স্বর্ণের বারগুলো দেখলো। উঠিয়ে চোখের কাছে। উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখছে। হলোগ্রামে লেখা আছে ১০০ গ্রাম। এটি বিদেশী সিল। 'এতটুকু একটি টুকরা, কিন্তু ওজন কত?' রিতা মনে হলো এই প্রথম স্বর্ণের বার দেখছে। এসব ধরাপড়া বারের কালার আর বাজারের গয়নার কালারে কিছুটা পার্থক্য আছে, মন্তব্য করলো রিতা। এতো মূল্যবান অথচ কত ছোট অংশ। 'একটি বারের দাম কতো?' রিতা জিজ্ঞেস করলো। একশ গ্রামে হয় ৮.৫৭৩৪ ভরি। প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রামে এক ভরি। এক ভরির বর্তমান বাজার মূল্য ৪৭,০০০ টাকা। এই হিসেবে প্রতি বারের দাম ৪.৩ লক্ষ টাকা। তাহলে দশটি বারের দাম হবে ৪০.৩০ লক্ষ টাকা। দুহাতের তালুতে দশটি বার সহজে নেয়া যায়। কিন্তু ওজন অনুভূত হবে অনেক। আবার একই অভিব্যক্তি, এত অল্প জিনিস, কিন্তু ওজন কত, দামও অনেক। রিতা ও অন্যদের মাঝে নিস্তব্ধতা। এই প্রসঙ্গে যেন আর কোন প্রশ্ন নেই। রিতা বললো, জানেন এগুলো আসল সোনা বলে মনে হয়। খাঁটি সোনার রং এই সোনার মতোই। বাজারে যেসকল গয়না পাওয়া যায়, সেগুলো ভেজাল থাকতে পারে। বাজারে সোনার দাম এক, কিন্তু মজুরি দামে পার্থক্য হয়। গয়নাভেদে মজুরি হয় এক থেকে পাঁচ হাজার টাকা। তাও আবার নেগোশিয়েট করা যায়। আরো কমে আনা যায় এই মজুরি। কিন্তু এই অল্প মজুরি দিয়ে বিশাল দোকান, কর্মচারী, ট্যাক্স ও ভ্যাট দিয়ে সকল খরচ বাদ দিয়ে কীভাবে টিকে থাকা যায়। এতো বাহারি জুয়েলারি দোকান, কত লাইটিং, কত বিদ্যুৎ খরচ! রিতার সন্দেহ এসব সোনা আসল সোনা কি না। এক ফাঁকে গল্প করলেন। তার বড় বোন আমেরিকার ফ্লোরিডায় থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। বিয়ের গয়নাগুলো ভেঙ্গে নতুন কিছু একটা বানানো জন্য ওগুলো ঐখানকার একটি জুয়েলারি দোকানে দিয়েছিলো এক্সচেঞ্জ করার জন্য। কিছুদিন পর তাকে জানানো হলো, এগুলোতে ওজনের ছয় ভাগ সোনা, আর বাকি অন্য মেটাল। তার মাথায় হাত। এও কি সম্ভব! আমরা যারা সোনার অলংকার কিনি তারা মনের অজান্তে কী কিনছি কিছু জানছি না। এই দেশে রিসিট থাকলে যে দোকান হতে কেনা হয় কেবল সেই দোকান হতে ফেরত বা এক্সচেঞ্জ করা যায়। কিন্তু রিসিট কয়জনে রাখে। রাখলে কয়জনে একাজটি করে। সময় ও সুযোগ হয়ে ওঠে না অনেকের। যারটা হয় না তারটাই লাভ। রিতা বলতে থাকলো।

তার কথা শুনে বললাম, আরেকটি কথা না বললে নয়। স্বর্ণ চোরাচালানীরা একটা সংঘবদ্ধ চক্র। এরা অত্যন্ত সংগঠিত। এরা হিসাব রাখে কোথাকার স্বর্ণ কোথায় যায়। এরা হিসাব রাখার সব ধরনের চেষ্টা করে। কোন চালানে কত স্বর্ণ আছে সে হিসাবটি তারা ভালো করে জানে। কোথাও কোন স্বর্ণ কম জমা হলে বা তছরুপ হলে, সেটি লক্ষ্য করে গভীরভাবে। কম হলে আর রক্ষা নেই। তাদের হাতে যেসব প্রমাণ আছে তা সবার সম্মুখে হাজির করবে অন্য কোন পন্থায়। তাদের হাত এত লম্বা যে তদন্ত করিয়ে নাস্তনাবুদ করিয়ে ছাড়বে এরকম ঘটনায়। এক বা একাধিক তদন্তে চুরির ঘটনা বের করে মুখোশ উন্মোচন করার ক্ষমতা আছে এদের। এই কাজে কেউ জেনেশুনে পা বাড়ায় না বলে জানি। বাড়ালেও বিপদ আছে পদে পদে। সংবাদিকদের আরো জানালাম।

– এখানে সিন্ডিকেট কাজ করতে পারে। সবাই মিলে একাজটি যদি করে তাহলে ধরা পড়ার কোন কারণ আছে কী?

হ্যাঁ এরকম এটি অভিযোগ হরমামেশাই শুনা যায়। সিন্ডিকেট কী জিনিস? এটি হচ্ছে সংঘবদ্ধ চক্র। চক্রের সাথে সহযোগী হওয়া। চক্রকে সাহায্য করে পণ্য পাচার নির্বিঘ্ন করে দেয়া। কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। এয়ারপোর্টে কেবল একটি সংস্থা থাকে না। কিংবা একজন বা দুজন লোক কর্মরত থাকে না। একাধিক সংস্থার দপ্তর বা এর প্রতিনিধি কাজ করে। একেক সংস্থার উদ্দেশ্য ও ফাংশন একেকরকম। তাদের কাজের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ভিন্ন হতে পারে। এক সংস্থাকে হয়তো ম্যানেজ করা সম্ভব। কিন্তু এতোগুলো সংস্থাকে একসাথে কীভাবে সম্ভব? প্রত্যেক সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন রুটিনমাফিক কাজ করে। এক সংস্থায় আছে ভিন্ন ভিন্ন শিফট। শিফটের ভেতর রয়েছে একেকরকম কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাদের হয়তো কমিটমেন্ট ও আন্তরিকতার পার্থক্য থাকতে পারে। একজনকে হয়তো ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু অন্য আরেকজনকে কীভাবে করা সম্ভব? এদের উপর রয়েছে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। রয়েছে অফিস বস বা টপ বসের মনিটরিং। তাদের পৃথকভাবে আছে নিজস্ব নেটওয়ার্ক। এতোকিছুর পরও সিন্ডিকেট তৈরি করা ও তা বেশিদিন স্থায়ী করা যায় কীভাবে? চোরাচালানী একটি বিশাল অংকের টাকা বিনিয়োগ করে।

এটি নির্বিঘ্ন করতে এতোসব ম্যানেজ করা তাদের সম্ভব নাও হতে পারে। কয়েকজনকে ম্যানেজ করা গেলেও কাউকে কাউকে আবার ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। আর ম্যানেজ না হলে ধরা পড়ার বিষয় অবধারিত, এটি নিশ্চিত বলা যায়।

– এয়ারপোর্টে অনেক সময় দাবিদারবিহীনভাবে সোনা আটক হয়। সোনা আটক হলেও আসামী ধরা পড়ে না। আসামীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। এটি কীভাবে সম্ভব?

এটি হতে পারে। কারণ স্বর্ণ চোরাচালানের বিষয়টিতে থাকে তাদের নানা কূটকৌশল। একটি কাজ না করলে, অন্যটি প্রয়োগ হয়। অনেক সময় চেইন ভেঙ্গে পড়লে ধরা পড়তে হয়। বাহক বাঁচার জন্য বা ইন্টেলিজেন্স কর্তৃপক্ষের তৎপরতা লক্ষ্য করলে ধরা পড়ার ভয়ে টয়লেটে বা বোর্ডিং ব্রিজের বা অন্য কোথাও রেখে দেয়। এরকম পরিস্থিতিতে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ খবর দিলে

কাস্টমস গিয়ে এগুলো কাস্টমস হলে সবার উপস্থিতিতে গণনা করে। সবার উপস্থিতিতে ইনভেন্ট্রি করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। মূল কথা হচ্ছে, সঠিকভাবে ইনভেন্ট্রি হচ্ছে কি না? এটিতে অস্বচ্ছতার কিছু নেই। এখন পর্যন্ত এরূপ তছরুপের কোন ঘটনা ঘটেনি। ঘটলেও তা তদন্ত হয়েছে। এভাবে যেগুলো আটক হয়, সেগুলোতে আসামী থাকে না। তবে কাস্টমস মামলা হয়। কাস্টমস মামলার সূত্রে তদন্ত হয়। তদন্তে কোন আসামীর সন্ধান পেলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়। তখন পুলিশ দ্বারা তদন্ত হয়। পুলিশ তদন্ত করে আসামীদের ট্রায়ালের ব্যবস্থা করে। আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

আসামী ধরা পড়ে না, এটি সর্বতোভাবে সঠিক না। কারণ গত একছরে প্রায় ৩০ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের অনেকে গোল্ডসহ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। এদের ধরা পড়ার পর তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করে থানায় সোপর্দ করা হয়। তারা স্বীকার করেন এই কাজের সাথে তারা জড়িত। থানায় যাওয়ার পর কী হয় তা আমাদের কাছে তথ্য নেই। তাই আসামী ধরা হয় না সেটি সঠিক নয়। যাদের হাতে-নাতে পাওয়া যায়, তাদের ধরা হয় এবং তাদের হস্তান্তর করা হয়।

– আরেকটি অভিযোগ উঠে, যেগুলো ধরা পড়ে তা অনেকগুলোর মধ্যে একটি। এর মধ্যে আরো অনেক চালান বের হয়ে যায়। এসম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

এটি একটি সাধারণ তথ্য। এই তথ্যের কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। যেটির তথ্য পাওয়া যায় সেটি যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যাচ্ছে। হযরত শাহজালাল এয়ারপোর্টে প্রতিদিন হাজার হাজার প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে থাকেন। দেশের আইন এমন যে, প্রত্যেক যাত্রিকে তল্লাশি করা যাবে না। আন্তর্জাতিক রীতিনীতিও তাই। ঝুঁকিব্যবস্থাপনা প্রয়োগে টার্গেট করে অভিযান পরিচালনা করতে হয়। সবাইকে তল্লাশি করলে হয়রানির অভিযোগ উঠতে পারে। ব্যাগেজ রুলসটি এমন যে, একজনকে ধরতে গিয়ে একশজনকে কষ্ট দেয়া যাবে না। একটি নির্দিষ্ট হারে যাত্রীর ব্যাগেজ স্ক্যানিং করা হয়। সন্দেহ হলে তার দেহ তল্লাশি।

এছাড়া, সার্ভেইল্যান্সের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা তার লাগেজ তল্লাশি করা হয়। এছাড়া রয়েছে তথ্য সংগ্রহের নানা মাধ্যম। এইসব তথ্যের সাহায্যেও অভিযান পরিচালনা করা হয়। যেসব চালান ধরা পড়ছে সেগুলো এমনভাবে সাজানো যে পাচার করার সুযোগ থাকলেও ধরা পড়ার ঝুঁকি বিদ্যমান। একজন চোরাচালানী তার পণ্যটি প্রথমবার হয়তো ধরা পড়লো না, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার তাকে ধরা পড়তে হবে। প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার যে লাভ তিনি করেন, তৃতীয়বার জমাচালানসহ তাকে তা হারাতে হয়। এর উপর রয়েছে জেল-জরিমানা। এটি তার বাড়তি শাস্তি। তার আসলে শাস্তি দুভাবে হয়। প্রথমটি হয় বিনিয়োগকৃত স্বর্ণের চালানে। দ্বিতীয়বার হয় আসামী ধরা পড়লে তাকে বিচারের সম্মুখীন করা নিয়ে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে সাজা হলে আসামীর ১৪ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। আর আপনি যেটা বলেছেন, সেটি অনুমাননির্ভর। কোন চালান বের নাও হতে পারে। এটি আপনি কীভাবে জানলেন অনেক চালান চলে যায়? কারোর কাছে তথ্য থাকলে 'দি কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯' অনুযায়ী কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে জানানোর বাধ্যবাধকতা আছে। এটি যে করবে না তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমনটি বলা যায় না। কেউ এটি বললে তাকে এও বলতে হবে কবে কখন কোন চালান বের হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিন। সেটি অনুসন্ধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই ধরনের তথ্য প্রদান করলে তা নিশ্চয় গুরুত্বসহকারে দেখা হবে।

– স্বর্ণ চোরাচালান কেন হয়? এর চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থান কোথায়? হঠাৎ কেন বেড়ে গেলো এই চোরাচালান? আপনারা হঠাৎ একটিভ হয়েছেন? আগে কী আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন? না কী অন্যকিছু?

প্রশ্নটি শুনে একটু চিন্তা করলাম। এতগুলো প্রশ্ন। এর মধ্যে আছে বিব্রত হওয়ার কিছু উপাদান। সরকারী কর্মকর্তারা আচরণ বিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। অনেক সময় স্পর্শকাতর সত্যি কথাটা অকপটভাবে বলতে পারেন না। একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে চলতে হয়। এটিই নিয়ম। তবে তথ্যে কোন গরমিল থাকলে তা পরিস্কার করা উচিত। রিতার প্রশ্নের প্রথম অংশ নিছক তথ্য সম্পর্কিত। অন্য অংশে আছে মতামত। মাথায় তথ্য ও মতামত ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা জুতসই জবাব দেয়াটা অপরিহার্য। এতে সাধারণের ধারণায় দ্বিতীয় চিন্তার খোরাক আসবে। তৈরি হলাম। একটা মুচকি হাসি। কোন প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে একটু স্পেস দেয়াটা আধুনিক রীতি। একটু গ্যাপ দিলে প্রশ্নকর্তা বা দর্শক মনে করেন তাদেরকে সম্মান করা হয়েছে। তার প্রশ্নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে প্রশ্নকর্তা ও দর্শকদের 'ইগো' তৃপ্ত হয়। আর পরিবেশ আরো জীবন্ত হতে পারে।

'স্যার, চার্লি স্যার ওয়াকিটকিতে কল দিছে', বডিগার্ড মিনু বললো। মিনু নতুন নিয়োগ পেয়েছে সিপাই হিসেবে। ভালো ট্রেনিং পেয়েছে। সর্বদা স্যারের সেটটি হাতে রাখে। হাতে ওয়াকিটকি থাকলে মিনু আরামবোধ করে। অন্যদের থেকে আলাদা এই ভাবনা হয়তো তাকে আন্দোলিত করে। একটু বাড়তি সম্মান হয়তো যুক্ত হয় এতে। কোন কল আসলে স্যারের কাছে ধরে যোগাযোগ করার জন্য। নিশ্চয় জরুরি কোন কল! চার্লি জানে আমি সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করছি। এরপর কল দেয়া মানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

– চার্লি টু আলফা স্যার।

– ইয়েস চার্লি প্লিজ গো এহেড, আলফা ইজ লিসেনিং।

– স্যার বোর্ডিং ব্রিজে কতিপয় প্যাসেঞ্জারকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, আমরা সন্দেহ করছি, কোন একজন প্যাসেঞ্জার বিদেশী মুদ্রা বহন করছে।

– তুমি মোবাইলে কল দাও।

চার্লির মোবাইলে দেয়া কল রিসিভ করলাম। ওয়াকিটকিতে কথা আশে-পাশের লোকজন শুনে ফেলবে। কিছু নির্দেশনা থাকে গোপন। পাশের লোকটি শুনে ফেললে গোপনীয়তা থাকে না। এতে কথোপকথনের গুরুত্ব হারায়। কিছু কথায় রাষ্ট্রীয় বিষয় থাকতে পারে। এবার মোবাইলে কিছু তথ্য ও নির্দেশনা দিলাম। কিছুক্ষণ পর চার্লি দুহাতে দুটো কালো ব্যাগ নিয়ে আসলো। টিমের সদস্যরা সাথে। এয়ারপোর্টে নিয়োজিত অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার লোকও আছে। ক্যামেরা আছে পেছনে। প্রায় ২০ জনতো হবে। এলোকগুলো কোন না কোন কাজে নিয়োজিত এই এয়ারপোর্টে। কারোর হয়তো ইমিগ্রেশন, কারোর ভিআইপি মুভমেন্টে, কারোর যাত্রীসেবা, কারোর নিরাপত্তায়। টিমের সদস্যদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ। উৎসবের কী আছে এতে? এমন প্রশ্ন আমার মনেও। কোন চালান ধরা পড়লে আটক কর্মকর্তাদের ঈদের আনন্দ বয়ে যেতে পারে। কোন গোপন তথ্যের পেছনে এরা দীর্ঘ সময় ধরে রেকি করে। পিছু নেয় চালানের মুভমেন্টে। প্রতিনিয়ত মনিটরিং হয়। কোনটি আবার ছুটে যায়, হাত ছাড়া হয় চালানের খোঁজ। তখন এরা মাথার চুল ছিড়ে। হায় হায় করে। কিছু কর্মকর্তাকে বড্ড আফসোস করতে দেখা যায়। টিমের একজন ভয়ে জানালো, 'স্যার মাপ করবেন, একটুর জন্য ছুটে গেছে। আমার কপালটা খারাপ।' এটি যেন একটা নেশাযুক্ত পেশা। নেশাগ্রস্ত মানুষের নেশা না পেলে যেমনটি হয়, তেমনটি হয় চালানের খোঁজ ছুটে গেলে। আবার সফল হলে ঘটে উল্টোটি। সবার মুখে নির্মল হাসি। জোরেসোরে শব্দ। একেকজন একেকভঙ্গিতে। আনন্দ করার উপযুক্ত শব্দ এরা আত্মস্থ করেনি। তবে প্রকাশভঙ্গিতে এরা উচ্ছসিত।

– স্যার পেয়ে গেছি, দ্যাখেন কী ধরে আনছি?

– এর মধ্যে কী ধরনের মুদ্রা?

লাইটগুলো জ্বলে উঠলো। ক্যামেরা অন আছে। সাথে রিতার ক্যামেরাও। দুটো ব্যাগ আগেই স্ক্যান মেশিনে চেক হয়েছে। এতে দড়িরমতো মোড়ানো টাকার বান্ডেল সদৃশ দেখা গেছে। গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন, এতে মুদ্রা আছে। কী মুদ্রা তা জানা সম্ভব হয়নি। দুবাইগামী ফ্লাইট। ঐ ফ্লাইটে টাকা যাওয়ার কথা নয়। অন্য কোন মুদ্রা হয়তো আছে। ল্যাপটপের ব্যাগ। খোলা হলো। যিনি খুলছেন তিনি চিৎকার দিলেন। আনন্দের চিৎকার। 'স্যার অনেকগুলো বান্ডেল। এগুলো সৌদি রিয়াল।' মুদ্রাগুলো থরে থরে টেবিলে রাখা হলো। সাজানো হলো সবগুলো। ১০০ সৌদি রিয়ালের নোট। প্রতি প্যাকেটে ১০০টি করে। মনে হয় প্রায় নতুন। কয়েকটি অবশ্য পুরানো। একেক করে সব গণনা হলো। প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা। সাম্প্রতিক সময়ের সর্ববৃহৎ মুদ্রার চালান। কাস্টমস গোয়েন্দারা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পিছু নিয়ে এটি আটক করতে সফল হয়। প্রাথমিক গণনার পর একেক করে ইনভেন্ট্রি হয়। প্রতিটি নোটের নম্বর লিখতে হলো আলাদা কাগজে। একাজটি অনেক কঠিন ও কষ্টের। এতে চালান ধরা পড়ার আনন্দ আর আনন্দ থাকে না। এতগুলো নোটের নম্বর ম্যানুয়ালি লেখা সত্যি কষ্টের, একজন কর্মকর্তা বললেন। পাঁচজন কর্মকর্তা একরাত, দুদিন ধরে একাজটি সম্পন্ন করেন। প্রতিটি নোটের নম্বর সিজার রিপোর্টে লিখে রাখা রেওয়াজ। না করলে কোন নোট পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। নম্বরগুলো সাথে সাথে ইনভেনটরিতে লিখে ফেললে কোন পর্যায়ে পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ থাকে না। আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে এগুলো অনাবশ্যক বিলম্ব ব্যতিরেকে জমা হবে। তারা নোটের নম্বরসহ বুঝে নিবেন। আর এখন জমা হবে এয়ারপোর্ট কাস্টমস গোডাউনে। গোডাউন অফিসার অস্থায়ীভাবে জমা নিবেন। তার জিম্মায় নিয়ে পুলিশী পাহারায় পরেরদিন বা অবিলম্বে এগুলো জমা করে আসবেন ও তা রেজিস্ট্রারে রিসিপ্ট করে আনবেন। এরপর রিপোর্ট আকারে কাস্টম হাউস, এনবিআর ও অন্যান্য দপ্তরে তা প্রেরণ করা হবে। এই রেকর্ড আবার সময়ে সময়ে আপডেট ও চেক হয়। একই তথ্য নানা জায়গায় এন্ট্রি হওয়ায় তা মিসিং হওয়া মুশকিল।

রিতা ও তার সতীর্থরা দেখলেন পুরো প্রক্রিয়াটা। রিতা বললেন, তার প্রশ্নের অনেক জবাব পেয়ে গেলেন এতে। 'আপনার আগের করা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে?' 'না, আপনাকে ধন্যবাদ', রিতা উত্তর দিলো। শুধু বললেন, মুদ্রা যায়, আর আসে সোনা। মুদ্রা যাওয়া আর সোনা আসার মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে।

এই যে সোনা আসে তার মূল্যের একটা অংশ পরিশোধ হয় এই জাতীয় পাচারকৃত মুদ্রায়। বিদেশে যারা প্রবাসী বাঙালি আছেন, তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটা অংশ বিদেশে থেকে যায় কোন এক হুন্ডি চক্রের হাতে। তারা বিদেশি মুদ্রা বিদেশে রেখে দেয়। তাদের এজেন্ট স্থানীয় মুদ্রায় ঐসব প্রবাসীর আত্মীয়-স্বজনের হাতে পৌঁছে দেয়। আবার প্রবাসীরা দেশে এনে এসব মুদ্রা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। চক্রটি এসব মুদ্রা সংগ্রহ করে তা বিদেশে পাচার করছে এভাবে। উভয়ভাবে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রিতা নিজেনিজে কথাগুলো বললেন।

- 'এপ্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই'।

- 'নো মোর টু ডে প্লিজ। অনেক হয়েছে। কেবল তথ্যের প্রয়োজনে টেলিফোন দিবেন। এই নিন আমার ভিজিটিং কার্ড।'

- 'কার্ডটি দিয়ে ভালো হলো। নামের সঠিক স্পেলিং পাওয়া গেলো। আবার হয়তো মোবাইল করতে হতো। টিভি নিউজে ভুল বানান আসলে আপনি মাইন্ড করতেন।'

লেখক
মইনুল খান
মহাপরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মূল্যবান শুল্ক গুদামে
আটককৃত স্বর্ণবারসমূহ বুলিয়ন ভল্টে অস্থায়ীভাবে জমা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের ২৮-০৪-২০১৪ তারিখের ৫-কাস/৮/২০(৩৭)এল.সি/৮১-৮৭/ পার্ট-৪(৫)/ ০৪/পার্ট-১/১৫৯ নম্বর পত্রে বর্ণিত ডিজিআর নম্বর ২৫৬/১৪, তারিখ ঃ ২৬-০৪-২০১৪ এর আওতায় আটককৃত স্বর্ণবারসমূহ অত্র অফিসের নিয়োজিত স্বর্ণ পরীক্ষক দ্বারা আপনাদের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গুণগত মান যাচাই ও ওজন গ্রহণ পূর্বক সংযুক্ত সনদ মোতাবেক আমাদের রেজিষ্টারে ২৯-০৪-২০১৪ তারিখে প্রদর্শিত ক্রমিক নম্বর ৮৬৫ (১-১০) মূলে অস্থায়ীভাবে জমা গ্রহণ করা হলো।

সংযুক্তি:- ০১ (এক)।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(জোয়ারদার ইসমাইল হোসেন)

বাংলাদেশ ব্যাংক
মতিঝিল
ঢাকা

রেজিষ্টারে প্রদর্শিত ক্রমিক নং- ৮৬৫(১-১০) তারিখ:- ২৯-০৪-২০১৪।

স্বর্ণবার

ক্রম. নং	কাষ্টম কর্তৃপক্ষের ডিজিআর নং ও তারিখ	কাষ্টম কর্তৃপক্ষের ওজনের বিবরণ	গৃহীত পরিমান কিলো. গ্রাম. মিগ্রা.	জি.আর নম্বর	বিশুদ্ধতার শতকরা হার (গড়)	মন্তব্য
০১.	২৫৬/১৪ ২৬-০৪-২০১৪	স্বর্ণবার ৯০৪ পিস (প্রতিটি ১০ তোলা ওজনের) ৯,০৪০ তোলা	১০৫-৪১৮-৪০০	৮৬৫ (১-১০)	৯৯.৯%	[illegible]

গৃহীত স্বর্ণবারের সর্বমোট ওজন = ১০৫-৪১৮-৪০০

১০৫.৪ কেজি স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের বুলিয়ন ভল্টে জমা প্রদান করার সনদ

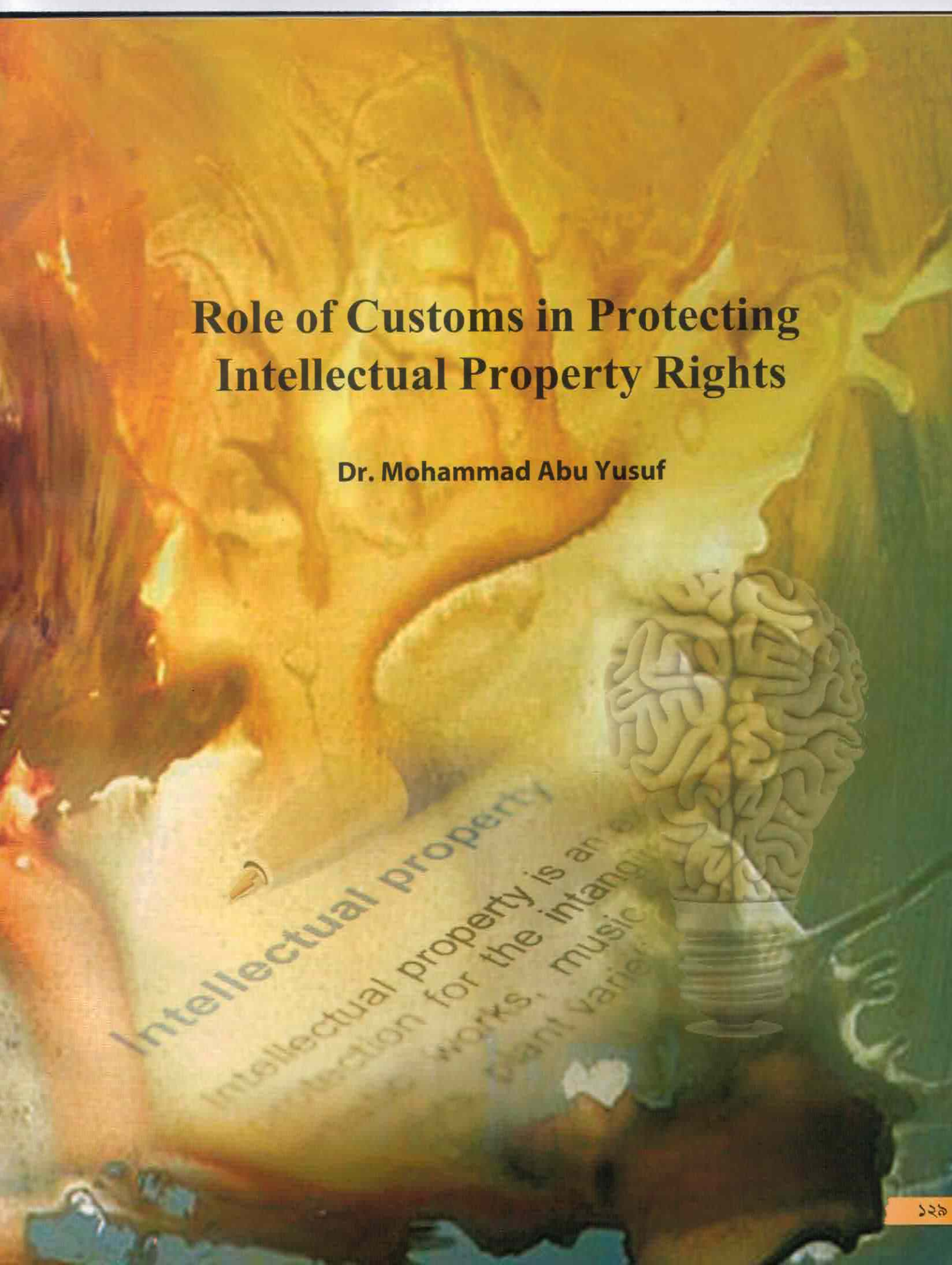

Role of Customs in Protecting Intellectual Property Rights

Dr. Mohammad Abu Yusuf

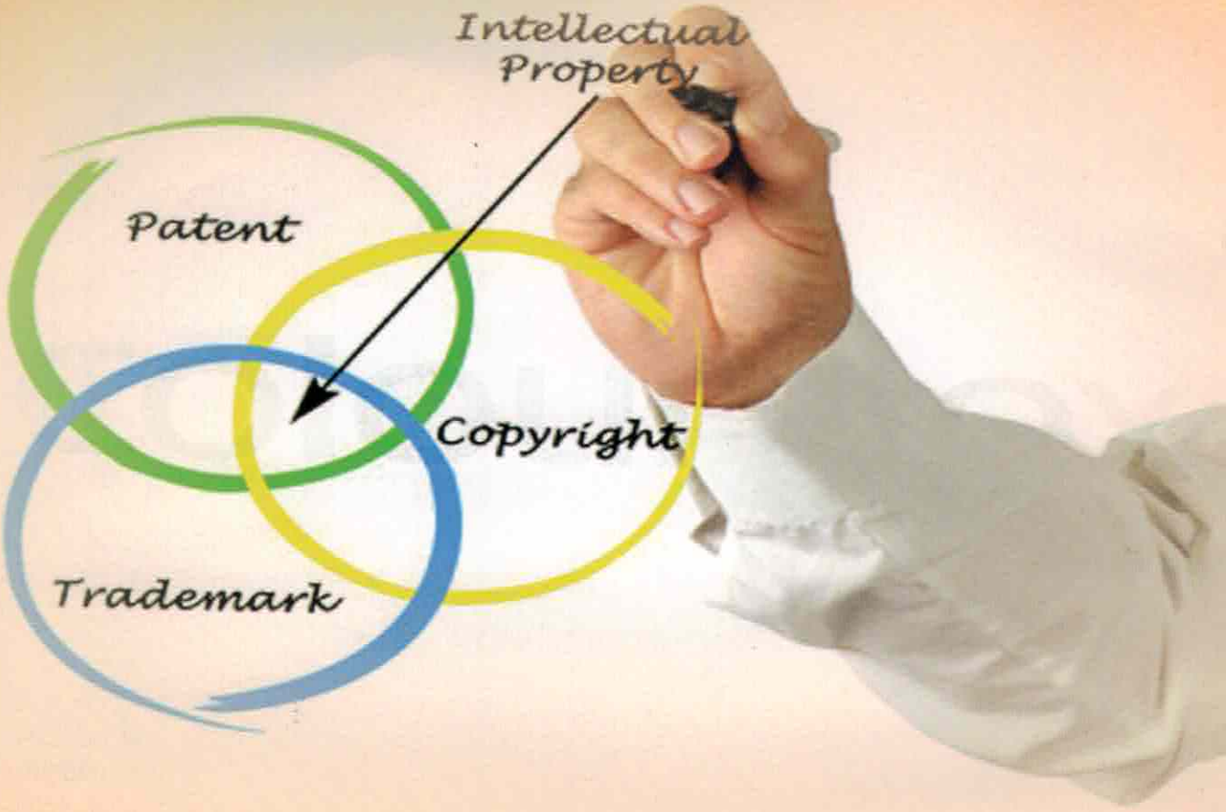

The protection of Intellectual Property Rights (IPR) is a key driver for growth in areas such as resea innovation and employment. Effective IPR enforcement is also essential for health and safety as cer counterfeited products (such as foodstuffs, body-care articles and children's toys) can pose a serious threa consumers if they are produced in an unhygienic and unregulated environment. Bangladesh is pledge boun honor and uphold rights of intellectual property right holders. This is evident from Bangladesh's membershi International Intellectual Property (IP) conventions. Bangladesh has been a member of the World Intellec Property Organization since 1985. It became a member of the Paris Convention for the Protection of Indus Property Rights in 1991. Bangladesh also became a member of the Berne Convention for the Protectior Literary and Artistic Works in 1999. Although LDCs are currently exempt from TRIPS notification requireme Bangladesh notified changes in its copyright regime to the TRIPS Council in 2008, the second time it had done (WTO Trade Policy Review, Bangladesh 2012).

Customs department play a vital role in protecting rights of intellectual property owners. Bangladesh Customs a has role to play in protecting IP. Bangladesh Customs Act has a provision (Section 15) to protect IP. But coverage is limited. This paper aims to present related provisions of WTO TRIPS Agreement and provisions selected countries that empower seizure and disposal of IPR infringed goods. The objective is to sugg necessary changes in our national Customs Law. This paper also presents few examples of IPR enforcement Customs of selected countries. Finally, the paper presents recommendations as to how Bangladesh Customs c play better role in IPR protection.

IPR provisions in the TRIPS Agreement

Article 51 of the agreement (Suspension of Release) allows a right holder to lodge an application with Customs to suspend release of suspected counterfeit goods.

Article 59 of the TRIPS Agreement provides for remedies and destruction order for infringing goods without prejudice to other rights available for right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. However re-exportation of infringing goods in an unaltered state (in regard to counterfeit trademark goods) is not allowed.

Article 46

In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed.

TRIPS agreement:. Article 56 (Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods) makes the applicant liable to pay compensation to the importer, the consignee and owner compensation in the case of wrongful detention. Article 57 requires that the right holder be given sufficient information and the right to inspect detained goods, in order to substantiate the claim(s). Article 59 provides for remedies and destruction order for infringing goods (re-exportation is not allowed).

China's IPR Law with regard to IP protection: China amended Article 4 of its Copyright Law and Article 27 of its Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights (Customs Regulations) in spring 2010 to remove inadequacy of protection and better enforcement of Intellectual Property Rights. Against the backdrop of US complaint against China regarding the failure of the Chinese customs authorities to properly dispose of infringing goods seized at the border, China effectively ended its TRIPS enforcement dispute with the United States through extension of border measures and their faithful implementation.

Agreement regarding Intellectual Property Rights between US and china requires all Chinese customs offices to intensify border protection for all imports and exports of CDs, LDs, CD ROMS, and trademarked goods. Such US pressure in the early to mid 1990s and the strong influence From the EU made China to extend border measures to not only piracy and counterfeiting, but also other forms of copyright, patent, and trademark infringements including both imported and exported goods even though Article 59 covers only imported goods (Yu, 2011).

Australian Customs Legal authority regarding IP enforcement

Australian Customs enjoy the authority to seize unauthorised copies of copyright materials. (Section 135 Restriction of Importation of Copies of works etc). Section 54 states that the Customs CEO must seize goods unless there is no reasonable ground to do so. Seized goods have to be kept in a secure place. As per section 56, (Olympic Insignia Protection Act, 1987 Forfeiture of goods by consent), forfeited goods to Commonwealth need to be disposed of as directed by the Customs CEO. Australian Trade Marks Act 1995 empowers
CEO to seize goods infringing trade mark (Sec 133). If no action is brought with regard to the notified trade mark and if the objector withdraws any objection, seized goods have to be released to owner (Sec 136 , Trade Marks Act, 1995). Section 140 gives power to CEO to retain control on the seized goods.

It is thus clear that the various provisions embedded in the Trade Marks Act 1995, the Copyright Act
the Olympic Insignia Protection Act 1987 fully comply with the requirements specified in the TRIPS A
and the WCO model IPR legislation.

IPR protection in New Zealand: New Zealand's legislation (i.e. the border protection measures contai
Trade Marks Act 2002 and in the Copyright Act 1994) requires that if a rights holder wants protect
border, they must apply to the New Zealand Customs Service for a Border Protection Notice (Customs
doing so, they must prove ownership of a copyright work, or a New Zealand registered tradema
provisions are in compliance with the requirements of the Trade Related Aspects of Intellectual Prope
(TRIPS) Agreement, especially Articles 51-60 concerning border measures. When an import consig
detained on complaints from right holders, customs must determine (through investigation, and col
information) whether the detained goods have infringed the registered trademark or copyright in questi
written notice of determination must then be served (within a reasonable period of time) on the rights
any other person having an interest in the goods (e.g. the importer) informing the outcome of the inve
Goods covered by a determination are detained by NZ Customs for no more than 10 working days. If
has not, been served with a notice of Court proceedings by the Rights Holder during this 10-day detentio
the goods must be released by Customs to the importer. During this detention period any person ha
interest in the goods, such as the importer, may apply to the Court for an order that the notice h
discharged or the goods are to be released or that the goods are not counterfeit or pirated and they
covered by the notice. Customs will then deal with the goods in accordance with the decision of the Court
2006, P.17]

IP enforcement in Brazil

There are three levels at which IP rights may be enforced in Brazil :

- **Arbitration -** Brazilian legislation provides for arbitration procedures. But both parties need to agree
such this form of dispute settlement is very uncommon in IP cases.
- **Civil action -** There are no special courts to deal exclusively with IP-related cases. The ordinary civi
deal with cases as appropriate. Laws relating to trade name registration and protection are contained wit
Civil Code. All other areas of IP have their own specific legislation.
- **Criminal prosecution -** Brazil's Penal Code provides for actions against infringement of types of
specific IP legislation, with (in theory, at least) higher penalties for infringers including imprisonment and f
criminal complaint must be preceded by a search and seizure action, with a view to collecting evidence
than halt the infringement.

IP enforcement in Singapore

Singapore's Intellectual Property Rights (IPR) legislation provides for Singapore Customs to int
IPR-infringing goods at its borders. Singapore Customs enforce IPR in close partnership with other gover
arms.

১০২

১০০

To put it differently, Singapore follows a whole-of-government approach (Customs, Police and Intellectual Property Rights Branch-IPRB work together) to weed out counterfeit goods and enforce right of IP holders on January 7, 2014, Singapore Customs handed over 77850 empty counterfeit VODKA bottles, 18 boxes of bottle caps and 10 boxes of labels all bearing the name of a vodka brand to the brand owner, Diageo North America, for destruction, following a court order. The counterfeit items (declared as general cargoes) all bearing the Smirnoff brand, were seized by Singapore Customs officers on June 6, 2013 at cargo distribution complex Keppel Distripark. The detained trademark infringing items were handed over to the legal representative of the brand owner, on December 26 2013 who subsequently applied successfully to the court for the detained items to be forfeited to it for destruction (Jo, 2014).

Seizure by Thailand Customs: The Royal Thai Customs has the authority to detain IP infringed goods. Where the Customs suspects that a shipment may have been imported that hampers the IPRs of the right holder, it shall inform the IPRs owners to inspect the goods. In order to detain suspected products, the IPRs owners have to file request to The Royal Thai Customs for the detainment of the goods for 10 days. As per article 53 of the TRIPS agreement, the competent authority shall have the authority to require an applicant (IPR owner) to provide a security deposit or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the competent authorities (Customs) against actions taken and to prevent abuse by rights holders. In line with this WTO TRIPS provision, the Royal Thai Customs require the IPRs owner to provide a security deposit with the Customs and to guarantee in writing that they would be responsible for possible damages from detainment. In recent time, Thai Customs Department seized IP infringement goods/counterfeit items such as mobile phones, clothing, DVDs, CD, films, fake gun (BB GUN), radio, luggage, shoes, watches, and other products worth over 70 million baht.

Enforcement of IPR and Japan Customs

Japan Customs has extensive and strong authority to ensure border enforcement. It covers both the importation and exportation of infringing goods. IPs such as trademarks and copyrights, patents, industrial designs, plant breeder's rights, famous indication of goods and configuration of goods are protected. The Customs law was amended in 2008 to expand the scope of enforcement to transit goods. Japan Customs has an impressive track record of enforcement of IP rights. Some of the examples of IP enforcement by Japan Customs are:

Fake Pharmaceuticals Smuggled by Express Mail Service

Nagoya Customs accused Japanese males who attempted to smuggle 5,000 fake tablets in violation of Customs Law. The tablets, which violate the trademark rights and patent rights of Pharmaceutical firms, were smuggled from China using the Express Mail Service.

Pirated DVDs Smuggled in Postal Parcel

Kobe Customs interdicted 500 pirated DVDs in postal parcels from China which infringed Copyrights. A Japanese male was accused of violation of Customs Law by Tokyo customs.

The Number of Valid Applications to Japan Customs for Suspension (as of January 2009)

Type of Rights	No of valid applications
Patents	17
Utility-model rights	0
Industrial designs	54
Trade Marks	146
Copyrights	40
Copyright related rights	427
Unfair competition prevention law	5
Plant breeder's rights	1

Source: Ministry of Finance, Japan, 2009.

The Number of Suspensions by Type of Commodities Items (2004-2008)

Type of commodities	2007	2008
Bags	16959	19793
Key cases	2476	2853
Watches	1699	2477
Apparel	2656	2178
Belts	883	1097
Shoes	1151	1071
Pharmaceuticals	102	501
Mobile phones and accessories	289	471

Source: Ministry of Finance, Japan, 2009.

The above two figures indicate that the right holders in Japan are aware about their right and reports the IPR infringement issues to the Customs authority for proper action. Japanese Customs authority also has the capacity, training and resources to take action against infringed IP goods. The number of suspensions for IP right infringements by Japan Customs suggests that Bangladesh Customs need extensive and strong authority, resources (in terms of number of officers/officials and training, equipment) and more attention to exercise adequate IPR enforcement at border.

Protection of IP by Australian Customs/Australian Customs in Combating IPR Infringements: Australian Customs follows three basic principles in its endeavour to counter IPR infringements:

- ⇨ Customs interface with other border agencies
- ⇨ Customs-Right Holders partnership
- ⇨ Customs-to-Customs co-operation. [Hossain, 2009]

Source of IP infringed/counterfeit products in EU Market: Goods imported into the EU are mostly originated from few countries. The origin of counterfeit goods varies with products. China is the main source of fake goods, accounting for 73% of all IPR infringing articles that enters EU market. For certain product categories other countries remain the main sources such as Turkey for foodstuffs, Panama for alcoholic drinks, Thailand for soft drinks and Hong Kong for mobile phones. Majority of the detained products (around 90%) were either destroyed or a court case was initiated to settle the infringement complaint (Asia News Monitor, 2012).

Border Protection of IPR Laws in Bangladesh

According to available statistics, Bangladesh Economy faced an estimated trade loss of US$48 million due to copyright piracy. CDs and DVDs was the top category IP expressions/products accounting for about US$ 40 million (IIPA, 2007). Major legislations that support border protection if IPR in Bangladesh include: Bangladesh Customs Act, 1969, Copyright Act, 2000 (as amended in 2005) and Copyright Rules 2006, Trademarks Act, 2009, and Trade Marks Rules, 1963 and Patents and Designs Act, 1911 and Patents and Designs Rules, 1933.

Articles 15-17 of the Customs Act 1969 contains the power and responsibility of the Customs with regard to seizure and disposal of counterfeit goods. (Section 15 covers trademarks/trade description, Copyright and industrial design; no reference is made for patent protection). Bangladesh Minister for Finance announced in the budget speech of FY 2012-13 that- "Customs authority is responsible for preventing import of goods violating copyrights and intellectual property rights". He also proposed to amend the Customs Act 1969, so that section 15 of the Act can facilitate resolving any dispute arising from the violation of Trademark Act, Copyright Act and Patent and Design Act. (Para 294, Budget Speech 2012-13). But Bangladesh Customs is yet to adopt any SRO/rule detailing on how disputes arising from IPR violation would be resolved.

In line with the budget speech, Customs Act 1969 needs amendment to extend border measures to patent as well. Although Bangladesh enjoys exemption from providing mandatory IP protection for pharmaceutical items until 1.1.2016 and until July 2, 2021 for other items, there seems no problem to protect existing patent right holders from their rights being misappropriated by others. China has extended border measures to not only piracy and counterfeiting, but also other forms of copyright, patent, and trademark infringements (Yu, 2011P. 737, 2011). Customs measures covering Intellectual property right infringements should also cover other infringements of IP such as trademark-infringing goods, other copyright-infringing goods, and patent-infringing goods.

However there are no other clear outlines in any of the above legislations that relate to the way Customs is to respond to IPR infringements. In practice, there are almost no (or few) examples of Customs seizure on the ground of IPR infringement. Moreover, there is no dedicated IPR cell within the Customs Administration. The major factors contributing to less than effective border protection by Bangladesh Customs include: lack of Customs to Right holder partnership, lack of Customs-to-business co-operation, lack of training and emphasis on IP matters by Customs authority and lack of awareness.

Recommendations

Technology transfer is generally encouraged when a nation adopts policies such as protection of intellectual property, control of corruption, and effective competition policy regimes (Nicholson, 2007). Smarzynska (2004 in Nicholson, 2007) shows that weak IPRs deter FDI in high-technology sectors. Existing evidence demonstrates a positive influence of IPRs on the level of both FDI and licensing (Nicholson, 2007). Therefore Bangladesh should strive its best to have better enforcement of its IP regime in order to attract and retain FDI in technology sectors.

A new regulation/chapter on Customs enforcement of IPR (in the Customs Act) seems a necessity. The National Board of Revenue (NBR) may consider setting up of a dedicated Intellectual Property Rights Cell at the NBR level to strengthen enforcement of IPR in all Customs stations. In each Customs House, a separate section named `Intellectual Property Rights Section' can be created. The government has already taken necessary steps to strengthen IPR regime. It is learnt that the government announced the approval of a USD 3 million project to strengthen the Copyright Office in recent time. NBR may also ask for resources for its capacity building in IPR enforcement. Customs officials may be sent for training on IPR enforcement. Bangladesh has already submitted to the TRIPS Council in March 2010, proposed specific projects worth US$71.04 million for fully and effectively implementing the TRIPS Agreement (WTO Trade Policy Review, Bangladesh, 2012). Among these projects include the setting up an IP Institute or Knowledge Centre in the private sector. Technical and financial assistance can be sought by NBR from the WCO's `Customs Cooperation Fund (CCF/IPR)' for capacity building of Customs to enable efficient IPR protection.

Confiscated goods may be used as samples at Customs only for the purpose of raising public awareness on IPR. All confiscated goods, including goods which have finished their role as samples, has to be destroyed and disposed of completely, without causing any harm to right holders, under the supervision of Bangladesh as is done by Customs Administration in other countries including Japan. The National Board of Revenue or the Main Customs Houses (such as Chittagong Customs House, Dhaka Customs House, Benapole Customs House) need to establish procedures for consulting with Patent and Copyright Office/Department of Patents, Designs and Trademark (DPDT) and Copyright office.

Private sector businesses also need to cooperate with Customs. They can request Customs action where they suspect that their IP rights are being violated. Such information provided by industry helps customs better target their controls. Customs-business joint partnership may be developed for the purpose of information exchange on IPR infringement and joint enforcement activities with trademark/copyright and other right holders.

The national Board of Revenue can, in consultation with Customs and VAT Commissioners/Director Generals, develop a manual for right holders, to help them lodge such requests. Finally, workshops/seminars[1] may be arranged by NBR/ Customs Houses to present and understand the latest methods used to protect the IPR rights. These seminars/workshops could help customs officials to familiarise themselves with the different methods used in counterfeiting and pirating goods. International Companies, design/trade mark specialists along with their legal offices in Bangladesh may be invited to such seminars to give presentations on the differences between genuine and fake products, thus help identifying fake and genuine products.

---

[1]National Customs Administrations including Dubai Customs organize such workshops/seminars on intellectual property rights (Al Bawaba, 2007).

References

Al Bawaba (2007). Dubai customs organise workshops on intellectual property rights, 26 Nov.

Asia Pacific Economic Cooperation (2006). Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement Strategies.
Asia News Monitor (2012). European Union: Protecting Intellectual Property Rights: EU customs detain over 100 million fake goods at EU borders, Bangkok, 25 July Customs and Tariff Bureau (Japan, 2009.). IPR Protection The Role of Japan Customs, The Report on IPR Enforcement, http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/ipr_p.pdf accessed on 23 Jan 2014 Hossain, S.S. (2009). Border Enforcement of IPR Laws in Australia, Global Trade and Customs Journal, 4(1), 1-14.

Yu, P.K. (2011) TRIPS Enforcement and Developing Countries, American University International Law Review, 26(3), 727-782

Jo, Y.S. (2014). 77,850 empty counterfeit vodka bottles handed over to brand owner for destruction, The Straits Times, Jan 7

Nicholson, (2007). The Impact of Industry Characteristics and IPR policy on Foreign Direct Investment, Review of World Economics, 143(1), 27-54

WTO Trade Policy Review, Bangladesh, 2012. (WT/TPR/S/270)

Writer

Dr. Mohammad Abu Yusuf

He is a member of Bangladesh Customs and Excise Cadre (15th BCS). He is now employed as a senior fellow at Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI), Dhaka. He was a lecturer at Dhaka University before joining Customs. He now works as a part time lecturer at AIUB University, Banani Dhaka and Institute of Chartered Secretaries (ICSB), Bangladesh. He did his B.Com (Hons) and M.Com (Acctg.) from the University of Dhaka and MBA and PhD both from Monash University, Australia.

COCAINE

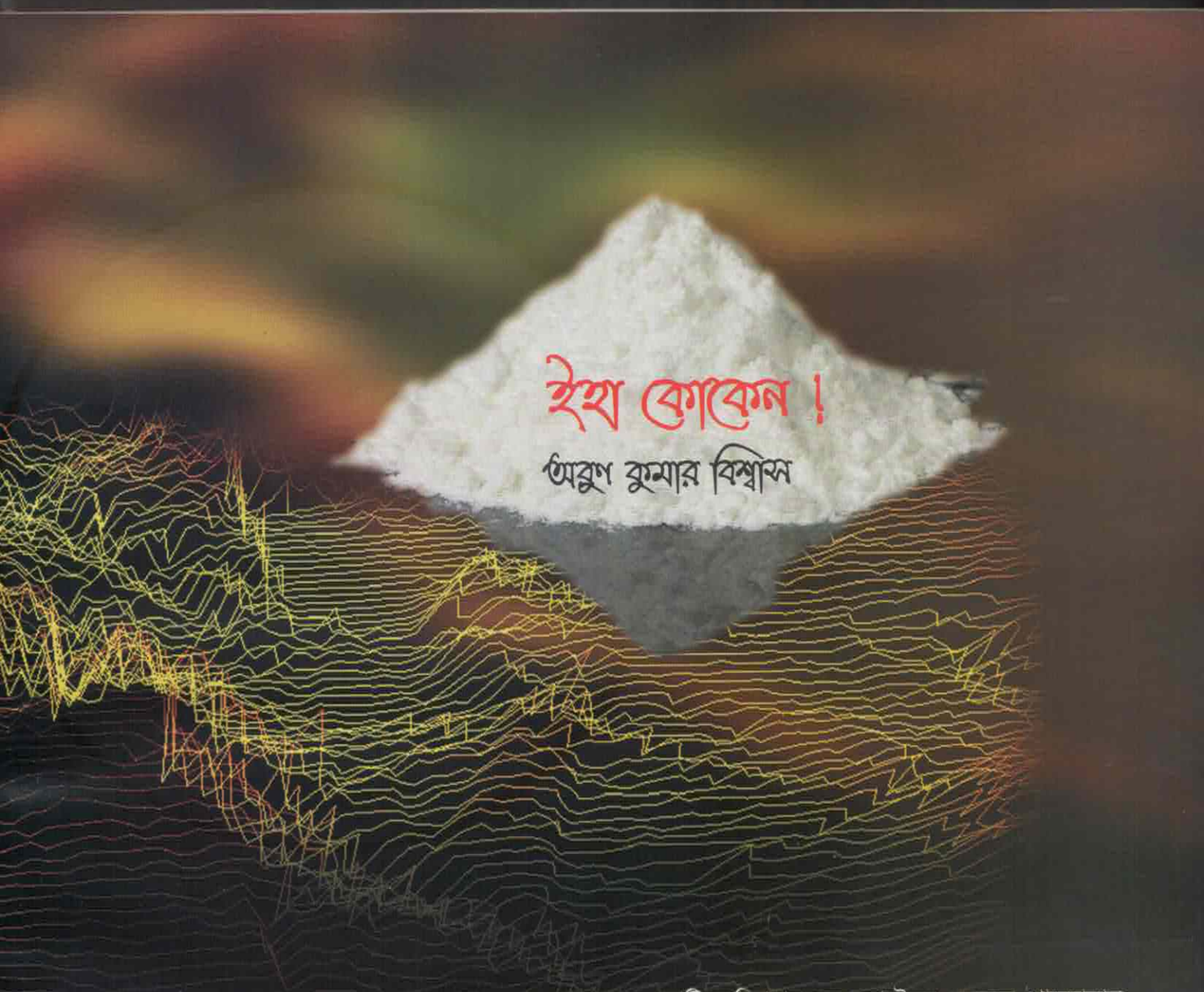

ইহা কোকেন !

অরুণ কুমার বিশ্বাস

অলোকেশ রয়। ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস, হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা। সদ্য বিলেত ফেরত এই চৌকস কর্মকর্তা ঢাকা এয়ারপোর্টে পদস্থ হবার পর থেকেই প্রবল তথ্য-জ্বরে ভুগছেন। বিভিন্ন সোর্স থেকে নিয়মিত তথ্য পাচ্ছেন, হুন্ডির মাধ্যমে বিপুল অংকের টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে। এরা আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সক্রিয় সদস্য। শুধু অর্থ নয়, আরো মারাত্মক সব কাজে জড়িত এই আন্তর্জাতিক মাফিয়া। কোকেন, হেরোইন, গাঁজা, চরস কী নেই ওদের তালিকায়!

মজার ব্যাপার হলো এসব তথ্য অনাহুত, কিন্তু অযাচিত নয়। লন্ডনে পড়ার সুবাদে একটি বিষয় বেশ ভালই রপ্ত করেছেন ডিসি অলোকেশ। তিনি জানেন আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে চাইলেও চোখকান বন্ধ করে অন্ধের মতো দিন কাটানো যায় না। তথ্য আসবে, সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে নির্ভরযোগ্য ডাটা-ব্যাংক গড়ে তুলতে পারলে হুন্ডিব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব।

মিস নিশার মুদ্রাপাচার কেসের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার নতুন উপসর্গ। ডিসি অলোকেশের কাছে খবর এলো, মুদ্রা ন
এবার কেস আরো জটিল। আরো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে।
কেসটা কী স্যার? সিরিয়াস কিছু? জানতে চায় ডেলটা।
সিরিয়াস তো বটেই। ভাবছি, এসব তথ্যের কতটুকু সত্যি! যারা এই তথ্যপ্রবাহে অংশ নেয়, কেন তারা এসব করে! লাভে
গুড় পিঁপড়েয় খেলে তাতে ওদের কী এসে যায়! ভাবছেন অলোকেশ।

ইয়েস স্যার। ইউ আর রাইট স্যার। কিন্তু আজ রাতের কেসটা কী একটু বলবেন?

অফ কোর্স! আপনি আপনার টিমকে সতর্ক করুন। বলুন, ডিসি সাহেবের তরফে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে। বিশেষ কে
দোতলার হেভি লাগেজ গেটগুলোতে। ইন অ্যাডিশন, ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এমনও হতে পা
মাল হয়তো আগেই ঢুকে গেছে। ক্যারিয়ার চেক-ইন ও ইমিগ্রেশন কনফার্ম করে তারপর মাল বুঝে নেবে। কড়া আদেশ দিলে
অলোকেশ।

'মাল' বলতে হেভি কিছু! নাকি বডিতে লুকিয়ে ক্যারি করবে? ফের জানতে চায় ডেলটা। লোকটা বড্ড ন্যাগিং। বাচ্চাদে
মতো একের পর এক প্রশ্ন করে। তবু নিজে মাথা খাটাতে রাজি নয়।

নাহ, বডিতে নয়। জানেন তো, সবাই নিশার মতো লাস্যময়ী শরীরের অধিকারীও নয়। এ মাল সে-মাল নয়, বেশ রগরগে

ডেলটাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে রিভলভিং চেয়ারে ঘাড় এলিয়ে দেন অলোকেশ। আজকের তথ্যটা এসেছে কোন নারীর থেকে নয়, বস ব্রাভো জানিয়েছেন, টেক কেয়ার। সাম কনট্রাব্যান্ড আইটেম মে পাস থ্রু দ্য এয়ারপোর্ট। ব্রাভো মানে শুল্ক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনারের কোড নেম। কমিশনার স্বয়ং আলফা নামে পরিচিত।

কনট্রাব্যান্ড মানে প্রহিবিটেড বা নিষিদ্ধ জিনিস! কী হতে পারে! ভায়াগ্রা টাইপ যৌন উত্তেজক ওষুধ! নাকি নেশাটেশা জাতীয় কিছু - যেমন কোকেন, হেরোইন, গাঁজা, মরফিন, চরস! 'মাল' মানে যদি নেশাকারক কিছু হয় তাহলেই পোয়াবারো। চাকরি নিয়ে টানাটানি! চৌকস অফিসার হিসেবে অলোকেশের নাম রয়েছে। এবারে যদি নাকের ডগা দিয়ে গাঁজা হেরোইনের চালান চলে যায়, তবে আর মুখ থাকবে না। প্রেস্টিজ পাঙ্কচার, ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে যাবে।

রাত তিনটার কিছু বেশি। ডিসি অলোকেশ দুরন্ত গতিতে মাথা খাটাচ্ছেন। ব্রাভো যা বললেন তাতে মনে হয় কোকেন বা হেরোইন জাতীয় কিছু হবে। কিন্তু সে মাল দেশে ঢুকবে, নাকি দেশের বাইরে যাবে তাও জানা নেই। যদি বাইরে যায় সেক্ষেত্রে সন্দেহজনক সকল যাত্রীর দেহতল্লাশী করতে হবে। এন্ট্রি গেটে আর্চওয়ে আছে। কিন্তু আর্চওয়েতে সবকিছু ধরা পড়ে না। অপারেটরদের লেভেল অফ ইনটেলিজেন্স আপটু দ্য মার্ক নয়। অলোকেশ ঠিক করলেন, তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু ছ'টা গেটে একা কী করে নজরদারি করবেন! কারো না কারো উপরে তাকে রিলাই করতেই হবে।

কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন ছাড়াও এয়ারপোর্টে দু'ডজন এজেন্সি দায়িত্ব পালন করে। এনএসআই, ডিজিএফআই, কাস্টমস গোয়েন্দা, ডিবি, এসবি, এপিবিএন এদের মধ্যে অন্যতম। এসবি'র সাব-ইন্সপেক্টর বেলাল অলোকেশের বিশেষ প্রীতিভাজন। ছেলেটা বুদ্ধিমান, সিচুয়েশন বুঝে খুব তাড়াতাড়ি রেসপন্স করতে পারে। অলোকেশ সেলফোনে বেলালকে ডেকে নেন।

কী খবর বলুন স্যার! অসময়ে স্মরণ করলেন যে! বেলাল বিভ্রান্ত।

রোগ না হলে কি কেউ ডাক্তার ডাকে! হঠাৎ তোমাকে ভীষণ প্রয়োজন পড়লো। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।
কী করতে হবে বলুন। আই'ম অ্যাট ইওর সার্ভিস স্যার।
সত্যি! এই কথা তোমার এএসপিকে বলবো! ধড় থেকে তোমার মুখ আলাদা করে ফেলবেন। পুলিশের খেয়ে কাস্টমসের মোষ তাড়ানো হচ্ছে! সহাস্যে বললেন ডিসি অলোকেশ।

তা নয় স্যার। আপনি যা করছেন সে তো দেশের ভালর জন্যই। আমরা সবাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। বিগলিত বেলাল। সে জানে, কাস্টমসকে খুশি রাখতে পারলে ফায়দা অনেক। দেশের বাইরে যেতে-আসতে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়।

অলোকেশ বললেন, তুমি জাস্ট আমাকে একটু হেল্প করো। দোতলার এন্ট্রি গেটে কড়া নজরদারি রাখতে হবে। যাত্রীর কাছে নিষিদ্ধ জিনিস থাকতে পারে। বাংলাদেশকে ওরা ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে।
নিষিদ্ধ জিনিস! কী স্যার?
এই যেমন ধরো কোকেন বা হেরোইন! গাঁজা, চরস, মারিজুয়ানা!

ডেলটা ততক্ষণে কাজে নেমে পড়েছে। পঁচিশজন মাইক নিয়ে পুরো এয়ারপোর্ট তোলপাড় করে ফেলেছে। বোর্ডিং ব্রিজ থেকে শুরু করে ট্রানজিট লাউঞ্জ, ডিউটি ফ্রি শপ, স্মোকিং রুম, বলাকার আশেপাশে, টারম্যাকলাগোয়া এরিয়া সবখানে তল্লাশি নিচ্ছে।
কিন্তু এখনও কোন সুখবর নেই। অথচ অলোকেশ জানেন, যা রটে তা কিছুটা হলেও বটে!
বেলাল জানতে চাইলো, স্যার, যাত্রী একা নাকি সহযাত্রী থাকবে? ছেলে নাকি মেয়ে! দেশি না বিদেশি?

এনিথিং, এনিবডি, এনিহয়্যার। আই ডোন্ট এগজাক্টলি নো। আমি তোমাকে শুধু সম্ভাবনার কথা বললাম। বাকিটা তোমাকেই জেনে নিতে হবে।
বেলাল কথা না বাড়িয়ে দোতলায় উঠে গেল।

অলোকেশ কফি খেয়ে উঠবেন। মন্তাজের খোঁজ পড়লো। সে গরম পানি নিয়ে রেডি। কফি এলো। কিন্তু কী মনে করে কফি ফেলে রেখে হেভি লাগেজ গেটে চলে যান অলোকেশ। হয়তো বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই।

প্রতিটি গেটে তিনি টহল দিচ্ছেন। এয়ারপোর্টের এমাথা থেকে ওমাথা চক্কর দিচ্ছেন। যাকে দেখতে একটু অন্যরকম লাগে তাকেই থামিয়ে জেরা করেন। ব্যাগ তল্লাশি করেন। কেউ কেউ অবশ্য যাত্রী হয়রানির মৃদু অনুযোগ তুললেন। ডেলটা তখন ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে বলেন ব্যাপারটা। হেরোইনের বড় চালান ধরার চেষ্টা হচ্ছে। দেশের স্বার্থে এটুকু অসুবিধা হাসি মুখে মেনে নেবেন নিশ্চয়ই।

অলোকেশ জানেন, এসব ঘটনা সাধারণত শেষরাতের দিকে বেশি ঘটে। তখন স্ক্যানিং মেশিন অপারেটরা নিদ্রালু হয়ে পড়ে। কেউ বা বসে বসেই খানিক ঝিমিয়ে নেয়। মনিটরে চোখ থাকে বটে, তবে সে চোখে দৃষ্টি থাকে না প্রায়শ। চালশেধরা চোখে ঘোলাটে লেন্স নিয়ে বুরবকের মতো রাত জাগা। সেই সুযোগে পাচারচক্র মালামাল নিয়ে কৌশলে কেটে পড়ে।

অলোকেশ মাইক ফোরটিনকে বললেন, প্রত্যেক স্ক্যান অপারেটরকে এক কাপ করে কালোকফি সাপ্লাই দিন। ওদের ঘুম কেটে যাবে, পাচারচক্র ধরা পড়বে।

সহসাই বেলালের ফোনকল। চার নম্বর গেট থেকে। ছুটে যান ডিসি অলোকেশ। দুজন যাত্রীকে কেমন সন্দেহজনক মনে হয়। চাইলেও বেলাল তাদের গতিরোধ করতে পারেন না। বিষয়টা শুল্ক বিভাগের। বেশি বাড়াবাড়ি করলে (ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন, হেডকোয়ার্টার্ড ইন মনট্রিল, কানাডা) আইআটা ও আইকাও (ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অরগানাইজেশন) নীতিমালা অনুযায়ী উল্টো পুলিশের বিরুদ্ধে ট্রেসপাসিং-এর মামলা করতে পারে।

বেলালের সন্দেহ অমূলক। বিশ-বাইশ বছর বয়সী দুটো ছোকরা এ কাজ করতে পারে না। তাও মিনিট কয়েক জেরা করলেন অলোকেশ। এরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। পড়ার জন্য মালয়েশিয়া যাচ্ছে। ছাত্ররাজনীতির নামে পড়াশুনো বাদ দিয়ে চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির বিষবাষ্পে আক্রান্ত দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই ছেলেরা বাধ্য হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। লুট হয়ে যাচ্ছে দেশ, কিন্তু উপায় কি!

ডেলটা ধরে আনলো আরো দুজন। চেহারায় কেমন যেন ঢুলুঢুলু ভাব। দেখে মনে হয় এই মাত্র গাঁজায় দম দিয়ে এসেছে। এবারেও ভুল।
অলোকেশ বললেন, সুপার সাহেব আপনি জানেন না যে ময়রা কালেভদ্রে মিষ্টিমুখ করে। এরা হল ক্যারিয়ার। আসল অপরাধী নিশ্চয়ই হাঁড়িকাঠে মাথা গলানোর জন্য জিভে কোকেন লাগিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকবে না।

রাত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এয়ারপোর্টের ভিতরে রাত বা দিন বোঝার উপায় নেই। এখানে সারাক্ষণ হাইভোল্টেজের টিউব লাইট জ্বলে। তা প্রায় হাজারখানেক। কখনও ইলেক্ট্রিসিটি ফেল করে না। যেন মনে হয়, অস্কারবিজয়ী ডিরেক্টর সত্যজিৎ রায়ের ছবির শুটিং চলছে। তবে তাপমাত্রার হেরফেরে অনুমান করা যায়। এখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর বাইরে।

এদিকে গ্রিনচ্যানেল থেকে সেটে কল আসে। বি জি ব্যাংকক ডিলেড ছিল। মাত্র ল্যান্ড করেছে। যাত্রীদের প্রচন্ড ভিড়।

চার্লি স্যার যদি একটু আসেন। ডেলটাকে দোতলার বিষয়ে বুঝিয়ে দিয়ে নেমে আসেন চার্লি।
ডিসি অলোকেশ সাবর্ডিনেটদের সমস্যা বোঝেন। সরকারি চাকরি করতে গেলে ধার ও ভার দুটোই চাই। একজন ইন্সপেক্টর চাইলেও নিজেদের খুব বেশি অ্যাজার্ট করতে পারে না। তাই অবস্থা বেগতিক দেখলে তারা চার্লির মতামত নেয়, তার উপস্থিতি কামনা করে।
অলোকেশ নিচে নেমে দেখেন জনতার স্রোত। নরমালি বি জি ব্যাংকক ফ্লাইটে প্যাসেঞ্জার খুব একটা থাকে না। এর প্রথম কারণ, বাংলাদেশ বিমান আমাদের ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ার হলেও ভাড়া বেশি, ব্যবস্থাপনা দুর্বল। শিডিউলও ঠিকঠাক মেনটেন করতে পারে না। বাংলাদেশ রেলওয়ের মতো কোন্ ফ্লাইট কখন টেকঅফ করবে তা কেবল আল্লাহ মালুম। এক্ষেত্রে এমিরেটস এবং সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স পারফেক্ট টাইম মেনটেন করে।

ইদানিং ব্যাংকক থেকে বেশ ইলেক্ট্রনিক আইটেম আসে। মোবাইল ফোন (নকিয়া এন সিরিজ) থেকে শুরু করে ক্যামেরা (ডিজি ক্যাম, বেটাক্যাম, হাই ডেফিনেশন ক্যামেরা, ব্লু টুথ, আইফোন, আইপ্যাড, মেমরি কার্ড) সুযোগ বুঝে সৌম্যকান্তি যাত্রীরা ব্যাগের পকেটে ফেলে নিয়ে আসে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কোনমতে পার করতে পারলেই বিমানভাড়া উঠে আসে।

জনতার স্রোত যাচ্ছে, বন্যার পানির মতো। তাকিয়ে দেখছেন ডিসি অলোকেশ। আইকাও নীতিমালা বলে, গ্রিনচ্যানেল ব্যবহারকারীর মালামাল স্ক্যান করার বিধান নেই। কিন্তু এটা বাংলাদেশ। তদুপরি রেডচ্যানেল চালু নেই। তাই শুল্কযুক্ত ও মুক্ত দু'রকম পণ্যই এখন স্ক্যান করতে হয়। যাতে সরকারের মূল্যবান রাজস্ব ফাঁকি না হয়।

ডিসি অলোকেশ নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কিছু পণ্য এমনি ছাড় দেন। দৈবচয়ন করে কিছু স্ক্যান করান। সবার আগে যাত্রীর চেহারা দেখেন, হাবভাব বোঝেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেন, বাহিত পণ্য স্ক্যান করা হবে কি না। রোগী হলে অগ্রাধিকার। বৃদ্ধ হলে টপ প্রাইয়রিটি। সরকারের লোক বলে কি মানবতাবোধ থাকতে নেই!

প্রচুর লোক যাচ্ছে। হরেক রকম লাগেজ। পোঁটলাপুঁটলিও আছে। মানে এরা লেবার শ্রেণীর। তবে কেতাদুরস্ত প্যাসেঞ্জার বেশি। থাইল্যান্ডে কামলা খাটার সুযোগ নেই খুব একটা। জনতার ভিড় ফিকে হয়ে আসছে ক্রমশ। অলোকেশ ভাবলেন, এবার উপরে উঠে যাবেন। কোকেনের খোঁজে। কী মনে করে একটু দাঁড়ালেন। ঢ্যাঙামতোন এক লোক, হেলেদুলে আসছেন। ধোপদুরস্ত পোশাক, ক্লিনশেভড, যেন বিমান থেকে নামার আগে গালে ক্ষুর দিয়েছেন। হবে হয়তো। কতো লোক কত রকম উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে ফেরে। ইনি হয়তো জীবনের সেই মস্ত হেঁয়ালিপূর্ণ কাজটি করতে এসেছেন। আই মিন বিয়ে। কনে দেখবেন। কনের বাড়ির লোকের কাছে ফার্স্ট ইমপ্রেশন যাতে বাজে না হয় তাই সেজেগুজে বেরিয়েছেন।

হাতে ব্যাগেজের বাড়াবাড়ি নেই। একটা মাত্র ট্রলি। টাইটান ব্র্যান্ড, ইয়েলো অরেঞ্জ ফোর হুইলার। দামি জিনিস, অলোকেশ জানেন। এই ধরনের ক্যারি অন ট্রলার ব্যাগ তিনি কিনতে গিয়েছিলেন লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। বড্ড দাম! আড়াইশ পাউন্ড। বিডিটিতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা।

ভদ্রলোকের হাঁটার মধ্যে একধরনের বেতাল আই মিন ছন্দহীনতা আছে। মাইক ওয়ান তাকে ছেড়েই দিয়েছিল। অলোকেশ থামালেন! এক্সকিউজ মি স্যার! হোয়ার আর ইউ ফ্রম?
উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়লেন। বি জি ব্যাংকক কোত্থেকে আসে?
ইয়েস, থাইল্যান্ড থেকে।
সো ডু আই। এনি প্রবলেম? চোখ নাচালেন তিনি।
নট অ্যাট অল। ইওর ব্যাগেজ প্লিজ। অলোকেশ তাকে স্ক্যানিং মেশিন দেখিয়ে দিলেন।

বেঁকে বসলেন তিনি। কেন দিতে হবে! কেন! হোয়াই?
কারণ আমি দিতে বলেছি।
ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন?
মিসইউজ নয়, ব্যবহার করছি। কোঅপারেট আস প্লিজ। ফাস্ট।
যদি না দেই!

কেন মিছেমিছি প্রবলেম করছেন! দিতে হবে। আই সাসপেক্ট ইউ। মুখ ফসকে বলে ফেললেন অলোকেশ। পরে ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তীর ছুটে বেরিয়ে গেছে।
সাসপেক্ট? কেন, আমি কী করেছি! আমি কি স্মাগলার? তেড়িয়া টাইটান ব্র্যান্ড ট্রলিধারী ভদ্রলোক।
তা বলিনি। পিজ লেট আস স্ক্যান। অলোকেশের ইশারা পেয়ে সেপাই এগিয়ে এলো। আদুরে ভঙ্গিমায় কমলা-হলুদ ট্রলিখানা ধরে তুলে দিল স্ক্যানিং মেশিনের রোলার বেল্টে।
দেখুন, ভাল হবে না বলছি। আমার ট্রলিতে কিচ্ছু নেই। স্রেফ ডেইলি ব্যাগেজ। খেপে উঠলেন ভদ্রলোক। পাসপোর্টখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন মাইক ফিফটিন। দেশি লোক, নাম আফজালুর রহমান। ব্যাংকক থাকেন অনেকদিন, তবে পিআর (পারমানেন্ট রেসিডেন্স) পাননি।
নাহ, স্ক্যানে কিছু ধরা পড়েনি। আবারও দেয়া হল। নাহ নেই। স্রেফ মামুলি জিনিস। জামা-প্যান্ট, টুথপেস্ট, আন্ডার-গারমেন্টস এইসব।
কী, এবার হলো তো! স্যাটিসফাইড? হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন আফজাল। কিছুটা চাপে ডিসি অলোকেশ। নিজের বোকামো ধরা পড়ে গেল কি!
মাইক ফিফটিন বলল, স্যার যেতে দেই। কিছু তো পাওয়া গেল না। উপস্থিত সেপাইরা বোধ হয় নিঃশব্দে মুখ টিপে হাসছে। কিন্তু অলোকেশ ভাবছেন, কী ভাবছেন! তিনি নিজেই কি জানেন ছাই!

আফজাল এবার ট্রলির উদ্দেশে পা বাড়ান। তিনি যেতে উদ্যত। এক পা বাড়িয়েছেন। পায়ে লেসবিহীন সাদা রঙের পাম্প শু। পরনে ফেড জিন্স, হালকা নীল টি-শার্ট। গলায় ঝুলছে স্টারদের মতো মোটা পেঁচানো গোল্ডচেইন। হাতে ব্রেসলেট। বেশ সুপুরুষ দেখতো।
থামুন মিস্টার আফজাল। অলোকেশের কণ্ঠে স্পষ্ট অথরিটি।
আরেক পা সামনে দিতে গিয়েও তড়িতাহতের মতো ফিরে তাকান আফজাল। কেন, আবার কেন! হোয়াটস ইওর প্রবলেম অফিসার! ঝাঁঝমেশানো গলায় বলল সে।
প্রবলেম আমার নয়, আপনার? ব্যঙ্গোক্তি ছুড়লেন অলোকেশ।

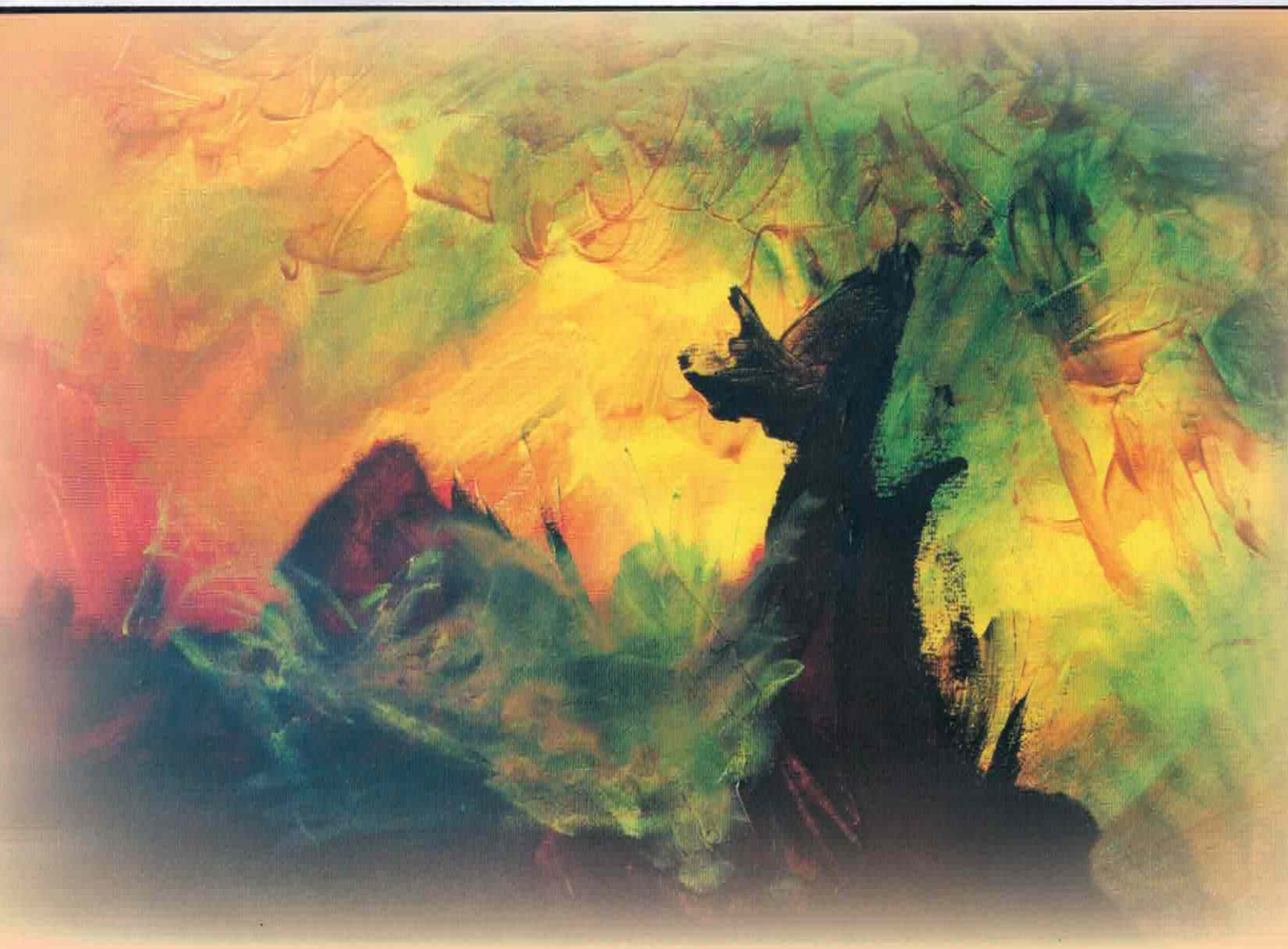

হোয়াট ডু ইউ মিন?

নিচে তাকান, আপনার পায়ের কাছে! দেখুন তো ওটা কি? আপনার হিপের দিকটা অমন ফেঁপে আছে কেন আফজাল সাহেব?

অলোকেশের কথা শুনে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গ্রিনচ্যানেলের সামনে মেঝেতে। কেমন করে যেন আফজালের প্যান্টের পায়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কালো চৌকোমতোন একখানা জিনিস! কী, কী ওটা?

মেমরি কার্ড! ওনলি এক পিস!
ফুল ইউ আর! হাজারে ফুরোবে না। আমি ওর গদাইলস্করি চালে হাঁটা দেখে বুঝেছি কিছু একটা ওকে বড্ড খোঁচাচ্ছে। জুতোর শুকতলায় পিন বিঁধলে যেমন লাগে। তাছাড়া পেটটা বড্ড ভারি মনে হয়। মেয়ে হলে ধরতুম এডভান্সড স্টেজ। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে তো তা হবার নয়! নাকি আজকাল ঘন ঘন গণেশ উল্টাচ্ছে!

ডিসি অলোকেশের অনুমান সত্যি প্রমাণিত হল। ব্যাংককফেরত যাত্রী আফজালের পেটের বেড়ি থেকে বাইশশ'র মতো হাইক্যাপাসিটি মেমরিকার্ড উদ্ধার হল যার বাজার দর লাখ চারেকের কম নয়!

কার্ড তো হল, কিন্তু কোকেন! এই অপারেশনে আদৌ পরিতৃপ্ত নয় অলোকেশ। ব্রাভোর খবর মিথ্যে নয়। চার্লিকে তা প্রমাণ করতেই হবে। অমনি ডেলটার ফোনকল, প্রিং প্রিং!

ইয়েস!

স্যার, শিগগির আসুন। দুজন বিদেশী নজরদারিতে আছেন। আপনার প্রেজেন্স দরকার। ফরেন বলে কথা! আমাদের মহামান্য গেস্ট।

ডেলটার কথায় খুব কনভিন্সড নন অলোকেশ। এর আগেও তিনি বাঘ আসার খবর দিয়েছেন, কিন্তু সেসব খবরে জিস্ট কিছু মেলেনি। সাবঅর্ডিনেটের ডাকে সাড়া না দিলে ওরা হীনমন্যতায় ভোগে। নিজেদেরকে ইগনোর্ড মনে করে। তাই গল্পের সেই দুষ্টু রাখালবালকের কথা মেনে নিয়েই হেভিলাগেজ গেটে ঢুকলেন অলোকেশ। গিয়ে দেখেন দুই নিগ্রো বুড়োবুড়িকে নিয়ে রীতিমতো টানাহেঁচড়া করছে সিভিল এভিয়েশন ও ডেলটা।

স্ক্যান মেশিন অপারেটর বলছে ওদের ট্রলিতে সন্দেহজনক কিছু নেই। কিন্তু ডেলটা ওদের মুখ থেকে মদের গন্ধ পাচ্ছেন মদ গেলার সাথে কোকেনের কী সম্পর্ক ঠিক পরিষ্কার নয় ডিসি সাহেবের কাছে।
আপনার সন্দেহের তীর ওদের দিকে কেন জানতে পারি কি?
ডেলটা চুপ। তবে অলোকেশের কেন যেন মনে হয় নিগ্রোদুটো ঠিক স্বাভাবিক নয়। লাল টকটকে চোখ, পরনের পোশাক ময়লা, কাঁধে ঝুলছে বেঢপ সাইজের একখানা কাপড়ের ব্যাগ। ক্যাম্বিসে তৈরি। ব্যাগ না বলে একে বরং পোঁটলা বলা শ্রেয়।

ওদের দুজনকে (আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন) এপিবিএনের জিম্মায় রেখে অলোকেশ পাসপোর্ট নিয়ে পড়লেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগাপাশতলা সব দেখলো। আফ্রিকার পূর্বে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপদেশ মাদাগাস্কারের সিটিজেন। নাম টিমি ও জেমিইনা। মাদাগাস্কারের রাজধানী আনটানানারিভো। মোটামুটি গরিব দেশ বলা যায়। মাথাপিছু আয় হাজার ডলারেরও কম। ওখানে প্রচুর ধান হয়। এছাড়া আছে কিছু খনিজ পেট্রল, মূল্যবান পাথর ও মেক্সিকান ভ্যানিলা। লোকেরা কর্মঠ, চাষবাস করে খায়। এখানে আছে মজাদার আংটিপরা লেজঅলা বন্যপ্রাণী লেমুর। শোনা যায়, মাদাগাস্কার দ্বীপে চলে চোরাচালানের বেশ রমরমা বিজনেস। নেশাকারক জিনিসের বড়সড় র‍্যাকেট রয়েছে সেখানে। দ্বীপাঞ্চল বলে নৌপথে খুব সহজেই কারবারিরা মালামালসমেত ভেগে যেতে পারে।

পাসপোর্টে তেমন দূষণীয় কিছু নেই। এত দেশ থাকতে হঠাৎ বাংলাদেশে কেন জানতে চাইলে ভালমানুষের মতো জেমিইনা বলল, কেন, বেড়াতে। উই টুর দ্য ওয়ার্ল্ড। ইটস অ্যা পার্ট অফ দ্যাট টুয়ার!
তোমাদের সাথে অ্যাডিকটিভ কিছু আছে কি? মামুলি প্রশ্ন করেন ডিসি অলোকেশ।
নেই তো। বিশ্বাস না হয় চেক করো। মেশিনে দাও।

অলোকেশ ভাবলেন, এদের বডি চেক করা ঠিক হবে কি না। ইদানিং অবশ্য দেহে লুকিয়ে বহনের ঘটনা খুব বেড়ে গেছে। স্রেফ সন্দেহের বশে কিছু করা ঠিক হবে কি না....! স্থির করতে পারছেন না তিনি।
এবার অলোকেশ সরাসরি ওদের চোখের দিকে তাকালেন। বলা যায় সম্মোহনের চেষ্টা। অলোকেশ জানেন, যত বড় জাঁদরেল অপরাধীই হোক, জেরার সামনে কিছুটা হলেও টসকায়। কপালে ঘাম, নয়তো কণ্ঠে জড়তা। কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আসবেই আসবে।
কবে এসেছো ঢাকায়! আবারও মামুলি প্রশ্ন।
টেন ডেজ ব্যাক! টিমি বলল। বয়স কারো পঞ্চাশের কম নয়। এই বয়সী লোকদের চট করে সন্দেহ করা বা ভব্যতাবর্জিত আচরণ করা যায় না।
মাত্র দশদিনের টুর! কিছু একটা হিসেব কষেন অলোকেশ। এখানে কোথায় ছিলেন আপনারা? কোন্ হোটেলে? ফের জানতে চান।

জেমিইনা কিছু বলতে গিয়ে থমকায়। তো তো করে বলল, বেস্ট ওয়েস্টিন। কিন্তু সে বলার আগেই টিমি বলে, লা ভিনচি! দুজন দুজায়গায় ছিল কি! হতেই পারে। কিন্ত একযাত্রায় পৃথক ফল! হয় কখনও? এদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রী নয়, স্রেফ বন্ধুত্ব! স্পাউজ না হোক, ভিনদেশে এসে একজন মহিলা একা একা হোটেলে থাকবে! হিসেবটা যেন ঠিক মিলছে না।
ঠিক করে বলো কোথায় ছিলে তোমরা? গলা চড়িয়ে জানতে চান অলোকেশ। এমনও হতে পারে, কারো হয়তো নাম মনে নেই। মাত্র দশদিনের ব্যাপার, এটুকু ভুল হতেই পারে।
বেস্ট ওয়েস্টিন! জোর দিয়ে বলল জেমিইনা। প্রটেস্ট করে টিমি, না, লা ভিনচি। সহসা চোখ টিপলো জেমিইনা। অন্য কেউ না দেখলেও ঠিক দেখে নিলেন অলোকেশ। তিনি নিশ্চিত, এখানে রহস্য কিছু আছে।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন। এনএসআই ফিল্ড অফিসার আরিফকে ডেকে নিয়ে বললেন, উই নিড টু ইনটেরোগেট দেম, সেপারেটলি। ইফ নিডেড, ক্রসভেরিফাই হোয়াট দে সে।
ওকে স্যার! ঘাড় নাড়লো আরিফ।

আবারও জেরা করা হল। বিস্তারিত। শুধু তাই নয়, এক্ষুণি অলোকেশ হোটেল বেস্ট ওয়েস্টিন ও লা ভিনচিতে ফোন করলেন। মজার ব্যাপার হল, ওদের অবস্থানের কথা কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। তার মানে নিগ্রোরা এর কোন হোটেলেই থাকেনি, বা থাকলেও বেনামে থেকেছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা মোটামুটি উড়িয়ে দেয়া যায়। কারণ বিদেশীদের প্রকৃত পরিচয় যাচাই না করে রুম বরাদ্দ দেয়া নিষেধ। অবশ্য নিয়ম থাকলেই বা তা মানছে কে!

অলোকেশ বুঝতে পারছে ওরা মিথ্যেকথা বলছে। কিন্তু কেন! হোটেলে থাকা নিয়ে ওদের এত লুকোছাপা কেন! হোয়াট ফর! মিস্ট্রিয়াস! সাথে সাথে ডিসিশান নেন, ওদের তল্লাশি নিতে হবে। আগাপাশতলা সব!
তাই করা হল। এখানে ডিসি অলোকেশের নির্দেশ অমান্য করে এমন সাহস কার! কিন্তু বাস্তবে কোন লাভ হল না। ওদের বডিতে কিছু নেই। এক্কেবারে ফকফকা!
কিছুটা হতোদ্যম অলোকেশ। তবে নিরাশ নন। সেন্ট পারসেন্ট সাক্সেস বলে কোন কথা নেই। ব্যর্থতা আছে বলেই তো সাফল্য এত মধুর! তাছাড়া ফেইলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। যদিও এর ঠিক পরের অনুরোধ, প্লিজ ডোন্ট ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ পিলারস!

টিমি-জেমিইনার ব্যাগেজ স্ক্যান করা হল। বেশ কয়েকবার। কিচ্ছু নেই। সবাই হতাশ। এবার এদের সসম্মানে ছেড়ে দিলেই হয়। ওদিকে ফ্লাইট অ্যানাউন্স হয়ে গেছে। চেক-ইন শেষ, ইমিগ্রেশন চলছে। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। ডিসি অলোকেশের কাজ শেষ না হলে বিমান ফ্লাই করবে না। উড়তে গেলে শুল্কবিভাগের গ্রিন সিগনাল চাই। যেন কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট সুনীল আকাশের ইজারা নিয়ে রেখেছে।
তাই বলে বিনা কারণে এতগুলো প্যাসেঞ্জারের মূল্যবান সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নন অলোকেশ। যা করার চটজলদি করতে হবে। বাকিদের সরিয়ে দিয়ে এবার তিনি নিজে টিমির ট্রলি নিয়ে পড়লেন। উল্টোপাল্টে দেখলেন। ভেতরে রাখা কাপড়চোপড়, ডিওডোরন্ট, শেভিংকীট বের করে আলাদা আলাদ রাখলেন। আদার এজেন্সিস অবশ্য ইতোমধ্যে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তারা নিশ্চিত, নেহাতই সময় নষ্ট। মাদাগাস্কান যাত্রীদের সাথে নিষিদ্ধ কিছু নেই।

ব্যাগেজ নাড়াচাড়ার এক পর্যায়ে অলোকেশের নাকে বিজাতীয় কোন গন্ধ এলো। ব্যাগের ভিতর নাক ডুবিয়ে পুনরায় শুঁকছেন তিনি। বাকিরা হাসছে। কিন্তু অলোকেশের তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। পাছে লোকে কী বলল তা নিয়ে ভাবতে এতটুকু আগ্রহ নেই এই চৌকস শুল্ক কর্মকর্তার। অকম্মারা চিরকালই হাসে, তাতে উপহাসের মজুদ বাড়ে কিন্তু দুনিয়ার কিছু এসে যায় না।
বললেন, দেখুন তো ডেল্টা, কোন গন্ধ পান?

কিসের গন্ধ স্যার! পুরনো সব কাপড়চোপড়। তাছাড়া শুনেছি ওরা ন'মাসে ছ'মাসে একবার গোসল করে। ওদের গা থেকে কেমন বিটকেল দুর্গন্ধ বেরোয়!

শোনাকথায় কান দেবেন না একদম। কিপ ইন মাইন্ড, অন্যের কথা শোনার জন্য গভর্নমেন্ট আপনাকে মাইনে দেয় না। নিজের মাথা খাটিয়ে কিছু করুন। আখেরে কাজে দেবে। বসের কাছে কড়া ধাতানি খেয়ে হুঁশ ফেরে ডেলটার।
ইয়েস স্যার, কেমন যেন চোখজ্বলা গন্ধ। তোতাপাখির মতো শব্দ বেরোয় ডেলটার কণ্ঠে।
তার মানে ঝাঁঝালো! আর কিছু?
ইয়েস স্যার। নাকের ভিতর দিয়ে গন্ধ টানার সময় কেমন শীতল একটা ভাব! যেন শরীরে আবেশের আবির্ভাব। সহসাই কাব্যিক হয়ে ওঠে ডেলটা।
এই তো বেশ বুলি ফুটেছে। ইউ আর রাইট ডেলটা। আমারও ঠিক অমন অনুভূতি হচ্ছে। এবার কিছু আইডিয়া মাথায় এলো?
কী ব্যাপারে স্যার?
ইওর হেড এন্ড মাই স্কাল! জাস্ট ইমপসিবল! বিরক্তিভরে আপন মনে আওড়ান আলোকেশ। সশব্দ বলেন, বলছিলাম, কিছু অনুমান করতে পারলেন?
ডেলটা অফ। কোন সাড়া নেই। মাইক ফোরটিন বলল, ট্রলিতে তো কিছু নেই। আপনি স্যার লুকোনো কিছুর কথা ভাবছেন?
এগ্‌জাক্টলি সো! ট্রলি ঠেলার এই রডে টোকা মেরে দেখুন। টনটন শব্দের বদলে কেমন ঢপ ঢপ করছে। তার মানে এখানে জিনিস আছে। সহসা গুমোর ফাঁস করলেন অলোকেশ।

সাথে সাথে সেপাই হ্যাকস এনে ঘচাঘচ কাটতে থাকে ট্রলির রড। তখন একটা কান্ড ঘটলো। চোখের পলকে পঞ্চাশোর্ধ মাদাগাস্কান মহিলা জেমিইনা মহিলা পুলিশের হাত ফসকে দে ছুট।
এই ধর ধর ধর! শোরগোল উঠলো। ততক্ষণে মহিলা হাওয়া। হাওয়া মানে গেট থেকে বেরিয়ে দুখানা গাড়ির সামনে দিয়ে ঝেড়ে দৌড়। এক ছুটে রাস্তার ওপারে। আর তাকে পায় কে?

ওই রে, গেল রে! গেল গেল! জনতার কলরব।

জেমিইনা একটা চলন্ত গাড়ির তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল! তারপর মিশে গেল ওখানে স্বজনদের রিসিভ করতে অপেক্ষমাণ জনতার ভিড়ে! কিন্ত এদিকে টিমির কী হল! চুন্নি বান্ধবীর দেখাদেখি সেও ছুট লাগিয়েছিল। কিন্তু ডিসি অলোকেশ তৈরি। ব্যাগেজ ফেলে টিমি তার সামনে দিয়ে দৌড় দিতেই তেরছাভাবে পা পেতে দিলেন। যাকে বলে ল্যাং। ছোটবেলায় অলোকেশ এই ল্যাং মারা বিদ্যেটা বেশ ভালই রপ্ত করেছেন। এখনও মারেন। যারা প্রফেশনাল সিকোফ্যান্ট, মানে তেল মেরে মেরে পোস্টিং বাগায়। সামনে পেছনে দুরকম স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে। সোজা কথায় ব্যক্তিত্বহীন মোনাফেক!

অলোকেশের ল্যাং খেয়ে দড়াম শব্দে মুখ থুবড়ে পড়লো টিমি। কিন্তু রহস্যের এখানেই শেষ নয়। ট্রলির পুশ-পিস কেটে যা বেরোল তাকে বাংলাভাষায় বলে টুথপেস্ট। দুখানা ট্রলির রডে লুকানো ছিল মোট দশটা পেস্টটিউব। প্রতিটি টিউবের ওজন কম করে হলেও দুশগ্রাম। সেই হিসেবে মোট পেস্টের পরিমাণ দু কেজি।

কী আছে এতে? জানতে চান অলোকেশ। মিউ মিউ করে টিমি কী বলে বোঝা ভার। ল্যাং খেয়ে তার ঠোঁট কেটে ফুলে ঢোল। অলোকেশের অনুমান নেশাজাতীয় কিছু। এয়ারপোর্ট নারকোটিক বিভাগের দায়িত্বরত সুপার এলেন। দেখেশুনে ইনিশিয়াল টেস্ট করে মতামত দিলেন, 'ইহা কোকেন!'

এভাবে স্রেফ শুঁকে শুঁকে দু'কেজি কোকেন উদ্ধার করলেন ডেপুটি কমিশনার অফ কাস্টমস অলোকেশ রয়, যার বাজার মূল্য কম করে হলেও আড়াই কোটি টাকা।

লেখক
অরুণ কুমার বিশ্বাস
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ)

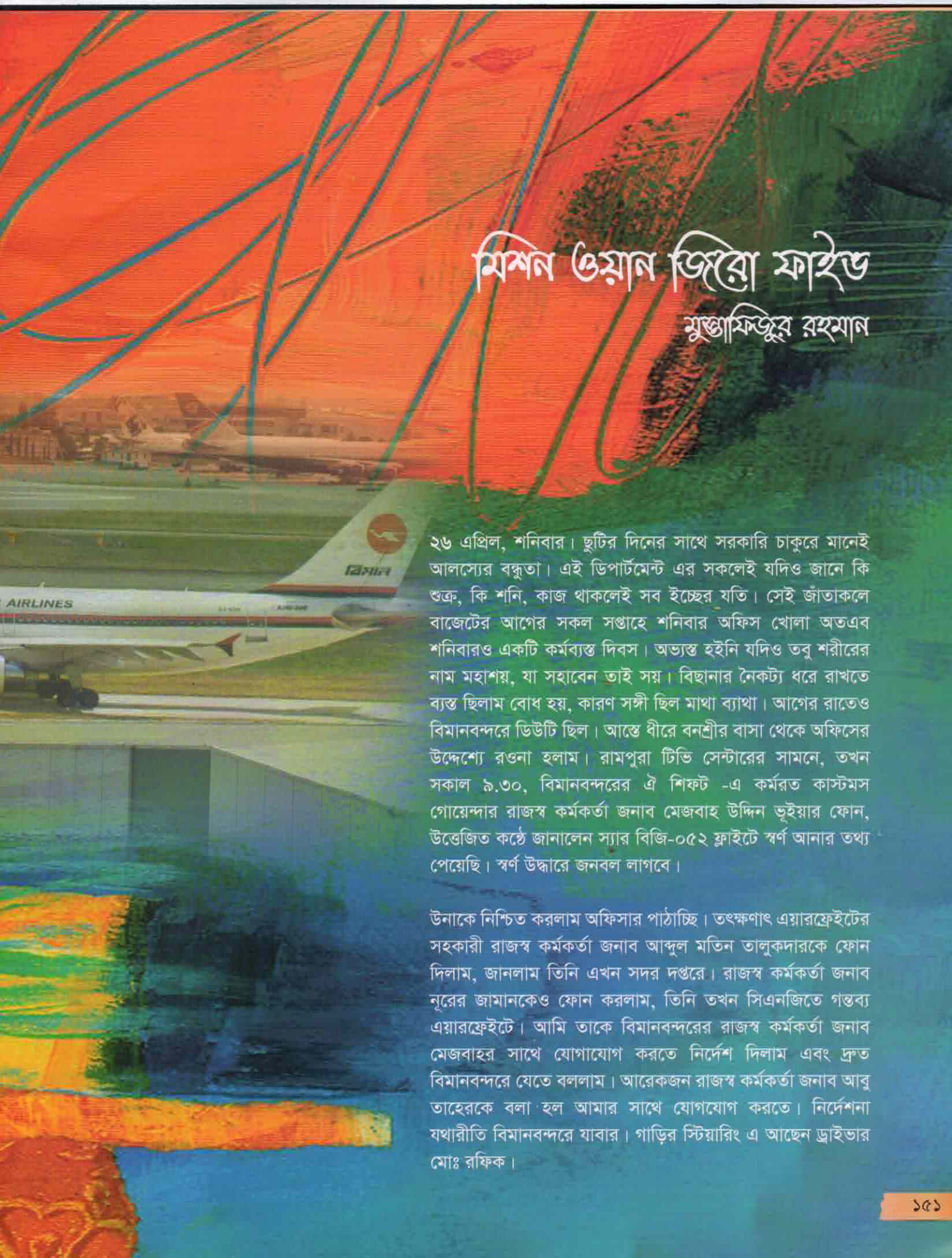

মিশন ওয়ান জিরো ফাইভ

মুস্তাফিজুর রহমান

২৬ এপ্রিল, শনিবার। ছুটির দিনের সাথে সরকারি চাকুরে মানেই আলস্যের বন্ধুতা। এই ডিপার্টমেন্ট এর সকলেই যদিও জানে কি শুক্র, কি শনি, কাজ থাকলেই সব ইচ্ছের যতি। সেই জাঁতাকলে বাজেটের আগের সকল সপ্তাহে শনিবার অফিস খোলা অতএব শনিবারও একটি কর্মব্যস্ত দিবস। অভ্যস্ত হইনি যদিও তবু শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবেন তাই সয়। বিছানার নৈকট্য ধরে রাখতে ব্যস্ত ছিলাম বোধ হয়, কারণ সঙ্গী ছিল মাথা ব্যাথা। আগের রাতেও বিমানবন্দরে ডিউটি ছিল। আস্তে ধীরে বনশ্রীর বাসা থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রামপুরা টিভি সেন্টারের সামনে, তখন সকাল ৯.৩০, বিমানবন্দরের ঐ শিফট -এ কর্মরত কাস্টমস গোয়েন্দার রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মেজবাহ উদ্দিন ভূইয়ার ফোন, উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন স্যার বিজি-০৫২ ফ্লাইটে স্বর্ণ আনার তথ্য পেয়েছি। স্বর্ণ উদ্ধারে জনবল লাগবে।

উনাকে নিশ্চিত করলাম অফিসার পাঠাচ্ছি। তৎক্ষণাৎ এয়ারফ্রেইটের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মতিন তালুকদারকে ফোন দিলাম, জানলাম তিনি এখন সদর দপ্তরে। রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব নূরের জামানকেও ফোন করলাম, তিনি তখন সিএনজিতে গন্তব্য এয়ারফ্রেইটে। আমি তাকে বিমানবন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মেজবাহর সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিলাম এবং দ্রুত বিমানবন্দরে যেতে বললাম। আরেকজন রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব আবু তাহেরকে বলা হল আমার সাথে যোগযোগ করতে। নির্দেশনা যথারীতি বিমানবন্দরে যাবার। গাড়ির স্টিয়ারিং এ আছেন ড্রাইভার মোঃ রফিক।

ব্যস্ত শহরের খোলনলচে বদলানো ছুটির দিনের বদৌলতে কিছুক্ষণেই পৌছে গেলাম গন্তব্যস্থান মগবাজার গুলফেঁশান প্লাজায়। সময় তখন ১০.৩০। রুমে ঢুকেই বসতে হল ফাইল নিয়ে আর সে সাথে কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং। এর মধ্যে জনাব মেজবাহ আমাকে ফোনে আমাকে জানান স্যার এয়ারক্রাফটে স্বর্ণ (২৪০ পিস) আছে নিশ্চিত কিন্তু তা উদ্ধার করা যাচ্ছে না এবং এয়ারক্রাফট র‍্যামেজিং এর বিষয়ে দিক নির্দেশনা চাইলে আমি তাকে রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মিজানুর রহমান এর সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেই এবং মিজানুর রহমানকে আমার রুমে ডেকে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেই। জনাব মিজানুর রহমান একজন দক্ষ ও সিনসিয়ার কর্মকর্তা। তিনি যথাযথভাবে বিষয়টি মেজবাহ কে বুঝিয়ে দেন। আনুমানিক সকাল ১১.০০ ঘটিকায় সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এবং মিজানুর রহমান আমার রুমে বসে কয়েকটি মামলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মাঝপথে ডাক পড়ল মহাপরিচালকের কক্ষে আদেশ এল, "তথ্যানুযায়ী কাজ হচ্ছে না, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিছুই। তুমি সদলবলে বেরিয়ে পড়। একটা রেজাল্ট চাই।" খোঁজ লাগালাম ড্রাইভারদের। কিন্তু অফিসের মাইক্রোবাস আর আমার পাজেরো দুই-ই অনুপস্থিত অফিসে। কিন্তু এ অজুহাতে তো আর সময়কে বেঁধে রাখা যাবে না। যে করেই হোক যেতেই হবে। উপায় একটা করতেই হবে, ইচ্ছেটাই তো মূখ্য। উদ্ধারে এগিয়ে আসলেন সহকারী পরিচালক কামরুজ্জামান সাহেব। উদ্ধার বার্তা তার উচ্ছিষ্ট যৌবনা কিঞ্চিত সুদর্শনা গাড়ি। খানিকটা পুরনো হলেও মন্দ নয়। বেরিয়ে পড়লাম সাথে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মিজান সাহেব ও সিপাই কবির হোসেন সিকদার ও অরূপ কুমার সাহা। গ্যারেজ পেরিয়ে রাস্তায় নামতেই দেখি আমাদের মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে। অতএব এক মূহুর্তে গাড়ি বদলে আবার যাত্রা শুরু। আনুমানিক ১২.৩০ ঘটিকায় বিমানবন্দরে পৌছে এয়ারক্রাফট-এ চলে যাই। শুধু কাস্টমস গোয়েন্দা নয় ঢাকা কাস্টম হাউসের সহকারী কমিশনার জনাব ইশরাত জাহান, তিনি কিছুদিন পূর্বে শুল্ক গোয়েন্দার এডি হিসেবে কর্মরত ছিলেন, জনাব মাধব বিকাশ এবং প্রায় সকল স্তরের কর্মকর্তায় সয়লাব এয়ারক্রাফট। এরই মাঝে জনাব মেজবাহ বাংলাদেশ বিমানের এয়ারক্রাফট মেকানিক এসিস্ট্যান্ট জনাব মোঃ আনিস উদ্দিন ভূইয়া এর ব্যবহৃত ফোন সেটটি দেন এবং ইনবক্সের মেসেজসমূহ দেখান। তার ডুয়াল সিমের মোবাইলটির কিছু চুম্বক মেসেজ তুলে দিচ্ছি পাঠকের জন্য। ২৬-০৪-২০১৪ তারিখ সকাল ০৭.১৩ মিনিটে গৃহীত একটি মেসেজ যার মধ্যে 22J. daan pashe 120. baam pashe 120. ; ২৬-০৪-২০১৪ তারিখ সকাল ০৭.২৯ মিনিটে গৃহীত একটি মেসেজ যার মধ্যে 22J. daan pashe toilet 120. baam pashe toilet 120. এবং ২৬-০৪-২০১৪ তারিখ সকাল ১০.০৪ মিনিটে গৃহীত একটি মেসেজ যার মধ্যে Mama any news have লেখা রয়েছে। তিনটি মেসেজই মোবাইল ফোন নং-০১৭৮২৪২১৪৮০ হতে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া তার মেসেজ বক্সে সেন্ড অপশনে ২৬-০৪-২০১৪ তারিখ সকাল ০৯.৩৫ মিনিটে একটি মেসেজ মোবাইল ফোন নং-০১৭৮২৪২১৪৮০ বরাবর প্রেরিত হয়েছে যার মধ্যে Customs red alert this flight লেখা রয়েছে। এই মেসেজগুলো থেকে তখন মোটামুটি শতেক এর উপর আরো শতেক জুড়ে নিশ্চিত যে, এয়ার ক্রাফটে স্বর্ণ আছে, কিন্তু তল্লাশির ফল শূণ্য।

আর কত সহ্য হয়। এবার মেকানিক মোঃ আনিস কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাস্টমস গোয়েন্দার কক্ষে নিয়ে আসা হয়। সাধারণ মাত্রই জানেন, মুখের কথা আর পকেটের টাকা এই দুই জিনিস কি ধরনের input আর impulse এর ফলস্বরূপ উদ্ধার করা হয়। অতএব, বুঝতেই পারছেন হিসাবটা এত সহজ নয়। দর্শনধারীদের থেকেও ধারণা নিতে পারেন। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে মোবাইল মেসেজ এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতারের কথা জানলে বরফ গলল বলে মনে হল এবং তিনি জানালেন যে, খুব শীঘ্রই তার মেয়ের বিয়ে এ অবস্থায় তার গ্রেফতার বা মিডিয়ায় এভাবে উঠে আসাটা তার পারিবারিক সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করবে। এবং সামাজিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। বিবেচনার আশ্বাসে সহযোগিতা করবেন বলে জানালেন। তখন তিনি জানান, "স্যার স্বর্ণগুলো থাকলে টয়লেটেই আছে" এবং তাকে নিয়ে পুনরায় এয়ারক্রাফটে যেয়ে তল্লাশি শুরু করি। কিন্তু স্বর্ণ পাওয়া যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ পরপর ডিজি মহোদয়ের ফোন, "মুস্তাফিজ স্বর্ণ পাইছ?" স্যার অস্থির। এয়ারক্রাফটের ভিতরে প্রচন্ড গরম। কর্মকর্তাগণ হাপিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি আমার সাথে একা কথা বলতে চান। আমি জনাব মিজানুর রহমান এবং সিপাই কবির কে নিয়ে তার সাথে এয়ারক্রাফটে কথা বলি। তিনি জানান সিট নং-২২জে এর নিকটবর্তী টয়লেটে স্বর্ণবারগুলি আছে কিন্তু কোথায় আছে তিনি জানেন না এবং তাকে গ্রেফতার না করার পুনরায় অনুরোধ জানান। সিপাই কবির তাকে বলেন আমাদেরকে গোল্ডগুলো দাও, আমি স্যারকে বলে তোমাকে বিমানের নিকট হস্তান্তর করব এর দায়দায়িত্ব আমার। উল্লেখ্য যে, গত এক বৎসরে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণবারের ক্ষেত্রে জনাব কবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এ সময় জনাব মিজানুর রহমান উত্তেজিতভাবে জনাব আনিসকে বলেন স্বর্ণবারগুলো উদ্ধারের সহযোগিতা কর নইলে তোমাকে অবশ্যই থানায় দেয়া হবে। এ সময় জনাব আনিস বলেন স্যার স্বর্ণবারগুলো আপনারা পেলে আমি খুশি এবং টয়লেটগুলো ভাল করে চেক করুন। তখন সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এবং রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মিজানুর রহমান এয়ারক্রাফটের সিট নং-২২জে সংলগ্ন টয়লেটের কমোডের পিছনের চেম্বার খোলার জন্য বাংলাদেশ বিমানের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লোকদেরকে ডাকার নির্দেশ দেন। এর মধ্যে সিভিল এভিয়েশনের কয়েকজন কর্মকর্তা আমাকে বার বার ফোন করে জানান যে, ঐ দিন রাত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদেশে যাবেন এবং সংশ্লিষ্ট ৪ নং বোর্ডিং ব্রীজ (যে বোর্ডিং ব্রীজে বিজি ০৫২ ফ্লাইটটি সংযুক্ত) দ্রুত ছেড়ে দিতে হবে। আমি তাদেরকে জানাই যে, বিমানটি তল্লাশি চলছে আমার আরও সময় দরকার। কিন্তু তারা আমাকে বার বার তাগিদ দিতে থাকেন। এর মধ্যে ডিজি মহোদয়কেও সিভিল এভিয়েশন হতে কয়েকবার ফোন করা হয়েছে দ্রুত বোর্ডিং ব্রীজ খালি করার জন্য এবং ডিজি মহোদয়ও আমায় তাড়া দিলেন। আমি তাদেরকে জানাই যে, ঠিক আছে আরও কিছুক্ষণ তল্লাশি করব এর মধ্যে না পেলে হ্যাঙ্গারে নিয়ে তল্লাশি চলবে। এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লোকজন চলে আসলে তাদের সঙ্গে নিয়ে জনাব মিজানুর রহমান টয়লেটের কমোডের চেম্বার খুলে তল্লাশি শুরু করেন। প্রথম কমোড খুলে কিছু পাওয়া যায়নি। প্রচন্ড গরমে সবাই ক্লান্ত। আরেকটি কমোড খুলে তল্লাশির সময় মিজান সাহেব চিৎকার করে উঠে বলেন "পাইছি! পাইছি! সোনা পাইছি!"। আমাদের অন্যান্য কর্মকর্তাগণও চিৎকার করে বলেন সোনা পাইছি! এখানে ১২০ পিস স্বর্ণ পাওয়া যায়। আরেকটি টয়লেটের কমোড খুলে আরও ১২০ পিস স্বর্ণবার পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি সকল টয়লেট পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেই এবং সকল টয়লেটের সামনে অবস্থান নেওয়ার জন্য কাস্টমস গোয়েন্দার কর্মকর্তা ও সিপাইদের নির্দেশ দেই। একে একে ০৭ (সাত) টি টয়লেট (টয়লেট নং-1F-1L, 2F-1L, 3F-LC, 3F-1R, 3F-RC, 5A-1L and 5A-1R) কমোডের পিছনের চেম্বার হতে লুক্কায়িত Concealment অবস্থায় কাপড় দ্বারা সেলাই করা সর্বমোট ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। ১৪ টি প্যাকেট কেটে ৯০৪ (নয়শত চার) পিস স্বর্ণবার (প্রতিটি ১০ তোলা করে) পাওয়া যায় যার সর্বমোট ওজন ১০৫.৪০ (একশত পাঁচ দশমিক চার শুণ্য) কেজি। প্রচণ্ড গরমে কোন এক মহানুভব কিছু কোল্ড ড্রিংকস এর ব্যবস্থা করেন। স্বর্ণ উদ্ধারের সাথে সাথে বেভারেজ হাতে উল্লাস আর 'ভিক্টরি' চিহ্নের সেই উত্তাল মূহুর্তগুলো আজীবন মনে রাখার মতো।

টিমওয়ার্ক নামক বিষয়টি যে কি গুরুত্বপূর্ণ আর আনন্দ ভাগ করে নিলে অনেক বাড়ে একাংশেও কমে না এর একটি পরিণত উদাহরণ হয়ে থাকবে এই স্মরণীয় মূহুর্তটি। আরেকটি বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়, স্বর্ণবার লুকায়িত থাকায় এই বারগুলোর সাথে বিমানটিকেও আটক করা হয়, সম্ভবত, এই ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম। পরের কাহিনী তো মিডিয়ার বদৌলতে প্রায় সবারই জানা।

এই স্বর্ণের বারগুলো উদ্ধার হচ্ছিল আর আমি মহাপরিচালক মহোদয়কে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ এর চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, ফোন তখন অপেক্ষায়। অগত্যা, স্যার এর পি.এ কে ফোন দেয়া হল, নাহ এবারও তিনি ফোন ধরলেন না। পরে, বাধ্য হয়ে পি.এ কেই বলা হল স্যারের নিকট মোবাইল নিয়ে যান। স্যারকে আমি জানালাম, প্রচুর স্বর্ণ উদ্ধার হয়েছে, স্যারকে আসতে হবে। মহাপরিচালক জানালেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সন্মানিত চেয়ারম্যান রওনা হয়েছেন কুমিল্লা থেকে। প্রেস কনফারেন্স আর মিডিয়ার লাইভ কাভারেজ এ সেদিনের চ্যানেলগুলোর বেশ ভালই কাটতি ছিল আশা রাখি। সম্মিলিত প্রচেষ্টার একেকটি ক্ষণে অনেক কষ্টই লাঘব হয়ে যায়, কিন্তু সাফল্যের পর টিকে থাকে শুধুই সুন্দর অনুভূতিগুলো। তবে একটু খারাপ তো লাগতেই পারে মেকানিক জনাব আনিস এর জন্য।

লেখক
মুস্তাফিজুর রহমান
উপ-পরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

গোয়েন্দার ডায়েরী থেকে

নাহিদ নওশাদ মুকুল

১৫ই ডিসেম্বর ২০১৩ সাল। বিজয় দিবস ইভ।

মুঠোফোনের তীব্র শব্দে ঘুমটা ভাঙ্গল। গতকাল ছিল শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে টিভিতে অনুষ্ঠান দেখছিলাম। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তান ও আপনজনেদের সাক্ষাতকার প্রচার করা হচ্ছিল। শহীদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তাঁদের চমৎকার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ মনে গভীর দাগ কাটছিল। তাঁদের বর্ণনায় চোখের সামনে ইতিহাস জীবন্ত- হয়ে উঠছিল। কখনও আতঙ্কিত হচ্ছিলাম, কখনও রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, আবার কখনও আশার আলোও দেখছিলাম। চমৎকার লাগছিল। তাই সাতসকালের ফোনটা পেয়ে মনে একরকম বিরক্তি সৃষ্টি হল। ঘুম জড়ানো চোখে মোবাইল ডিসপ্লেতে দৃষ্টি রাখলাম। "DG Customs Intelligence and Investigation" নিমিষে চোখের ঘুম আর কণ্ঠের জড়তা দূর হয়ে গেল। স্যার বললেন, 'তাড়াতাড়ি অফিসে যাও, একটা ফ্যাক্স পাঠাচ্ছি'। চাপা কণ্ঠে বললেন ' বিষয়টা গোপন রাখবে'।
জো হুকুম!

নতুন ভাড়া বাসায় উঠেছি। বাসা অগোছালো। বাসায় নাস্তার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। ছুটলাম অফিসে। ফ্যাক্স এল। লেখা অস্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আবার স্যারকে ফোন। স্যার মেসেজটা স্ক্যান করে ই- মেইল করে দিলেন। এবার স্পষ্ট পড়তে পারলাম। উত্তেজনা অনুভব করলাম।

গোপন কিছু অংশ বাদ দিয়ে মেসেজটি মোটামুটি এই রকম-এক লোক ঢাকা থেকে করাচি গেছে অক্টোবরের মাঝামাঝি। সেখানে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে এবং সেখানে সে লাহোর-করাচির মধ্যে কয়েকবার যাতায়াত করেছে। এখন সে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় নকল মুদ্রা [Fake Indian Currency Notes (FICN)] নিয়ে লাহোর থেকে ওমান, ওমান থেকে দুবাই হয়ে বাংলাদেশের শাহ্ আমানত বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম আসবে। তার নাম মামুন (ছদ্মনাম ব্যবহার করা হল)। ফ্লাইট নম্বর, সময় ও পণ্য সবকিছুরই বর্ণনা ছিল। এরকম গোয়েন্দা তথ্য আমরা অনেক পাই, তবে এবারেরটা বেশ সুনির্দিষ্ট। আমরা কাস্টমস গোয়েন্দার অফিসে ওয়ার্কিং প্ল্যান করতে বসলাম। অফিসে লোকবল এমনিতেই কম। তার উপর দীর্ঘ দিন হরতাল অবরোধের পর মিঃ তারানকো, মহান বিজয় দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে কয়েক দিনের বিরতিতে অনেকেই ছুটি নিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করতে গেছেন। কেউ কেউ দীর্ঘ ২ মাস পর বাড়ি গেছেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন স্যার ঢাকা গেছেন, মহাপরিচালক স্যার ভিয়েতনামে সেমিনারে যাবেন- তাঁর ঢাকা অফিসের দায়িত্ব নিতে । সিনিয়র সহকারী পরিচালক সফিউর রহমান স্যারও ঢাকায় ওর্য়াল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের একটা আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামে। অফিসে আছি আমি, দুজন এআরও মমিন আর মোশাররফ, ৩ জন সদ্যযোগদানকৃত আনকোরা সিপাই আর অফিস স্টাফ ২/৪ জন। এর মধ্যে মহাপরিচালক স্যার আবার ই-মেইল করে বললেন, বিষয়টা 'সঠিক' সময়ের আগ পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে। আসামী মামুনকে পাওয়া পেলে ও মুদ্রা ধরা পড়লে আটক করতে হবে। ইনভেনটরি করতে হবে, পতেঙ্গা থানায় মামলা করে আসামী হস্তান্তর করতে হবে। আটক পণ্য কাস্টম হাউসের কাস্টোডিয়ান শাখায় জমা করতে হবে, আটক মামলা করতে হবে। ফ্লাইট আসবার জাস্ট ১৫ মিনিট আগে অর্থাৎ ০৪.৪৫- এ ইমিগ্রেশনকে জানাতে হবে- আগে, পরে নয়। চিঠি ইমিগ্রেশনকে দিয়ে রিসিভ করিয়ে নিতে হবে। যাত্রীর তালিকা পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করতে হবে। 'মামুন' যাতে কিছুতেই বিমান বন্দর লাউঞ্জ ত্যাগ করতে না পারে। সতর্ক থাকতে হবে-

জো হুকুম!

আবার প্ল্যানিং শুরু করলাম। হালকা ব্রিফিং দিলাম। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলাম। কাকে কোথায় দাঁড় করাব ঠিক করালাম। সবার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। জনবল কম থাকার সুবিধাও আছে। নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হয় না।

এ্যাকশান

ওয়াকিটকিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। ঠিক বিকাল ০৪.৪৫ মিনিটে শাহ্ আমানত বিমান বন্দরের দোতলায় ইমিগ্রেশন এর এ্যাডিশনাল এসপি মিজান ভাই কে জানালাম। পত্র দিলাম। তিনি আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এলেন। আমার চিঠি কপি করে তিনি নিজে হাতে প্রত্যেক ইমিগ্রেশন অফিসারের নিকট পৌছে দিলেন। আমি তিনজন সহকর্মী সহ হাজির হলাম বিমানের দরজার সামনে বোর্ডিং ব্রীজে। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে যাত্রী তালিকা নিলাম। দু'বার করে প্রত্যেকটা নাম পড়লাম। দেড়শো যাত্রী। মামুনের নাম নেই। হতাশ হতে শুরু করলাম। সব যাত্রী একে একে লাগেজসহ নেমে গেল। আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখলাম। সন্দেহজনক কাউকে পাই কিনা। ঢুকলাম বিমানে। বিমানের লাগেজ রাখবার জায়গা, যাত্রীদের পা রাখার স্থান, সিটের নীচে, পত্রিকা ইত্যাদি রাখার স্থান, খাবার রাখার কেবিনেট, টয়লেট (ব্যবহৃত টিস্যু পেপার রাখার স্থানসহ) প্রতিটা ইঞ্চি চেক করলাম। কিছুই নেই। হতাশা বাড়ছে।

ইন্টিলিজেন্স ওয়ার্ক (মামুন থেকে মাস্তাফিজ)

দেড়শো যাত্রীর নামের তালিকা নিয়ে বসলাম। কারো নামের আগে-পরে, মাঝে-ভিতরে, ডানে-বামে 'মামুন' আছে কী না খুজলাম। তিনটা কাছাকাছি নাম পেলাম। মমিনুল হক, মুজিবর রহমান, মাস্তাফিজুর রহমান (সবই ছদ্ম নাম ব্যবহার করছি)। এদের উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বললাম সবাইকে। কেউ যাতে অন্য কোন পথে লস্ট এন্ড ফাউন্ড বা অন্য কোথাও কোন লাগেজ রাখতে না পারে। লাগেজ নিয়ে অন্য পথে যেতে না পারে এজন্য সিপাইদের এটেনশন করে দাড় করিয়ে দিলাম। তিন জন যাত্রীকে নজরে রাখলাম। যাত্রী মমিন, মুজিবর-এর বডি, লাগেজ তল্লাশি করলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। পাসপোর্ট, ভিসা পরীক্ষা করলাম। সন্দেহজনক কিছুটা পেলাম না। হতাশা আরও বাড়লো। এর মধ্যে যাত্রী মাস্তাফিজুর রহমান (ছদ্ম নাম) বেশ উশখুশ করছে। ভাল। লক্ষণ শুভ। যাত্রীটি লাগেজ নিয়ে সুকৌশলে স্ক্যানিং এড়িয়ে গেল। আমরা লক্ষ্য করতে থাকি। গ্রীন চ্যানেল অতিক্রম করে গেল। লাউঞ্জ পার হবে, এ পর্যায়ে আমরা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলি। বিমান বন্দর কাস্টমস এর সহায়তায় লাগেজ স্ক্যানিং করি, দেহ তল্লাশি করি। নিশ্চিত হয়ে যাই আমরা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেয়ে গেছি। বিমান বন্দর কাস্টমসের রুমে সকল সংস্থাকে ডাকলাম। লাগেজ ভাঙ্গা হল। লাগেজের ভিতর, কভারের ভিতর স্তরে স্তরে সাজানো ভারতীয় রূপি। আমাদের আনন্দ দেখে কে।

লাইট ক্যামেরা এ্যাকশান

আইপ্যাডে ছবি তুলে মহাপরিচালক মইনুল খান স্যারকে পাঠালাম। স্যার ধন্যবাদ জানালেন, ভূয়সী প্রশংসা করলেন, বললেন, " Great Achievement "। সব চ্যানেল এর লোকজন এল। প্রিন্ট মিডিয়া এল। সাক্ষাতকার নিল। মোট টাকা গোনা হল ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৭ হাজার রূপি, ১ কার্টন সিগারেট আর ১ কার্টন উত্তেজক ঔষধ। এখন এল আসল কাজ। মহাপরিচালক স্যার বললেন, সকল টাকার নম্বর লিপিবদ্ধ করে ইনভেনটরি লিস্ট করে তারপর কাস্টম হাউসের কাস্টোডিয়ান শাখায় জমা দিতে হবে। কী বলেন স্যার! হিসাব করে দেখালাম। ১০০০ টাকার নোট ১৩২ বান্ডিল। ৫০০ টাকার নোট ১২৭ বান্ডিল। প্রতিটা নোটের নম্বর লিখতে যদি ৪০ সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে প্রতিটি বান্ডিল গুণতে সময় লাগছে ৬৬ মিনিট। মোট বান্ডিল ২৫৯ টি। অর্থাৎ মোট ১৭,০৯৪ মিনিট বা ২৮৫ ঘন্টা । যদি ১০ জন একসঙ্গে কাজ করে তাহলে সময় লাগে সাড়ে ২৮ ঘন্টা। এটা আবার রোবটিক টাইমিং। রোবট দিয়ে কাজ করালে এই সময় লাগবে। মানুষতো আর একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে সাড়ে ২৮ ঘন্টা এভাবে কাজ করতে পারবে না। নামাজ, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি রয়েছে। স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন 'করতেই হবে'।

জো হুকুম!

শুরু হল মহাকর্মযজ্ঞ। সাহায্যের হাত বাড়াল কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। তরুণ সহকারী কমিশনার মশিউর এল তার বিশাল বাহিনী নিয়ে।

১৬ই ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস

এরই মধ্যে রাত ১২.০০টা বেজে গেল। বিজয় দিবস শুরু হল। দূর থেকে ৩১ বার তোপধ্বনি শুনলাম। আজ আবার আমার জন্মদিন। মোবাইলে সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে। বাসা থেকে সহধর্মিনী লোপা ফোন করছে, 'জন্মদিনে তুমি বাসায় নেই'। বাবা-মা ফোন করছেন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীগণ সবাই ফোন করছেন। অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আমার সামনে তখন শুধুই টাকার স্তুপ, আর ২০ জন মানুষ সবাই। সবাই টাকার নম্বর লিখছেন। এটা লেখা জরুরি। না হলে মামলার আলামত সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে না। কোর্টে চ্যালেঞ্জ হলে আমরা মামলায় জিততে পারব না।

মহান বিজয় দিবসের ছুটির দিনে মাতৃভূমির জন্য সবাই নিরলস কাজ করে চলেছি।

আমি, আমার সহকর্মীরা- আমরাও কি বিজয়ী সৈনিক না? বাংলাদেশ কাস্টমসের জন্য গর্ব বোধ হল। ভাল লাগল। অন্য রকম একটা জন্মদিন পালিত হল।

সারারাত বিরতিহীন ভাবে টাকার নম্বর লেখা চলছে। কমিশনার মাসুদ সাদিক স্যারের নির্দেশে কাস্টম হাউসের সহকর্মীরা যার পর নাই সহযোগিতা করছেন। এভাবেই সকাল হয়ে গেল। ফজরের আযানের পর সবাইকে বললাম কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে বিশ্রাম নিতে। ঘন্টা খানেক পর আবার কাজ শুরু হল। নিরবচ্ছিন্ন কাজ শেষ হল রাত ১১.০০ টায়। পুলিশ নিয়ে অন্ধকার নির্জন পথে গভীর রাতে রওনা হলাম পতেঙ্গা থানায়। আসামীকে থানায় দিয়ে মালামাল নিয়ে ছুটলাম কাস্টম হাউসের কাস্টোডিয়ান শাখায়। কাস্টোডিয়ান শাখা প্রতিটা বান্ডিল আলাদা আলাদা ভাবে বুঝিয়ে নিল। ধৈর্য্য আছে বটে রাজস্ব কর্মকর্তা কাস্টোডিয়ান ন্যু চ প্রু' র। ঘড়ির তারিখ অনেক আগেই পরিবর্তন হয়ে গেছে। ক্লান্ত শরীর। কাজ শেষ হল। কিন্তু কয়েকটা অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকেই গেল-

১। নোটগুলো কী আসল না নকল? বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পরীক্ষা করে জানা যাবে? মুদ্রাগুলো নকল হলে'তো চোরাচালানীদের ডবল লাভ-এই মুদ্রা দিয়ে বাংলাদেশে অবৈধ পণ্য প্রবেশ করানো আবার ভারতের অর্থনীতিতে নকল মুদ্রার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করা।

২। ভারতীয় অব্যবহৃত মুদ্রা পাকিস্তান হতে এল কিভাবে?

৩। মুদ্রাগুলো ২০১০-২০১১, সালে ছাপানো। এতদিন মুদ্রাগুলো কোথায় ছিল? এতদিন অব্যবহৃত থাকল কিভাবে?

৪। এ মুদ্রাগুলো কারা কী উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে? এ মুদ্রায় ভারত থেকে বাংলাদেশে কী আসত? অস্ত্র? মদ? ফেনসিডিল? নাকি আরও ভয়ংকর কোন কিছু?

৫। এই চক্রটি কত বড়? কারা জড়িত এর সাথে? তারা কতটা প্রভাবশালী?

৬। এই চক্রটির ভবিষ্যত কার্যক্রমই বা কী? আবার কখন আসছে পরের চালান?
সবাইকে জেগে থাকতে হবে।

বাংলাদেশ কাস্টমস, জেগে থাকো!

লেখক
নাহিদ নওশাদ মুকুল
উপ-পরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়

সম্পাদকের কথা-

এই মামলাটিকে পরবর্তীতে Operation Westerlies 2 (A Joint Enforcement Operation Against Illicit Trafficking in Methamphetamine by Air Passengers) এর উদ্যোগে Japan Customs এবং The WCO Secretariat তাঁদের Final Report -এ বিশ্বের ৮২টি Customs Administration ও ৯টি গোয়েন্দা সংস্থার সেরা ৬টি Case এর অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

Operation WESTERLIES 2

A joint enforcement operation against illicit trafficking in methamphetamine by air passengers

Final Report

(jointly prepared by Japan Customs and the WCO Secretariat)

This document contains law enforcement sensitive materials

Cases of Interest

(1) The first reported case upon the start of the Operation on 6 December 2013 – by Hong Kong Customs

A 1.5 kg cocaine case was made by Hong Kong Customs on 6 December 2013. One Spanish male passenger was arrested. It was the first reported case once the Operation was started on 6 December 2013.

* Concealment : in the trolley frames and wheels of check-in suitcase
* Offender : one Spanish male aged 58 were arrested
* Route : Sao Paulo, Brazil >UAE> Hong Kong

(2) The largest case of narcotics in terms of quantity during the Operation – by Burkina Faso Customs

A seizure of 848 kg of cannabis-herbal was made by Burkina Faso Customs on 30 November 2013 at the inland area of Bobo-Dioulasso..

* Concealment : inside 22 bags carried by cyclists
* Route : Ghana>Burkina Faso>Mali
* Offenders: two males of Burkina Faso nationals were arrested.

(3) The largest case of methamphetamine/amphetamine during the Operation – by Senegal Customs

Senegal Customs intercepted a total of 21 kg of methamphetamine and 20.1 kg of Amphetamine at land border on 10 December 2013.

* Concealment : the drug-loaded bags were carefully concealed in 3 buckets and 3 boxes with cover-load of cosmetics / shea butter.

*Route : Mali>Senegal

(4) The largest case of Cocaine during the Operation – by French Customs

French Customs intercepted a total of 30 kg cocaine at Roissy Charles De Gaulle Airport on 7 December 2013. It is the largest cocaine seizure in the operational period.

* Concealment : in baggage suitcase
* Route : Saint Martin>France
* The case is related to airport conspiracy and now under investigation.

(5) A significant CITES case was effected during the Operation – by Mali Customs

A case of 89.1 kg of pangolin scale was made by Mali Customs on 12 December 2013.

* Concealment : in baggage suitcase
* Offenders :one Mali male was arrested at Bamako Airport, Mali
* Route : Cote D'Ivoire> Mali> Cameroon

(6) The currency case effected during the Operation – by Bangladesh Customs

A case of undeclared currency was made by Bangladesh Customs on 15 December 2013, with seizure of 19,500,000 Indian Rupee (about €232,000or US$ 317,000)

* Concealment : in baggage suitcase
* Offenders : one Bangladeshi male was detained at Shah Amanat Intl. Airport
* Route : Mascot, Oman > Bangladesh

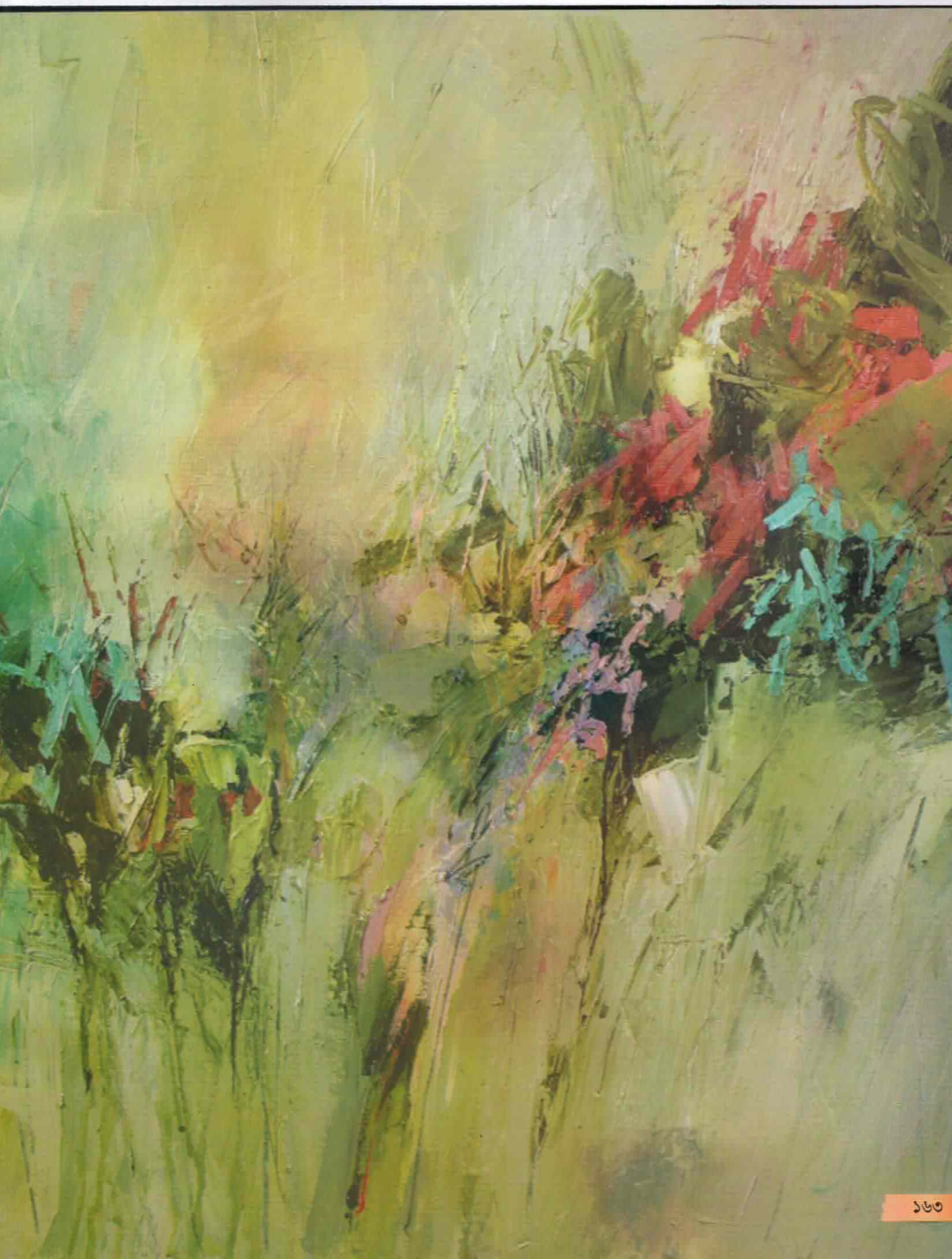

١٦٨

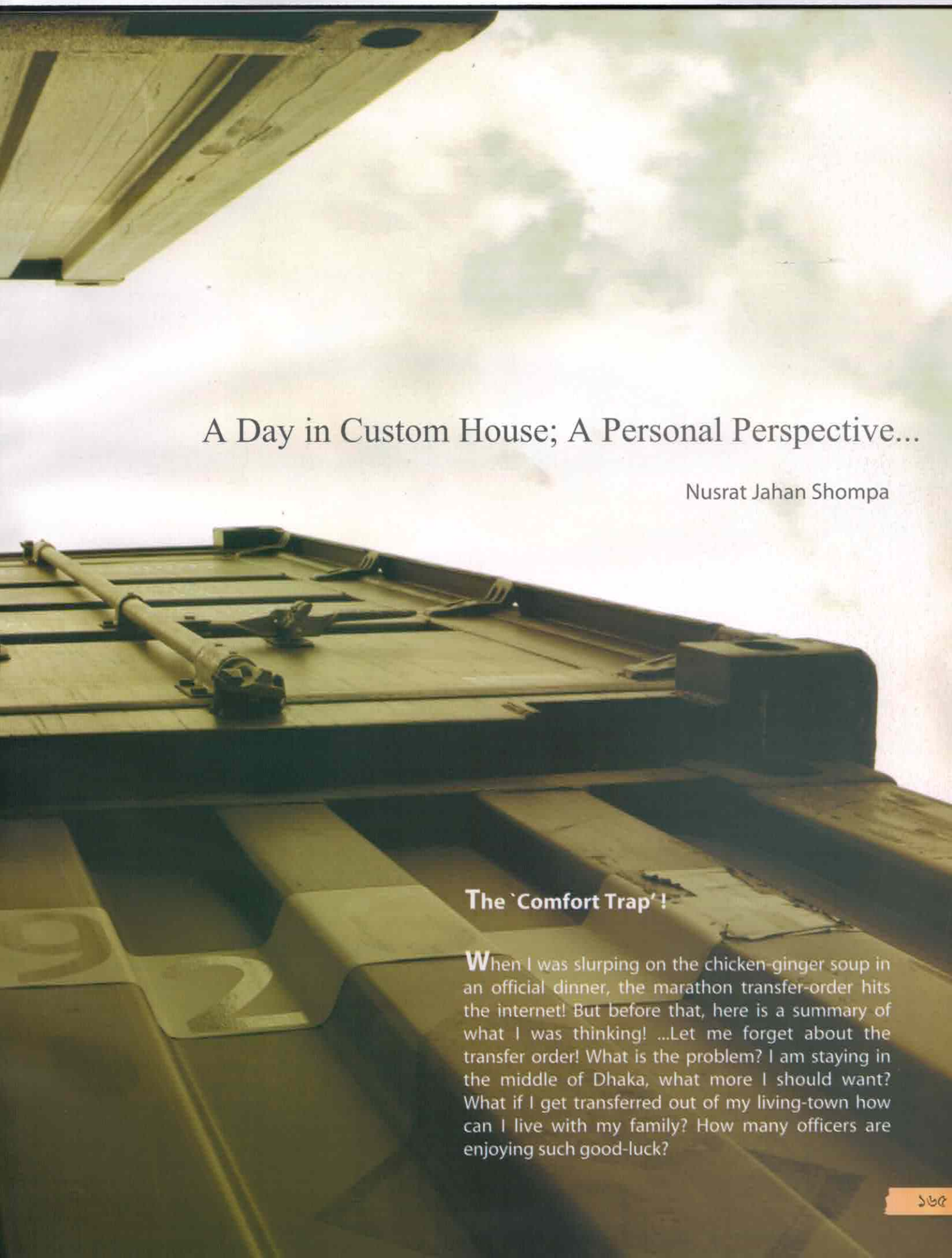

A Day in Custom House; A Personal Perspective...

Nusrat Jahan Shompa

The `Comfort Trap' !

When I was slurping on the chicken-ginger soup in an official dinner, the marathon transfer-order hits the internet! But before that, here is a summary of what I was thinking! ...Let me forget about the transfer order! What is the problem? I am staying in the middle of Dhaka, what more I should want? What if I get transferred out of my living-town how can I live with my family? How many officers are enjoying such good-luck?

Many people are trying desperately to get transferred anywhere in Dhaka so that they get a chance to live with their family residing here. Now I am enjoying this rare luck without any effort! Why do I need to disturb this comfort of living with my family! I distance myself and take a zoom-out view of my professional setting. So I felt happy to forget about the much-awaited transfer order. Suddenly, this 'so-called- good-posting' compounded with the good-luck of staying in Dhaka! How and when did I 'lobby' to secure such posting?! I ponder and wonder with an anxious mind. Anxiety! About what.....? Let's peek below the surface!

'Words of wisdom'

While in training DG sir told us that the files disposed by you might be called long after you have left custom house and resting peacefully assuming blithely that everything is alright and ok. Suddenly you might jerk back into an anxious reality of allegation that you have connived intentionally in tax-evasion with the stakeholders or helped in not-collecting-proper-amount-of- taxes! Your blithe optimism is bound to evaporate in no-time in the midst of nowhere!

Ok..... I am going..... not to hurry! I have heard loads of stories about dangers lurking under files, within container, within the atmosphere, within the very air people breathe here! But fate cannot be obliterated! Moreover, people will find me 'mad' if I voice my desire to keep myself safe by not going there. But working among the containers..... the atmosphere is not smart and comfortable like my earlier office. So a lot of dilly-dallying happens... what so hurry...I am not evaporating in the thin air... it is a custom house... the later, the better. I try to rationalize my delay.

Unseen hydra!

Actually I was unwilling to leave out my familiar office and the 'comfort trap' I was inhabiting. So after one month-of-dilly-dallying I joined with an anxious heart and with a psychological-guard.

Sitting in one of my colleagues' room I looked out of the window to get a glance of the ambience I am so apprehensive about. Looking out of the window at the big and empty containers makes one feel inconspicuous and small. Plus looking at the red-blue-yellow array of containers out there doubles my fear.... there must be lots of unseen dangers loaded there waiting to be erupted or catch you un-prepared. Hustling of goods and *'mal-potro'* with all sorts of people moving nonchalantly here and there give it a very-down-to-earth-look (literally!) but there is no reason to take it in the face value, crores of big money is transacted here every day! Is it the containers that pose the threat or the big-money involved? The answer is predictable! Do I have to come here every day.....do I have to deal with this business-minded people? Can I make them understand my point-of-view? Oh God! I have even heard tales of the behaviors of the officers and some *'catchy'* stories and *'kahini'* spread like winter-fire? How can I behave coolly if I need to stand my own? You need to behave very well otherwise all sorts of *'bad rumors'* will spread. Officer's discretion is hugely required.

"Look before you leap"...

Now, here comes a file! Is it innocent or is it risky or dangerous or full-of-tax-evasions? Is there anything that might endanger me? How many documents I need to verify? What are the portions that I need to check and scrutinize? Will I be able to identify the loop-holes? My analyzing mind races with apprehension!!! *("Madam, Bismillah bole file down koren! Amar ei file-e kichuinai"!)* He assures(?!!!) me! My apprehension escalates even more...! "I will but lets the value gets approved first....then I will down the file". *("Na..na..madam..apnake amra bipode felbona!)* Mr. Client's re-assuring gesture surfaces again! I also persuade back……. "look, since I am new here, I don't know lot of things, so let me send the file to my superiors so that I can learn what to check"! So I said 'Bismillah' and put the file up in the official ladder with an expectation that it will come down and I will be able to learn a lot of things like what needs to be checked and how! But voila!!!!There is no sight of the file coming down to me completing the circle in official ladder! Where did it disappear? The file is already disposed and perhaps will never come back! The files need to be disposed of very quickly and that is the very reason that the file does not complete the full circle and does not come back to me for 'my learning' purpose! Something *'done in good faith'* should be banished from my dictionary!! Only an unseen and un-detected danger will make your file surface again; and of course against your convenience!!

After three-months-stint I have crawled out of the 'comfort trap'. But what about the earlier apprehensive mood? Did it evaporated as well? Only time can tell. The line between safety and danger is very thin! A strong intuition and h....u...g....e amount of good luck needs to be on your side because the hydra might raise its head and to catch you unaware!!

Writer
Nusrat Jahan Shompa
Assistant Commissioner (28th Batch)
Custom House ICD

For opinions ***Email: jhn.nusrat@gmail.com***
(Special Note : Everything written in the essay is author's personal opinion and done in good humour. The author is apologizing in advance if anybody gets hurt by her opinion.)

١٦٦

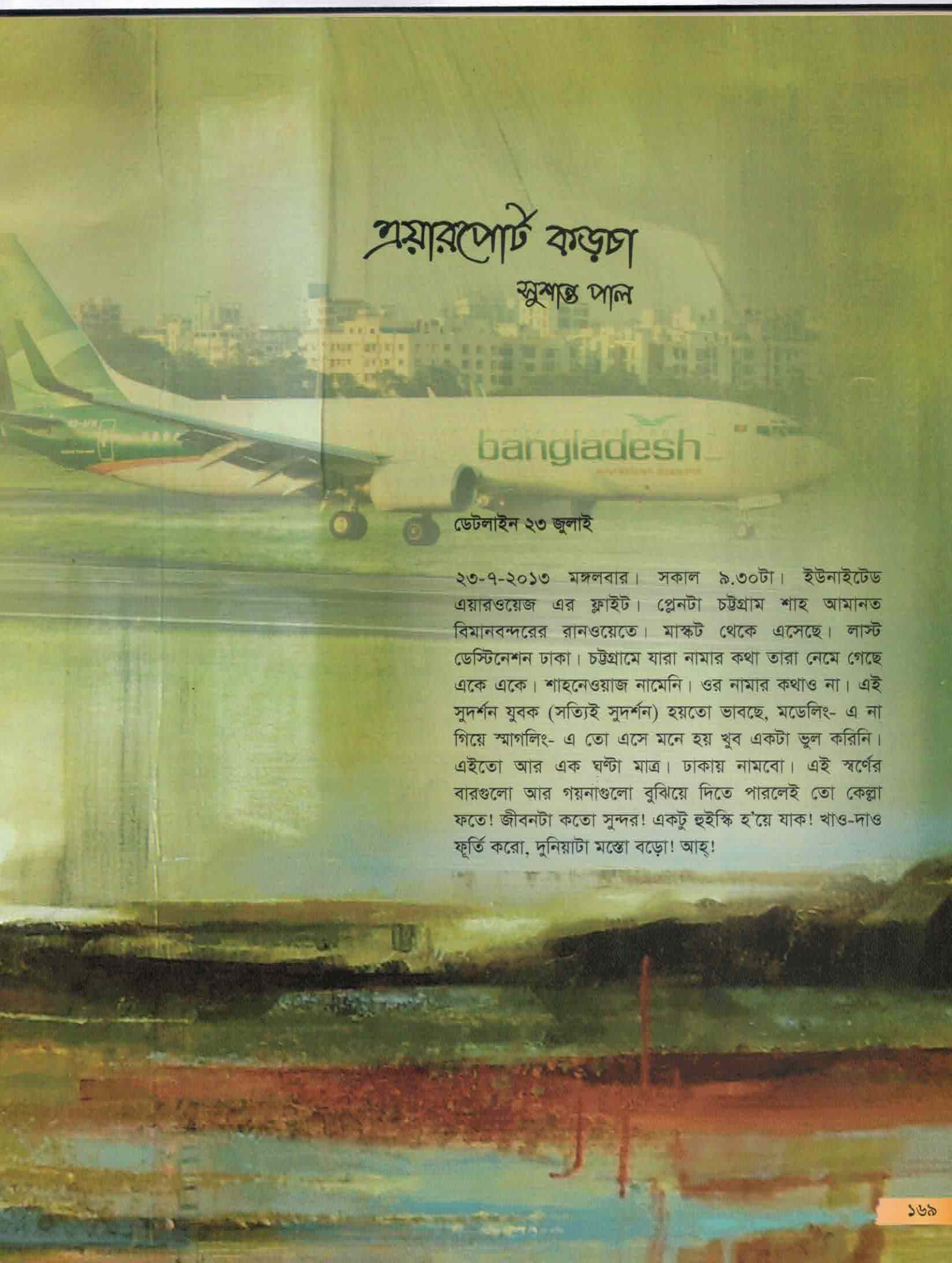

এয়ারপোর্ট কড়চা

সুশান্ত পাল

ডেটলাইন ২৩ জুলাই

২৩-৭-২০১৩ মঙ্গলবার। সকাল ৯.৩০টা। ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ এর ফ্লাইট। প্লেনটা চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের রানওয়েতে। মাস্কট থেকে এসেছে। লাস্ট ডেস্টিনেশন ঢাকা। চট্টগ্রামে যারা নামার কথা তারা নেমে গেছে একে একে। শাহনেওয়াজ নামেনি। ওর নামার কথাও না। এই সুদর্শন যুবক (সত্যিই সুদর্শন) হয়তো ভাবছে, মডেলিং- এ না গিয়ে স্মাগলিং- এ তো এসে মনে হয় খুব একটা ভুল করিনি। এইতো আর এক ঘণ্টা মাত্র। ঢাকায় নামবো। এই স্বর্ণের বারগুলো আর গয়নাগুলো বুঝিয়ে দিতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! জীবনটা কতো সুন্দর! একটু হুইস্কি হ'য়ে যাক! খাও-দাও ফূর্তি করো, দুনিয়াটা মস্তো বড়ো! আহ্!

Smugglers propose, customs officers dispose. গোপন সংবাদ পেলাম। গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে গেলো! আমি আর আমার ২ জন কর্মকর্তা দৌড়ালাম। এয়ারপোর্ট অফিস পেরিয়ে রানওয়ে। ওইতো ইউনাইটেড! আবার দৌড় (আক্ষরিক অর্থেই দৌড়)! গেলাম প্লেনে উঠলাম। তাও দৌড়ে। খুব কুল কুল টাইপের লুক নিয়ে নায়ক সাহেব তাকালেন আমাদের দিকে। মনে হলো একটু অসংলগ্ন। কোনো বাঙালিই মদ্যপানের সময় বিরক্ত করা পছন্দ করে না। তবুও কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, সাথে অবৈধ কিছু আছে কিনা। হ্যাঁ বলবে, এটা আশা করিনি, সে আমাদের নিরাশ করেওনি। তাকে চ্যালেঞ্জ করলাম, ব্যাগ সার্চ করলাম। আমি পাইলাম, আমি উহাকে পাইলাম ! কালো রঙের প্যাকেটে লুকানো অনেক ভারি কিছু। অনেকটা জাপটে ধরে ব্যাটাকে প্লেন থেকে নামালাম। সে নির্বিকারভাবে আমাদের সাথে হাঁটছে। কোনো ভয়ের ছাপই নেই ওর চোখে-মুখে। হয়তো বা ভয়ে ভয় পেতেই ভুলে গেছে। আমার অফিসরুমে এনে আটকে রাখলাম। আমার অনুমতি নিয়ে আমার একজন অফিসার শাহনেওয়াজকে একটু আড়ালে নিয়ে দেহতল্লাশি করলো। নাহ্, তেমন কিছু নেই। ততক্ষণে লোক জমে গেছে আশেপাশে। সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা। স-বব্। প্রেস মিডিয়া এসে গেছে। ক্লিক্! ক্লিক্!! কালো প্যাকেটটা খুললাম। খয়েরি রঙের বড়োসড়ো একটা খাম। সেটাও খুললাম। লম্বাটে ৪টা কাপড়ের ফিতা আকৃতির ব্যাগ। ৩টা খয়েরি, ১টা কালো। ব্যাগগুলো থেকে বের হলো খয়েরি রঙের প্লাস্টিকের টেপে শক্ত করে মোড়ানো পাশাপাশি লম্বাভাবে সাজিয়ে রাখা সারি সারি স্বর্ণের বার। গুনলাম। মোট ১৪৬টা। ১০ ভরি করে। ১৪৬০ ভরি। ওজন নিলাম। প্রায় ১৭.০২ কেজি। ক্লিক্ ! ক্লিক্!! চলছেই। ওর সাথের ব্যাগটা আরো তল্লাশি করলাম। আরেকটা প্যাকেট! খুললাম। কয়েকটি লকেট, চুড়ি, কানের দুল, আংটি। স্বর্ণের, দামি পাথরখচিত। ওজন নিলাম। ৪০০ গ্রাম। এরপর শুরু হলো প্রেসব্রিফিং। লাইট, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন। কতো প্রশ্ন করে রে!! (ইস্! আগে জানালে একটু সাজুগুজু করে আসতাম। বেকুব বেকুব টাইপ চেহারা এসেছে পেপারে, টিভিতে।) পতেঙ্গা থানাকে খবর দিলাম। পুলিশ এলো, এজাহার হলো, FIR হলো, আরো কত্তো কী সব। এরপর আসামিকে পুলিশ প্রহরায় দিলাম। ওরা হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে ওকে গাড়িতে তুললো। আটক করা প্রায় ১৭.৫ কেজি স্বর্ণ অন্য একটা পুলিশের গাড়িতে। সেই গাড়িতে আমি, আমার অফিসাররা। প্রায় ৮ কোটি টাকা সমমূল্যের মালামাল নিয়ে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কাস্টোডিয়ান শাখায় জমা দিতে যাচ্ছি। সামনে, পিছনে পুলিশের গাড়ি। এই পুরো দলের নেতা আমি।

সে কী ভাব আমার! শাহনেওয়াজকে পতেঙ্গা থাকায় সোপর্দ করে আবার চললাম কাস্টম হাউসের উদ্দেশে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় জ্যাম। ইফতারের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। এভাবে এক সময় কাস্টম হাউসে পৌঁছলাম। ইফতারের সময় হয়ে গেছে। ওখানেই ইফতার সারলাম। স্বর্ণগুলো জমা দিলাম। স্তব্ধ বেশকিছু সময়ের পর আযান শুনলে খুব ভালো লাগে। আহ্, কী শান্তি!

খুব সংক্ষেপে সেদিনের পুরো ঘটনাটা লিখলাম। অনেক কিছু বাদ গেলো। ওই স্মাগলারের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। গল্প করেছি, এটাও বলা যায়। ধরা-পড়ে-যাওয়া অপরাধীর সাইকোলজি অদ্ভুত! তাকে ঘিরে থাকা লোকজনের সাইকোলজি আরো অদ্ভুত!

ডেটলাইন ৪ আগস্ট

সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সহজ নয়। আই কনট্যাক্ট ঠিক রাখার ব্যাপারটা আমার কাছে কখনোই স্বস্তিকর বলে মনে হয়নি। (হলে অনেক কিছুই অন্যরকম হতে পারতো। সে কথা আজ থাক) চোখ দেখবো, না লোকটাকে দেখবো, নাকি কী দেখা উচিত সেটা ভাববো, এটাই একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ! অথচ কাজটাই করতে হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে। স্মাগলিংয়ের গোপন সংবাদ পৌঁছেছে আমাদের কাছে। শুধু এই চেকিং-ই না, আরো কিছু আছে। চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে প্রতিদিন ফ্লাইট নামে। মাঝে মাঝে হুট করেই আমার টিম নিয়ে চলে যাই প্লেনের ভেতরে ইচ্ছেমতো তন্ন তন্ন করি। কাস্টমসে এই খোঁজার পোশাকি নাম রামিজিং। পুলিশ একে বলে রেইড দেয়া। কাজটা খুব মজার। একেবারে নিরীহ লোকজনও কেমন যেনো ভয় ভয় চেহারায় তাকিয়ে থাকে ওই সময়। এই ভয় বোধ হয় অপরাধী না হওয়ার ভয়। সব খোঁজা হয়। পুরো প্লেনের যেখানে খুশি খোঁজো। এ-ই হচ্ছিলো। এভাবেই চলছিলো। তেমন কিছুই পাচ্ছিলাম না। যা পাচ্ছিলাম তা হলো, শুধু বসদের তাড়া; মাঝে মাঝে ঝাড়ি, বি ভেরি এ্যালার্ট, এয়ারপোর্ট কাস্টমস। কোনো কাজ একবার ঠিকভাবে করার বিপদ আছে। পরের বারও বস পারফেকশন আশা করেন। এই এক্সপেক্টেশনই রিলাইয়েবিলিটি।

০৪-০৮-২০১৩। রোববার। খবর এলো, যা খুঁজছি তা আসবে। ছুটলাম এয়ারপোর্ট। ৮:০০ টা। এয়ারপোর্ট কাস্টমস হলে আমি আর আমার টিম। প্রফেশনাল ব্যাপারে আমি বরাবরই স্কেপটিক। আজকে আরো বেশি। যা কিছু বিশ্বাস করলে কারো কোনো ক্ষতি হয় না, আমি শুধু সেসব ব্যাপারে অবিশ্বাস করার কষ্টটা ছাড় দিই। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছি; হাঁটছি দ্রুত লয়ে। এদিক-ওদিক। তাকাচ্ছি, দেখছি। আমার অফিসাররা আরো বেশি তৎপর। ওরা সবাই ধর্-তক্তা-মার্-পেরেক টাইপের। তবে, বুঝে শুনে। এইরকম না হলে এয়ারপোর্টে কাজ করা সহজ নয়। ফ্লাইট দুবাই ফ্লাইট। নামার কথা ১০:০৫ টায়। দুবাই থেকে। আমার এআরও (এ্যাসিসট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার) প্যাসেঞ্জার মেনিফেস্ট নিয়ে এসেছে আমি গোপন তথ্যের সাথে যাত্রীদের নাম মিলাচ্ছি। ৪ জন ইকবালকে পেলাম। মহাকবিকে ৪ জনের কারোই বাবা মা ছাড়েননি। ওদের ছেলেদের আমরাও ছাড়িনি। একে একে ইকবাল মহোদয়দের আমার রুমে নিয়ে গেলাম। সবাইকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম সাথে লুকানো কিছু আছে কিনা। তাদের কেউই আমাদের নিরাশ করেনি। মানে, অস্বীকার করেছে। এদের মধ্যে একজনের আচরণ মনে হলো কেমন যেনো। একজন এআরও আমার অনুমতি নিয়ে ওর দেহ তল্লাশি করলো। এই দৃশ্যটা মোটেই সুখকর নয়। পেশার খাতিরে অন্যের অপমান দেখার অস্বস্তি পর্যন্ত হজম করতে হয়। দৃশ্যপট বদলালো দ্রুতই। জিন্সের প্যান্টের বেল্টের ভেতর অন্তর্বাসের ঠিক নীচেই খয়েরি রঙের স্কচ টেপে মোড়ানো কোমরে খুব সাবধানে বাঁধা কিছু গোল্ডবার। লম্বাটে রকমের সাজানো। হায়! এই ইকবাল মহাকবি হয়নি, মহাবদমাশ হয়েছে।

ওকে রুমে আটকে রেখে আবার ছুটলাম কাস্টমস হলের দিকে। ফ্লাই দুবাইয়ের প্যাসেঞ্জারদের কাস্টমস চেকিং চলছে। যেখানটায় ব্যাগেজ স্ক্যানিং হয়, সেখানটার আশে পাশে গেলাম। আমার অফিসাররা খুব সতর্ক। দেখলাম এক লোক কেমন যেনো তাড়া নিয়ে কাস্টমস এরিয়া ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। একজন এআরও কে ইশারায় দেখিয়ে দিলাম। সাথে কী আছে

জিজ্ঞেস করায় লোকটা দুর্ব্যবহার করলো। আমার এআরও আরো এক কাঠি বেশি সরেস। ঠাণ্ডা মাথায় ওকে চ্যালেঞ্জ করলে
কিছু কিছু মানুষের সিক্সথ্ সেন্স খুব প্রখর হয় অথবা পরিস্থিতি বুঝে প্রখরভাবে কাজ করে। আমার এই এআরও কিছু
এরকম। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই কী মনে করে যেনো ওর কোমরে হাত দিলো। এরপর ওকে জাপটে ধরে আমার রু
নিয়ে গেলো। সাথে গেলাম। ঠিক আগের মতোই ওর শরীরে লুকানো গোল্ডবারগুলো বের হলো। ও রাশেদুল। রাশেদ
কাঁদতে লাগলো। অস্বস্তিকর দৃশ্য।

এরপর ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো অনেকটাই গত ২৩-০৭-২০১৩ তারিখে প্রায় ১৭.৫ কেজি স্বর্ণ উদ্ধারের ঘটনার আংশি
পুনরাবৃত্তি। তাই লেখার এই জায়গাটায় অভিনবত্ব কম। ভিন্নতা ছিলো ঘটনার শুরুটাতে স্বর্ণের পরিমানে। আরো বি
জায়গায়।

ততক্ষণে লোক জমে গেছে আশেপাশে। সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা। স-বব্। প্রেস মিডিয়া এসে গেছে। ক্লিক ! ক্লিক
আগের মতোই। খয়েরি রঙের প্লাস্টিকের টেপে শক্ত করে মোড়ানো পাশাপাশি লম্বাভাবে সাজিয়ে রাখা সারি সারি স্বর্ণে
বারগুলো টেপ কেটে বের করলাম। টেবিলে রেখে গুনলাম। মোট ৫৩ টা। ইকবালের কাছে ছিলো ২৮ টা, বাকিগুলো
রাশেদুলের। ১০ ভরি করে। ৫৩০ ভরি। ওজন নিলাম। প্রায় ৬.১৮ কেজি। ক্লিক্ ! ক্লিক্ !! চলছেই। অবিরাম। ওদের সা
ব্যাগগুলো তল্লাশি করলাম। নাহ্। ওরকম কিছু নেই। পারসোনাল ইফেক্টস্ সব। এরপর শুরু হলো প্রেস ব্রিফিং। লাইভ
ক্যামেরা, মাইক্রোফোন। কতো প্রশ্ন করে রে!! রিপোর্টারদের ধৈর্য্য ও প্রশ্নের ভাণ্ডার দুই-ই অপরিসীম। (আগেরবারের মতো
আমার বেকুব টাইপ চেহারা এসেছে পেপারে, টিভিতে। হয়তো ঠিকই এসেছে। ইসস্! আরেকটু ইশমার্ট হইতে মুঞ্চায়।)

যথারীতি পতেঙ্গা থানাকে খবর দিলাম। পুলিশ এলো, এজাহার হলো, FIR হলো, আরো কত্তো কী-সব। এরপর আসামিকে
পুলিশ প্রহরায় দিলাম। ওরা হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে ওকে গাড়িতে তুললো। আটক করা প্রায় ৬.১৮ কেজি স্বর্ণ অন্য একটা পুলিশে
গাড়িতে। সেই গাড়িতে আমি, আমার অফিসাররা। গতবারের মতোই। প্রায় আড়াই কোটি টাকা সমমূল্যের মালামাল নি
চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কাস্টোডিয়ান শাখায় জমা দিতে যাচ্ছি। সামনে, পিছনে পুলিশের গাড়ি। এই পুরো দলের নে
আমি। ভাব-টাব আগেরবারের চেয়ে একটু কমে গেছে, তবে আছে। ছোটোলোক (মানুষ) ছোটো কাজেও ভাব নেয়। আ
ওরকম। সেদিন রাস্তায় জ্যাম ছিলো না। ইফতারের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। এভাবে একসময় কাস্টম হাউসে পৌঁছলাম
আযান দিচ্ছে। প্রতীক্ষার সুমধুর আযান। সবাই মিলে ওখানেই ইফতার সারলাম। স্বর্ণগুলো জমা দিলাম। রাষ্ট্রীয় আমান
হস্তান্তর করার শান্তি অন্যরকমের। ওই ২ জনকে সাথে নিয়ে পুলিশ চলে গেলো পতেঙ্গা থানার উদ্দেশ্যে।
এই পুরো ব্যাপারটায় বরাবরের মতোই সব ধরনের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের সিনিয়
স্যারদের কাছে থেকে। এখানে উনাদের কৃতিত্ব বরং বেশি। হাত কী করবে, কী করবে না, মাথা-ই ঠিক করে দেয়। বসদে
সাপোর্ট পেলে ভালো কিছু করা সহজ হয়। স্যারদের ধন্যবাদ।

লেখক
সুশান্ত পাল
সহকারী পরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

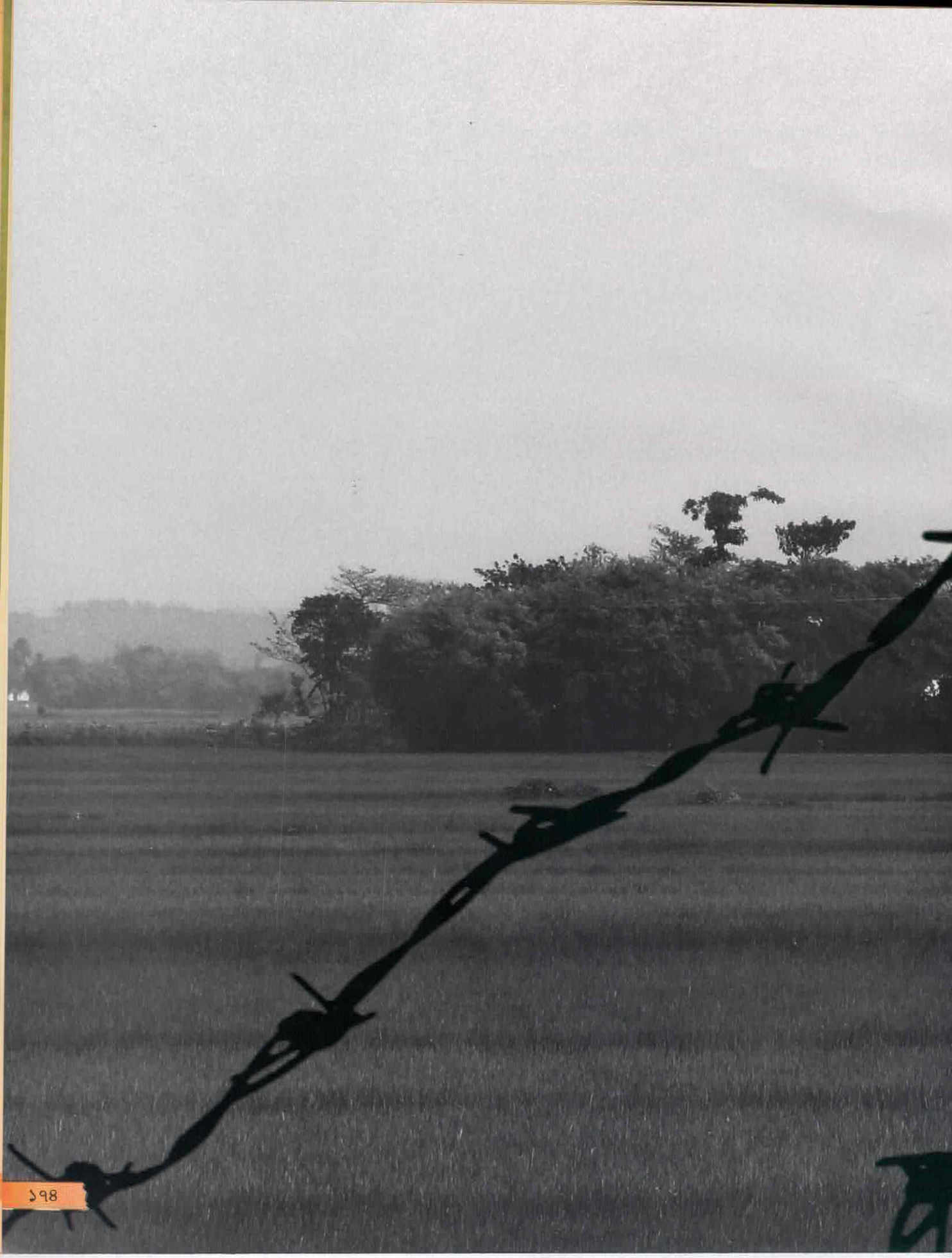
১৭৪

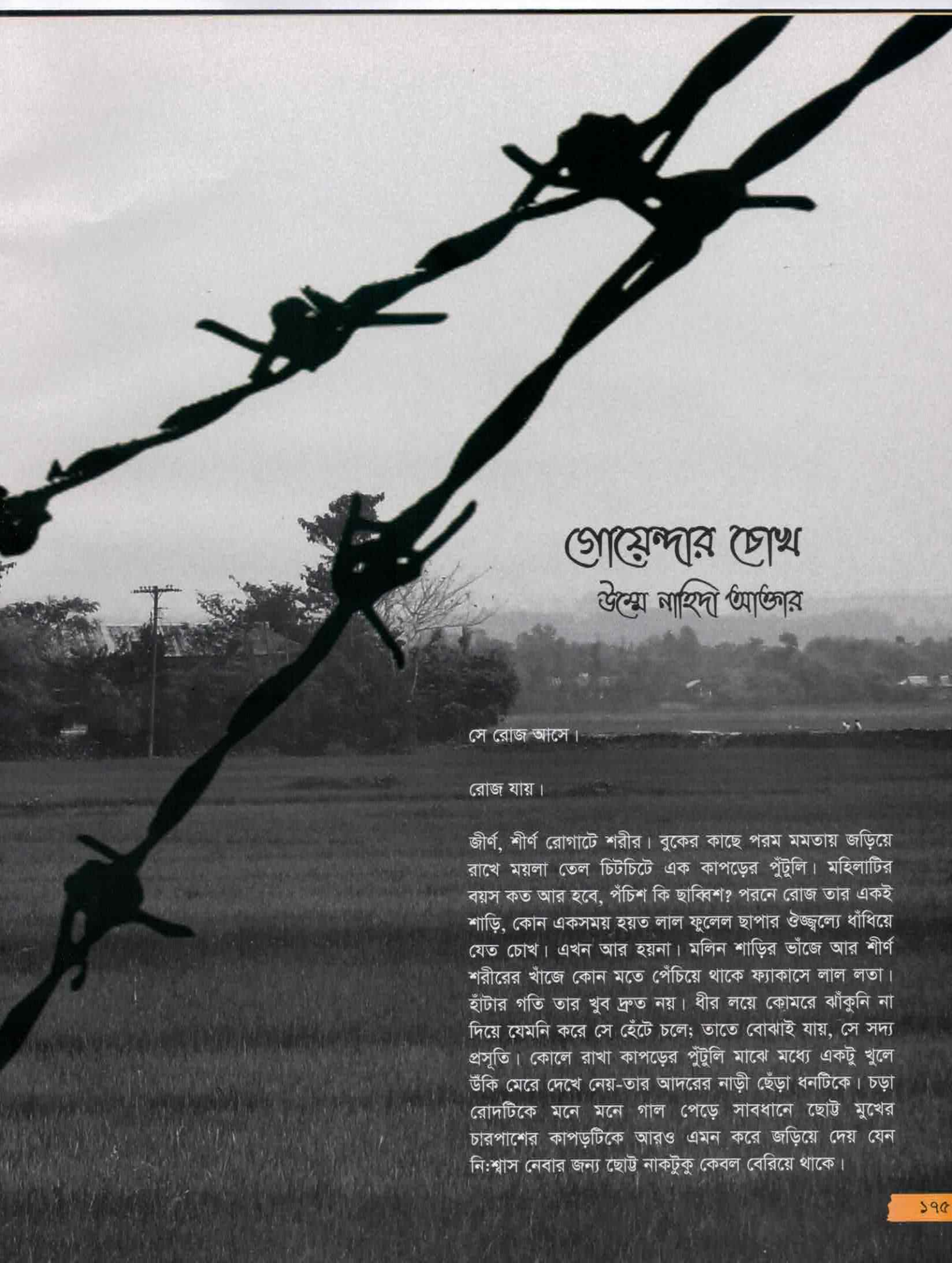

গোয়েন্দার চোখ

উম্মে নাহিদা আক্তার

সে রোজ আসে।

রোজ যায়।

জীর্ণ, শীর্ণ রোগাটে শরীর। বুকের কাছে পরম মমতায় জড়িয়ে রাখে ময়লা তেল চিটচিটে এক কাপড়ের পুঁটুলি। মহিলাটির বয়স কত আর হবে, পঁচিশ কি ছাব্বিশ? পরনে রোজ তার একই শাড়ি, কোন একসময় হয়ত লাল ফুলেল ছাপার ঔজ্জ্বল্যে ধাঁধিয়ে যেত চোখ। এখন আর হয়না। মলিন শাড়ির ভাঁজে আর শীর্ণ শরীরের খাঁজে কোন মতে পেঁচিয়ে থাকে ফ্যাকাসে লাল লতা। হাঁটার গতি তার খুব দ্রুত নয়। ধীর লয়ে কোমরে ঝাঁকুনি না দিয়ে যেমনি করে সে হেঁটে চলে; তাতে বোঝাই যায়, সে সদ্য প্রসূতি। কোলে রাখা কাপড়ের পুঁটুলি মাঝে মধ্যে একটু খুলে উঁকি মেরে দেখে নেয়-তার আদরের নাড়ী ছেঁড়া ধনটিকে। চড়া রোদটিকে মনে মনে গাল পেড়ে সাবধানে ছোট্ট মুখের চারপাশের কাপড়টিকে আরও এমন করে জড়িয়ে দেয় যেন নি:শ্বাস নেবার জন্য ছোট্ট নাকটুকু কেবল বেরিয়ে থাকে।

বহুবার সালাহ্উদ্দিন চেষ্টা করেছে কখনও কোন এক পাশ থেকে পৃথিবীতে আগত এই ক্ষুদে মানবটির নিষ্পাপ মুখাবয়ব একটু দেখা যায় কিনা। কিন্তু জীর্ণ মায়ের শীর্ণ বুকে এমন ভাবে আগলে থাকে সে , যে কখনই পেঁচানো পুঁটুলি আকারে ছোট দেহের আকৃতি ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায়নি কখনও। আর কি আশ্চর্য ! উত্তর বঙ্গের ঝাঁ ঝাঁ রোদে যেখানে ফেটে যাওয়া মাটিও পানির জন্য হাহাকার করে সেখানে এই দুধ খাওয়া শিশুটির গলায় কোনদিন একটি বারের জন্যও মায়ের দুধের আকুতি শোনা যায়নি । শীর্ণ মায়ের শীর্ণ বাচ্চা, কে জানে, হয়ত শব্দ করে কাঁদবার শক্তিটুকুও নেই।

সীমান্তের এপার-ওপার। মাঝে কোথাও কাঁটা তারের বেড়া, আবার কোথাও বা ফাঁকা। এতটাই প্রত্যন্ত এলাকা যে, এপার বাংলা, ওপার বাংলার তফাত করতে বিজিবি কিংবা বিএসএফ কেউই এখানে রাইফেল তাক করে খুব একটা দাঁড়িয়ে থাকেনা। আর তাই দিগন্ত জোড়া মাঠ পেরিয়ে, পিলারের তোয়াক্কা না করেই জামাই নির্দ্বিধায় মিষ্টি হাতে শ্বশুর বাড়ি হেঁটে আসে আর ভালো তরকারিটা রান্না হলেই মাছের মাথাসুদ্ধ বাটিতে ঢাকনা চাপিয়ে শালি দৌড়ায় দুলাভাইয়ের বাড়ি। মাঝে ডিঙ্গানো পিলারের প্রতি ভ্রুক্ষেপই নেই কারো। ওই মহিলাটিরও ঠিক তাই।

সে রোজ যায়।

রোজ আসে।

সকালে যায়। বিকেলের শেষ প্রান্তে সন্ধ্যার নিবু নিবু আঁধারে ফিরে আসে আবার। ধীরে লয়ের হাঁটার ছন্দই বলে দেয়, এতো সেই মমতাময়ী মা। পরম মমতায় বুকে সন্তান জড়িয়ে তার রোজকার পথ চলা।

কোথায় যায় সে?

রোজ? কোথা হতে আসে?

কৌতূহল মোটেও একটিবারের জন্যও ঢেউ খেলেনি মাথায়। কেবল কৌতূহল অদেখা ছোট্ট শিশুটিকে ঘিরে । কি আশ্চর্য রকম নিশ্চুপ লক্ষ্মী একটা বাচ্চা!

আসলাম ! ওই যে দূরে মহিলাটিকে দেখতে পাচ্ছ? ওই সে দূরে হাঁটছে, দেখতে পাচ্ছ? যাওতো ডেকে নিয়ে আস।

প্রত্যন্ত এলাকা বলে সম্প্রতি নাকি এই ফাঁকা মাঠের এপার ওপার জুড়ে ড্রাগসের চোরাচালান খুব বেড়ে গেছে। আজ ১০ দিন হতে চলেছে স্পেশাল টিম নিয়ে তাঁবু গেঁড়ে সে ঘাপটি মেরে বসে আছে; কিভাবে এই ড্রাগসের চালান দেশে ঢুকছে তার গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য । কিন্তু ১০ দিনেও সন্দেহজনক আনাগোনার কোন কিছুই চোখে পড়েনি। লাভের মধ্যে যা হয়েছে, তা হলো খুব কাছ থেকে এই বিরল জনপদের সরল জীবনযাত্রার রেখা চিত্র তাকে স্কুলের ড্রইং কাসে আঁকা স্বপ্নের কুড়েঁঘরওয়ালা গ্রামের একদম কাছে, খুব কাছে নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, এমনই তো আঁকতাম। দুটো কুঁড়েঘর পাশাপাশি; পাশে বটগাছ, তার পাশে খড়ের গাদা, তার পাশে দুটো নারিকেল গাছ কাঁদি কাঁদি ডাব সহ পুকুরের ওপরে কোমর বাঁকিয়ে প্রায় পড়ি পড়ি ভাব করে দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যাঁ। একদম ঠিক ছবির মতই গ্রামখানি; তবে দূরে। আর সে যেখানে কেমোফ্লাজ করে অ্যামবুশ করে বসে আছে তা গ্রামের বাইরে এক আদ্যিকালের পুরোনো পরিত্যক্ত কবর স্থান। কবরস্থানে অ্যামবুশ করার সুবিধা হলো এই যে, কষ্ট করে মাঠি খুঁড়ে এখানে ট্রেঞ্চ বানাতে হয়না আর হাড়গোড়ওয়ালা কঙ্কাল ভূতের ভয়ে দিনের বেলায়ও কেউ এদিকটা সহসা মাড়াতে আসেনা। অন্তত: গত ১০ দিনে সে কাউকে দেখেনি।

যাই হোক। আদেশ পেয়েই আসলাম তীরের বেগে ছুটলো মহিলাটিকে ডেকে আনবার জন্য। এই যে, এই যে শুনুন, দাঁড়ান। দাঁড়ান। ডাক শুনে মহিলাটি কেবল আসলামের বুটওয়ালা পা আর ইউনির্ফমের দিকে তাকিয়েই যা করল তা বোধহয় এই জগতের কোন মা কোনকালেই করেনি।

ছুঁড়ে ফেলে দিল কোলের শিশুটিকে খরতাপে ফাটা রুক্ষমাটির ওপর। আছড়ে পড়ল বাচ্চাটি। আসলাম গেছে থমকে দাঁড়িয়ে। পেছনে দূরে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সবাই শিশুটির দিকে । হায়রে অবোধ দুধের বাচ্চা! এতই পাষাণ মা! ভূতের ভয়ে কোলের বাচ্চা ফেলে বুঝি কেউ এভাবে পালিয়ে যায়!

মুহূর্তের আকস্মিকতা কেটে যেতেই আসলাম ছুটে গেলো মাটিতে পড়া শিশুটির কাছে। ত্রস্ত হাতে বুকে তুলে নিল, আর তারপর...

ধীর পায়ে আসলাম হেঁটে এগুচ্ছে কবরস্থানের দিকে, যেন দু'পায়ের ওজন হয়েছে ১০০ কেজি । ওর চোখ দুটোতে পলক পড়ছে না। ফ্যাকাসে মুখে যেভাবে এগুচ্ছে, সালাহ্উদ্দিন বুঝে ফেলেছে ওই এক আছাড়েই শিশুটির শেষ নিঃশ্বাস চৈত্র্যের খরতাপে তখুনি মিলিয়ে গেছে।

ধীর পায়ে আসলাম হেঁটে এগুচ্ছে কববস্থানের দিকে।

যে ছোট্ট শিশুর মুখখানি একটু দেখার জন্য সালাউদ্দিনের ভেতরটায় আকুলতা জাগত। যে ছোট, কাপড়ে পেঁচানো দেহটি দেখে তার ঢাকায় ফেলে আসা পাঁচ মাস বয়সী শিশু সন্তানটির ভাবনা বুকের ভেতরে ঝিলিক দিয়ে যেত; সেই দেহ, হ্যাঁ এখন দেহ বলাই ভালো, সেই ছোট্ট দেহটি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কাছে আসতে আসতে আসলাম জড়িয়ে রাখা কাপড়খানি খুলতে শুরু করল আর তারপর তুলে ধরল দু'হাতে সামনে।

উহ্! কি বীভৎস!

কি নিষ্ঠুর! কি নৃশংস!

পুরো ফরমালিনে প্রিজারভ করা শুকিয়ে কালচে, শক্ত হয়ে আসা একটি ছোট্ট নিথর দেহ। বুকের কাছ থেকে তলপেট পর্যন্ত চিরে ফেলে বের করা হয়েছে অপ্রয়োজনীয়(?) সব অঙ্গাদি, ফুসফুস...লিভার...পাকস্থলী...সব! সব! সব!

আর তারপর! বেশ সুন্দর খোলের মধ্যে ঠেসে পুরেছে হেরোইনের পুঁটুলি। প্রায় ২ কেজি!

হায়রে! না জানি কোন দুঃখিনী মায়ের নাড়ী ছেঁড়া ধন!

পিশাচিনী! ডাইনী! কোন মায়ের বুক খালি করেছে কে জানে? নিষ্পাপ শিশুকে চুরি করে, নৃশংসভাবে খুন করে তার নিথর দেহকে এভাবে ব্যবহার করতে কি একটুও বুক কাঁপলোনা!

সালাইউদ্দিন বুঝল এই জন্যই তাদের ১০ দিনের অ্যামবুশ করে বসে থাকা।

হায়রে! গোয়েন্দার চোখ! এই চোখ মেলে দেখতে হলো কী নৃশংস বীভৎসতা! কী নিষ্ঠুর বর্বরতা! গোয়েন্দার চোখ! বুজে এলো কষ্টে...বহু কষ্টে। আর গড়িয়ে পড়া একফোঁটা জল ধীরে মিলিয়ে গেলো মাটিতে পড়ার আগেই।

লেখক
উম্মে নাহিদা আক্তার
সহকারী পরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

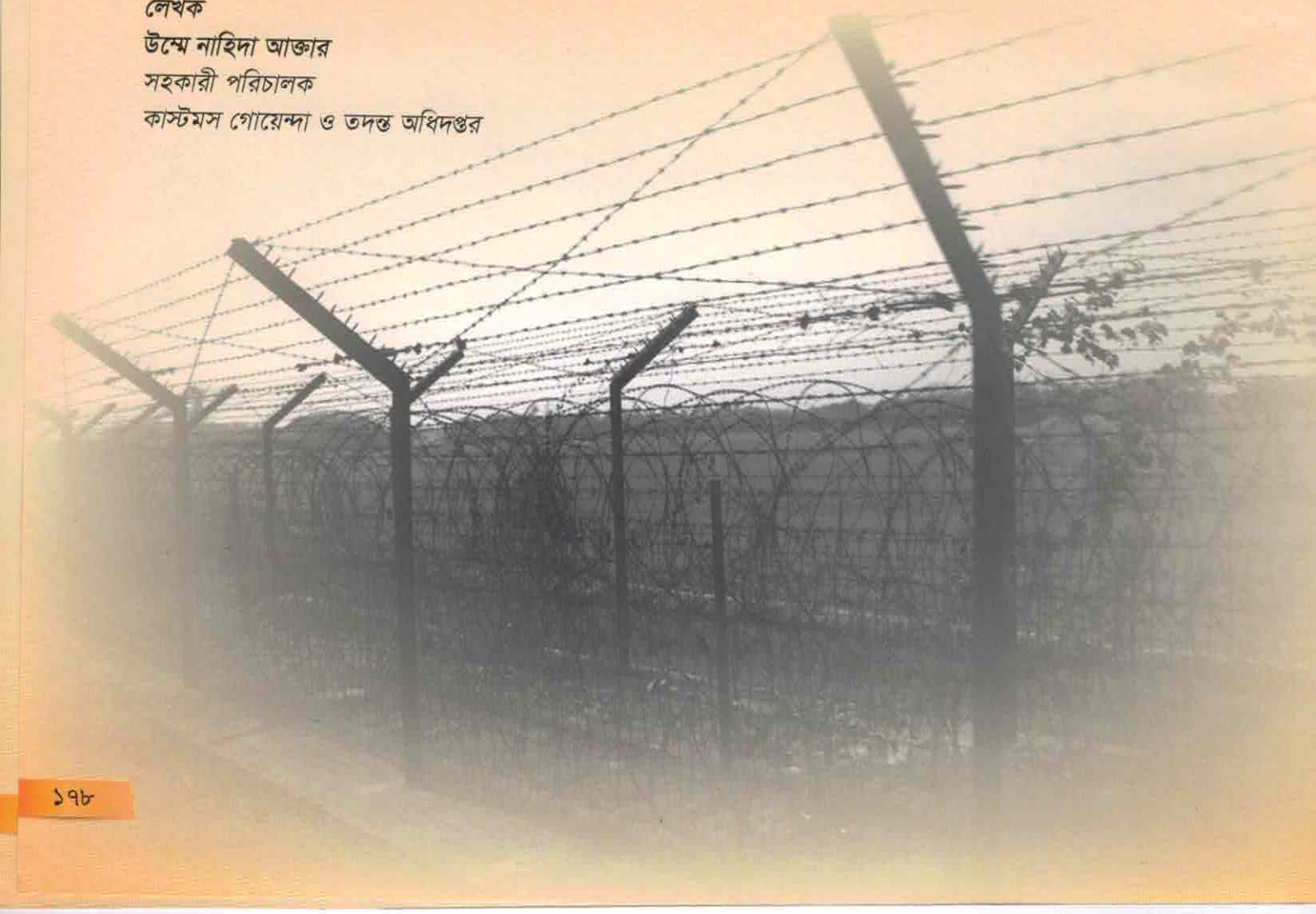

অভিজ্ঞতার ঋণ

ইফতেখার হোসেন

কথায় আছে অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। আর কাষ্টমস স্টেশনগুলোতে শুল্ক ফাঁকি রোধে গোয়েন্দা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতালব্ধ গৃহীত ব্যবহা স্থান-কাল, সংঘটিত ঘটনা এবং এর সংশ্লিষ্ট ও পারিপার্শ্বিক নিয়মনীতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আমার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কর্ম জীবনে এই প্রথম আমি কাষ্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে পদস্থ হয়ে গত ২০-০২-২০১৩ইং তারিখে কাষ্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত সার্কেল, বেনাপোল-এ কাজ শুরু করি। সেখানে গিয়েই আমি বুঝতে পারি যেকোন কারণে কাষ্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত সার্কেল, বেনাপোল-এ ইমেজ ক্রাইসিস রয়ে গেছে। আমার প্রথম উপলব্ধি হলো একটি গোয়েন্দা টিম, সেটা জনবলে যে আকারেরই হোক না কেন, তার প্রধান অস্ত্র ভাবমূর্তি।

সেটার প্রতি সংশ্লিষ্ট সংস্থার (বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার যাদের নিয়ে কাজ করতে হয়) শ্রদ্ধাবোধ, কর্মশক্তি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকি বা ঘটনার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ ও যোগ্যতার প্রতি যদি বিশ্বাস না থাকে সেখানে কাষ্টমস গোয়েন্দা দলের সঠিক কর্মতৎপরতা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। কাষ্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত সার্কেল, বেনাপোলে এই ইমেজ ক্রাইসিসটাই বিদ্যমান রয়েছে বলে আমার মনে হলো। কাস্টম হাউস, বেনাপোলে মুলতঃ প্রত্যেকটি আমদানির ক্ষেত্রে সিএন্ডএফ এজেন্টের প্রতিনিধি আমদানির স্বপক্ষে সকল ডকুমেন্টস্ সম্বলিত ফাইল সহকারে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এছাড়া তারা এ সম্পর্কিত সকল ঘটনারও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। সেখানে আমাদের সাধারণভাবে কাজটাই হওয়ার কথা পণ্যের মিথ্যা ঘোষণা, অবমূল্যায়ন, এইচ.এস.কোড পরিবর্তন এবং ভুল সিপিসি উল্লেখপূর্বক অবৈধভাবে রেয়াতী শুল্ক হারের সুবিধা গ্রহন ইত্যাদি উদ্‌ঘাটন করা। কিন্তু মূল সমস্যা হলো এগুলো প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয় কর্মকর্তাদের বেশ ভাল ধারণা থাকতে হবে। তা না হলে প্রতিপক্ষে কে (প্রতিপক্ষ বলছি শুধু সে সকল আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্টদেরকে যারা জেনেশুনে অবৈধ সকল সুযোগের চেষ্টা চালায়) ঘায়েল করা অসম্ভব। প্রত্যেকটি মানুষই Psychologically Logical। তাই তার ভুল/অবৈধ সুযোগ গ্রহনটি তাকে যদি দেখিয়ে দেয়া যায় এমনিতেই সে অর্ধেক দুর্বল হয়ে পড়ে। বাদ থাকে তার পারিপার্শ্বিক প্রভাব (ব্যক্তি পর্যায়ে, মিডিয়ার ও রাজনৈতিক প্রভাব)। এটা মোকাবেলার জন্য রিমোট পর্যায়ে কাষ্টমস স্টেশনগুলোতে বিভিন্ন স্তরে কিছুটা পরিচয় বা সম্পর্কের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত- প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। বেনাপোল সার্কেলে যাওয়ার পর সেখানে এগুলোর বেশ অভাব রয়েছে বলে আমার মনে হলো।

আমি লক্ষ্য করলাম বেশকিছু সিএন্ডএফ প্রতিনিধি/মালিক গোয়েন্দা অফিসের প্রধান, রাজস্ব কর্মকর্তার অফিস রুমসহ অন্যান্য রুমে অনুমতি ছাড়াই ঢুকে পড়ে এবং আচরণের ক্ষেত্রেও অফিসিয়াল না হয়ে কখনো বন্ধু সুলভ বা কখন ঔদ্ধত্যপূর্ন আচরণ করছে। প্রায়ই ক্ষেত্রে এ আচরণের মূল উদ্দেশ্য হলো তাদের ভুল বা রাজস্ব ফাঁকিকে জায়েজ করা। তাই প্রথমেই আমি এই অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য খুব সর্তকতার সাথে তাদের আচরণের ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া শুরু করলাম। যেমন- রুমে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়া, তাদের নিজস্ব Credibility সম্পর্কে অযথা বক্তব্য লম্বা না করার সুযোগ দিয়ে Specific Subject সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং গতানুগতিকতায় তার পূর্ব সুবিধা গ্রহণের ভুল বৈধতা সম্পর্কে ধরিয়ে দেয়া (High-light) ইত্যাদি।

তখন লক্ষ্য করলাম তাদের আচরণে পরিবর্তন আসছে এবং আমাদের অফিসের কার্যক্রম সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা বাড়ছে। তাছাড়া লক্ষ্য করলাম অফিসের গেটআপও যথেষ্ট মলিন ছিল। যা ক্রমান্বয়ে অনেকটা উন্নতি সাধন করা হয়। বেনাপোল সার্কেলে রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যায়ে গতানুগতিকভাবে পণ্যচালানের পরীক্ষণের সময় ওজনের সঠিকতা পর্যায়ে বেশীরভাগ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। মিস্‌ডিক্লারেশন বা ইনফর্মেশন ভিত্তিক কাজ হয়নি তা নয়, কিন্তু প্রথমোক্ত পর্যায়ের অভ্যাসই বেশী প্রচলিত ছিল।

কিন্তু আমার মনে হলো মেশিনারিজ, কেমিক্যাল ইত্যাদি সহ বেশকিছু পণ্য পরীক্ষণ পর্যায়ে সঠিকভাবে চিহ্নিত না করার কারণে শুল্ক ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারক শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে ইনভয়েসসহ অন্যান্য ডকুমেন্টসে পণ্যের সঠিক বিবরণ না দিয়ে তার সুবিধামত বিবরণ উল্লেখ করার ব্যবস্থা করে থাকে। তাই এই ক্ষেত্রে আমার মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সুবিধা থাকায় ওয়েব সাইটে গিয়ে অনেক পণ্যচালানের মিথ্যা ঘোষণা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি। আসলে Google হলো অজানাকে জানার এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা যা আমরা সকলেই জানি। একটি পণ্যকে সঠিকভাবে চেনার মাধ্যমেই পণ্যের পরীক্ষণ ও পরবর্তী পর্যায়ে শুল্কায়নের ১ম পদক্ষেপ। এর পরবর্তী পর্যায়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল শুল্কায়ন পর্যায়ে সঠিক এইচ.এস.কোড নির্ধারণ, যা কিনা অনেক ক্ষেত্রে এক্সপ্লেনেটরি নোটস্ বইয়ে সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে সক্ষমতা অর্জন। তা না হলে এইচ.এস.কোড নির্ধারণে ভুল হতে পারে।

ফলশ্রুতিতে রাজস্ব কম অথবা অধিক আদায় হতে পারে। যার কোনটাই কাম্য নয়। তাছাড়া পণ্যের মূল্য নির্ধারণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা বাহুল্য। এ বিষয়েও ইন্টারনেট ব্যবহার করে যথেষ্ট সফল হয়েছি। এছাড়া সব শুল্ক স্টেশনে কিছু সিএন্ডএফ সংশিষ্ট চক্র থাকে যারা কাস্টমস্, পোর্টসহ বিভিন্ন সংস্থাকে ফাঁকি দিয়ে বা নীতি বিবর্জিত ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তুলে জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্যচালান খালাসের প্রচেষ্টা চালায়। এ ধরণের কেইস উদ্‌ঘাটনের জন্য পূর্ব ইতিহাস মোতাবেক আমদানিকারক সিএন্ডএফ সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ের তালিকা তৈরী করে তাদের কর্মকান্ড জানার জন্য কাস্টম হাউস সংশ্লিষ্ট Information Data Base তৈরি করেছিলাম। যা সব সময় ভাল ফল দিয়েছে।

বেনাপোল, কাস্টম হাউসের রাজস্ব ফাঁকির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি, নিম্নে তার কয়েকটি পদ্ধতি উদ্‌ঘাটনের ঘটনা উলেখ করলামঃ–

(০১) ৩৩৫ প্যাকেজের একটি পণ্যচালান যার ওজন ছিল ৫৫ মে. টনের অধিক। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিকৃত বিভিন্ন (Assorted) এই সকল আইটেমের বড় বড় পণ্যচালান বেনাপোল, কাস্টম হাউজের সেডে স্বল্প পরিসরে রাখার কারণে শতভাগ পরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় ঘোষণা বহির্ভূত কিছু পণ্যের প্যাকেজ বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখার সম্ভাবনা থাকে। কারণ স্বল্প পরিসরে সঠিকভাবে প্যাকেজ গণনাও এক দুরূহ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে তথ্য পেতে ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক, পণ্যচালানের সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসমূহের বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা এবং সিএন্ডএফ ও ইম্পোর্টারের Credibale Performance উপর নির্ভর করতে হয়েছে। উপরোল্লিখিত এই বিশাল পণ্যচালানটিতে আমদানিকারক শুল্ক-কর বাবদ জমা দিয়েছিল মাত্র ৪,৩৬,৯৫৩.৫৩ টাকা । এই বিষয়টিই আমাকে সন্দিহান করে। তাছাড়া সংবাদ সংগ্রহ করে জানতে পারি আমদানিকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্ট একই পরিবারভুক্ত। অতি বন্ধুসুলভ ও বিনয় আচরণ করে থাকলেও আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর তারা সুকৌশলে এড়িয়ে যায় ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে পুনঃপরীক্ষণ মাধ্যমে এই পণ্যচালানটিকে ঘোষণা বহির্ভূত আমদানি পণ্যসহ অন্যান্য অপরাধের জন্য জরিমানাসহ শুল্ক-কর পরিশোধের টাকার পরিমাণ দাড়ায় ১,২৮,০০,০০০/- টাকা মাত্র।

(০২) আর একটি পণ্যচালানে ফাঁকির পদ্ধতি আমার কাছে অভিনব মনে হয়েছে। ইনভয়েসে Rice Silky Policher with compressor accessories & spare parts ঘোষণায় ১০,৬০০.০০ মা. ডলার মূল্যে একটি পণ্যচালান আমদানি করে এইচ.এস.কোড ৮৪৩৭.৮০.৯০ উল্লেখপূর্বক বি/ই দাখিল করে।

কিন্তু পণ্যচালানটি কায়িক পরীক্ষার সময় দুইটি কাঠের বাক্সে দুইটি Silky Policher সঠিক পাওয়া গেলেও অন্য দুইটি কাঠের বাক্সে প্রাপ্ত উন্নতমানের Air Compressor এর অংশ নয় এবং আরও ৩০টি চটের বস্তায় ১০৮০ কেজি ওজনের Steel Bucket উক্ত পলিসার মেশিনে এক্সেসরিজ বা পার্টস কোনভাবেই নয়। সেই স্বল্প সময়ে প্রমাণভিত্তিক সত্যতা উদ্‌ঘাটনের জন্য আমার একমাত্র উপায় ছিল গুগোলে সার্চ করা তা না হলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে Compressore দুইটি রাইস পলিসারে অংশ বিশেষ। তাছাড়া পণ্যের মূল্যের ব্যপারেও দেখা গেল কেবল রাইস পলিসারের মূল্যের আওতায় সবগুলো পণ্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পণ্যচালানের মূল্যের চেয়ে ফাঁকির পদ্ধতি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

(০৩) আবার কিছু কেমিক্যালস সহ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে পণ্যের Properties এর উপর এইচ.এস.কোড নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সকল পণ্যের রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য বেনাপোল, কাস্টম হাউজে পরীক্ষাগার না থাকায় অন্য পদ্ধতিতে চেষ্টা করেও ফল পেয়েছি। কেমিক্যাল ডিকশেনারীতে প্রায় প্রত্যেকটি কেমিক্যাল Properties এর সিম্বোলিক নাম, বর্ণনা এবং এর ব্যবহার উলেখ থাকে। যেমন- Copper Phosphate (Copper ortho phosphate) $Cu_3(PO_4)2.3H_2O$.Properies: Light-blue powder. Soluble in acids, ammonium hydroxide, insoluble in water. Use: Analysis, Fungicide, catalyst, oxidation inhibitor for metal.

এ যে তথ্য এর মাধ্যমে আমি পণ্যের ইনভয়েস, ক্যাটলগ ইত্যাদির সাথে পণ্যের বর্ণনা মিলিয়ে দেখতে পারি। তাছাড়া পণ্যটি দেখতে Light-blue powder কী-না বুঝতে পারি। এছাড়া আমার কাছে Acid Ammonium Hydroxide না থাকলেও পানিতে insoluble কী না পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এছাড়া কি ধরণের আমদানিকারক ফোনের মাধ্যমে জেনে নিতে পারি এ পণ্য কিসে ব্যবহারের জন্য আমদানি করা হচ্ছে। এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ধারণা নেয়া সম্ভব। তবে সাথে সাথে ডিকশেনারীতে এর Hazard অবশ্যই দেখে নেয়া দরকার, না হলে পরীক্ষার সময় নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

(০৪) আমার নিয়োজিত গোপন সংবাদদাতার সংবাদের ভিত্তিতে একটি সংবাদ পাই যে, ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্ট জালিয়াতির মাধ্যমে সিনথ্যাটিক অর্গানিক ডাইস এর স্থলে ৪৮০ ড্রামের (১২ মে. টন) একটি পণ্যচালান Pigment & Preparation উল্লেখপূর্বক শুল্কায়ন পরবর্তী শুল্ককর পরিশোধ করে পণ্যচালানটি খালাস পর্যায়ে আছে। সে মোতাবেক আমি আমার টিম নিয়ে গোডাউন সেডে গিয়ে দেখতে পাই ড্রামের গায়ে Pigment & Preparation লেখা কাগজ সাঁটানো থাকলেও ড্রামের গায়ে এক জায়গায় Reactive (RE) মুদ্রীত পাওয়া যায়। এটাই পণ্যচালান খালাস স্থগিতের জন্য যথেষ্ট ছিল। পরবর্তীতে তদন্তে জালিয়াতি প্রমানিত হয়। এছাড়া অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি মূল ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইনভয়েস বা প্যাকিং লিস্টের সামান্য পরিবর্তন করে এইচ.এস.কোড পরিবর্তনের মাধ্যমে কম শুল্ক-হারে শুল্কায়নের প্রবনতা দেখা যায়।

এভাবে প্রতিটি দিনই কাষ্টম হাউজ বেনাপোলে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড আমাকে নুতন নুতন অভিজ্ঞতা দিয়েছে, আমাকে শিক্ষিত করেছে। তাই কাষ্টমস গোয়েন্দা বেনাপোল সার্কেলের কাছে তথা কাষ্টম হাউস বেনাপোলের কাছে আমার ঋণ চিরকাল থেকেই যাবে।

লেখক
ইফতেখার হোসেন
রাজস্ব কর্মকর্তা
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

ব্রহ্মলোকের প্রভা

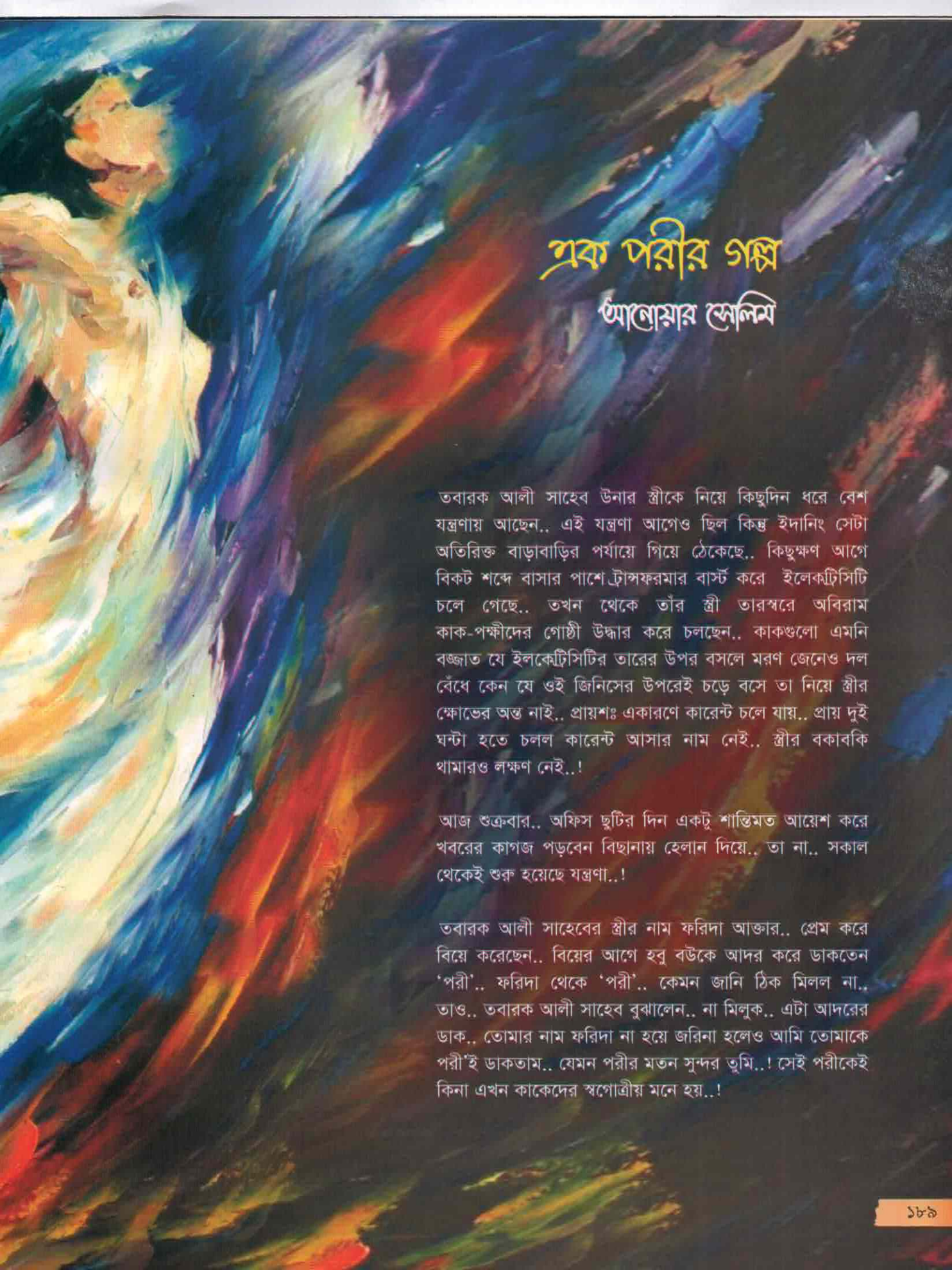

এক পরীর গল্প

আনোয়ার সেলিম

তবারক আলী সাহেব উনার স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিন ধরে বেশ যন্ত্রণায় আছেন.. এই যন্ত্রণা আগেও ছিল কিন্তু ইদানিং সেটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে.. কিছুক্ষণ আগে বিকট শব্দে বাসার পাশে ট্রান্সফরমার বার্স্ট করে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে.. তখন থেকে তাঁর স্ত্রী তারস্বরে অবিরাম কাক-পক্ষীদের গোষ্ঠী উদ্ধার করে চলছেন.. কাকগুলো এমনি বজ্জাত যে ইলেকট্রিসিটির তারের উপর বসলে মরণ জেনেও দল বেঁধে কেন যে ওই জিনিসের উপরেই চড়ে বসে তা নিয়ে স্ত্রীর ক্ষোভের অন্ত নাই.. প্রায়শঃ একারণে কারেন্ট চলে যায়.. প্রায় দুই ঘন্টা হতে চলল কারেন্ট আসার নাম নেই.. স্ত্রীর বকাবকি থামারও লক্ষণ নেই..!

আজ শুক্রবার.. অফিস ছুটির দিন একটু শান্তিমত আয়েশ করে খবরের কাগজ পড়বেন বিছানায় হেলান দিয়ে.. তা না.. সকাল থেকেই শুরু হয়েছে যন্ত্রণা..!

তবারক আলী সাহেবের স্ত্রীর নাম ফরিদা আক্তার.. প্রেম করে বিয়ে করেছেন.. বিয়ের আগে হবু বউকে আদর করে ডাকতেন 'পরী'.. ফরিদা থেকে 'পরী'.. কেমন জানি ঠিক মিলল না.. তাও.. তবারক আলী সাহেব বুঝালেন.. না মিলুক.. এটা আদরের ডাক.. তোমার নাম ফরিদা না হয়ে জরিনা হলেও আমি তোমাকে পরী'ই ডাকতাম.. যেমন পরীর মতন সুন্দর তুমি..! সেই পরীকেই কিনা এখন কাকেদের স্বগোত্রীয় মনে হয়..!

তবারক আলী সাহেবের নিজের নাম নিয়েও বেশ অস্বস্তি আছে.. বড় মেয়ের বয়স যখন দশ.. একদিন স্কুল থেকে এসে গোমড়া মুখে বলল.. বাবা তোমার এত পচা নাম কে রাখছে ! ক্লাসের মেয়েরা আমাকে প্রায়.. বলে.. তোর বাবা মিলাদের তবারক.. গুড়ের নাড়ু.. লজ্জায় আমি কানছি..! ফরিদা সুযোগ বুঝে গজগজ শুরু করে দিলো.. কে আর রাখবে.. নিশ্চয়ই তার চাষা বাপ..! তার জন্যে আমার এইটুকুন মেয়ের কি অপমান.. সেই যে শুরু হলো তবারক সাহেবের মরা বাপের উপর শাপ শাপান্ত.. তাও চলল একনাগাড়ে পুরো দুই দিন..!

তবারক সাহেব নিছক ফেলনা মানুষ না.. সচিবালয়ে গুরুত্বর্পূণ একটা মন্ত্রনালয়ের সহকারী সচিব.. কিন্তু কোথাও যেন তার মান-সম্মান নাই.. কাল অফিসের বড় স্যার ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তাই গালাগাল দিয়েছে.. আপনাকে প্রমোশন দিছে কে..! কেরানি হবার যোগ্যতা নাই ফার্স্ট ক্লাস অফিসার বানায় দিছে.. এভাবে সরকার চলে..! তবারক সাহেব কখনই প্রমোশনের চেষ্টা করেন নাই.. সরকারই তাকে প্রমোশন দিয়েছে.. এখন কিনা তার প্রমোশনের কারণেই সরকার অচল হতে বসছে..!

ফরিদা মোটামুটি স্বচ্ছল ঘরের মেয়ে.. আজিমপুর কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর তবারক আলীর ঘর করতে আসে.. অভাবের সংসার.. বোরহানউদ্দিন কলেজ থেকে বিএ পাস করে সরকারী অফিসে কেরানির চাকুরিতে ঢুকে তবারক.. নড়াইলে গ্রামে বাবা, মা আর পাঁচ ভাই বোনের সংসারের ঘানিও তাকেই টানতে হত.. দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেরানির চাকরি করে অন্যদের মত অতিরিক্ত টু পাইস কামানোর সাহস হয়নি কখনো.. এ নিয়ে ফরিদার গালমন্দ খেয়ে এসেছে অনেকটা সকালের নাস্তার মত..

ফরিদা হাইপারটেনশনের রোগী.. তার উপর শ্বাসের টান.. গরম ঠাণ্ডা নিয়ে নানা সমস্যা.. রাত বিরেতে এইসব আবার বেশি বেড়ে যায়.. সারারাত কোঁকাবে, এপাশ ওপাশ করবে.. আর উপরওয়ালা থেকে শুরু করে বিছানা বালিশ পর্যন্ত সবার গোষ্ঠী উদ্ধার শেষে ঘুরে ফিরে সব দোষ গিয়ে পড়বে তবারক আলীর উপর.. কি কুক্ষণেই না এই অকম্মা দামড়া লোকটাকে বিয়ে করেছিল..!

বিয়ের আগে ফরিদা কখনই এমন ছিলনা.. বাবা মার অমতে তবারক আলীর হাত ধরে পালিয়ে এসেছিল..সেই থেকে শুরু অভাবের সংসারে ঘানি টানা.. চারদিকে কেবল নাই নাই.. কাঁহাতক সহ্য হয়..! দিনে দিনে শরীরে মনে বাসা বাঁধা অসুখ বেড়ে চলছে..

তবারক আলী সাহেবের বয়স ছাপ্পান্ন.. ঘরে বাইরে এইসব নানা অশান্তি ছাড়া রোগশোক তেমন বেশি নেই.. তাঁর ধারণা হয়েছে বেশি খেয়েই মানুষ বেশি অসুখ বাধায়.. বৌএর মতিগতির কারণে তাঁর রান্না ঘরে কোনো কোনো দিন চুলাই জ্বলে না.. সেদিন রাস্তা থেকে পুরি পরোটা খেয়েই দিব্বি ভালো আছেন..

বড় একটা টেনশন ছিল অবসরে যাওয়া নিয়ে.. সদাশয় সরকার চাকরির মেয়াদ দুই বছর বাড়ানোতে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন.. প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা পয়সা তেমন কিছু অবশিষ্ট নাই.. সব টেনেটুনে শেষ করছেন.. মেয়ে তিনটাই তরতর করে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে.. এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়.. আবার মনে হয় আজকালকার মেয়ে নিজের মত করেই কিছু একটা ব্যবস্থা করে নিবে..

তবারক আলীর কলিগ মিন্নাত আলী.. একসাথে চাকরিতে জয়েনও করেছিলেন.. তিনি আছেন বেশ.. সকালে নিজস্ব একটা গাড়ি অফিসে দিয়ে যায়, ছেলে মেয়েরা প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ে.. কয়েকদিন আগে পরিবার নিয়ে মালয়েশিয়া ঘুরে এসেছেন.. সেটার অনেক গল্পও করলেন.. তবারক সাহেব একদিন ভাবলেন আচ্ছা 'মিন্নাত' মানে কি ? উনার নাম নিয়ে তাঁর মেয়ের ক্লাসমেটরা নিশ্চয়ই হাসিঠাট্টা করেন..! উনার বাচ্চারা ভদ্র স্কুলে পড়ে.. মিন্নাত সাহেব কোনদিন বসদের বকা-বাদ্য শুনেছেন এমন তথ্য তাঁর জানা নেই..

পাঠক.. আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তবারক সাহেব ঘুষ খান না.. কাজে র্কমে চলনে বলনে চৌকস না.. আর দশজন সরকারী অফিসারের বিচারে হাবাগোবা গোবেচারা টাইপ মানুষ.. ঘুষ খেতে সাহস লাগে.. উনার সেই সাহস নাই..

আজ রবিবার একটু তাড়াতাড়ি অফিস চলে আসলেন তিনি.. কি জানি কি কারণে মন ভালো নাই.. সকালে ফরিদাকে দেখে এসেছেন চুপচাপ গুটিসুটি কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে.. আজও সকালে চুলা জ্বলেনি.. মেয়েরা নিজেদের মত যার যার কাজে চলে গেছে আগেই.. বড় মেয়েটা শুধু একবার জিজ্ঞেস করলো.. বাবা চা খাবা ? বানিয়ে দেই ? তিনি বললেন.. না থাক.. একবার মনে হলো ফরিদাকে জিজ্ঞেস করেন.. শরীরটা কি বেশি খারাপ ? সাহস হলনা.. আবার না জানি তার চৌদ্দগোষ্ঠীর ঠিকুজি নিয়ে বসে..!

আজ অফিসে সকাল থেকেই সবার মধ্যে কি যেন একধরনের কানাঘুষা.. একধরনের চাঞ্চল্য.. দুপুরের দিকে খুশি খুশি ভাব.. পরিবেশটাই বদলে গেছে.. তবারক সাহেবের মন ভালো নেই.. কি হচ্ছে সেটা জানার আগ্রহ বোধ করছেন না..

বিকেলের দিকে তাঁর রুম এ সন্তপর্নে ঢুকলেন মিন্নাত সাহেব পা টিপে টিপে বিড়ালের মত নিঃশব্দে.. বললেন.. একটু দরকারী কথা ছিল.. দরজাটা আটকে দেই ? এরপর অনুমতির অপেক্ষা না করেই দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন.. সামনের চেয়ার টেনে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে তাঁর দিকে ঝুঁকে বসলেন..

একটা ছোট্ট গলা খাঁকারি দিয়ে একটু থেমে ফিসফিস করে শুরু করলেন.. তবারক সাহেব.. আজ অফিসে ওই বড় কাজের কন্ট্রাক্টটা সাইন হয়েছে.. সব ট্রান্সপারেন্ট.. আড়াই হাজার কোটি টাকার কাজ.. কিন্তু কেউ বলতে পারবেনা একচুল এদিক সেদিক.. আপনি তো জানেন মন্ত্রী কেমন স্ট্রিক্ট.. পার্টি খুশিতে অফিসের সবার জন্যে চা-পানি খাবার কিছু টাকা রেখে গেছে.. আমরা তো সবাই আপনাকে চিনি.. কেউ কথাটা আপনার কাছে পাড়ার সাহস করলনা বলে আমি আসলাম..

নিজের কথা না ভাবলেন.. মেয়েগুলা তো বড় হইছে.. ওদের কথা ভাবা দরকার.. আমারও তো মেয়ে আছে.. আপনার মেয়ে তো আমারই মেয়ে.. আপনি না করবেননা প্লিজ.. এই প্যাকেটে হাজার দশেক টাকা আছে.. রেখে যাচ্ছি.. বাসায় যাবার সময় মেয়েগুলার জন্যে কিছু একটা কিনে নিয়েন.. কথা শেষ করার আগেই টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা খাম রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন..

তবারক সাহেবের মনে কোনো ভাবের উদয় হলনা.. ফরিদা আজ সকালে চেঁচামেচি করেনি.. একবার জিজ্ঞেস করে আসলেই ভালো হত.. শরীরটা বেশি খারাপ হয়নি তো! অফিসের বাস এরমধ্যে চলে গেছে.. পাঁচটা বাজার পনের মিনিট আগেই সব হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে.. এটাই এখানকার নিয়ম.. তাঁর বাসায় যেতে ইচ্ছা করছেনা কেন জানি.. নিজে কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করেননা.. কেবল ছোট মেয়েটার আবদার রক্ষা করতে গিয়ে গুলিস্থান থেকে তাকে একটা সস্তা ফোন কিনে দিতে হয়েছে.. এটা ইন্টার এ ভালো রেজাল্ট করার পুরস্কার.. আজ হেঁটেই বাসায় যাবেন ঠিক করলেন..

উঠতে গিয়ে ড্রয়ারে থাকা খামটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন.. কি মনে করে প্যান্টের পকেটে ঢুকালেন.. ফরিদাকে একজন বড় ডাক্তার দেখাতে পারলে ভালো হত..

দোয়েল চত্বরের কাছে আসতেই বারো চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে হাত বাড়িয়ে সামনে দাড়ালো.. পরনে সাদা ধুতি.. ময়লা ধুতির একটা অংশ গায়ে জড়ানো.. কাঁধে কাপড়ের ঝোলা.. হাতে শলার ঝাড়ু জাতীয় কিছু.. বক্তব্য হচ্ছে বাবা মারা গেছে.. শ্রাদ্ধ করতে সাহায্য দরকার.. তবারক সাহেব বোকা হলেও জানেন এটা নির্জলা মিথ্যা.. ভারি একটা কৌশল.. ছেলেটা মুসলমান হবার সম্ভাবনাই বেশি.. কি যেন ভেবে পকেটে থাকা খামটা ওর হাতে দিয়ে দ্রুত আগ বাড়লেন..

সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই.. মাগরিবের আজানের প্রস্তুতি চলছে.. পাড়ার মসজিদের মুয়াজ্জিন মাইক'এ একবার ফুঁ দিয়ে পরখ করে দেখলেন.. তবারক সাহেব বখ্‌শিবাজার বাসার কাছাকাছি চলে এসছেন তখুনি শ'খানেক কাক একযোগে কা কা চিৎকারে আকাশ মাথায় তোলার উপক্রম করলো.. কাছেই ডাস্টবিন.. কয়েকটি কাক মরা মুরগির নাড়ী-ভূড়ি ঠোটে নিয়ে ঝগড়া করতে করতে ইলেকট্রিকের তারের উপর বসে পড়েছে.. তবারক সাহেবের মনে হলো এখুনি বজ্জাত কাকগুলো ট্রান্সফরমার বার্স্ট করাবে.. আর অমনি শুরু হবে ফরিদার চেঁচামেচি..

তবারক সাহেবের বাসায় যাবার ইচ্ছাটা মরে গেছে.. তিনি উল্টা দিকে হাঁটা শুরু করলেন.. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করবেন ভাবলেন.. এই মূহুর্তে ক্ষিধাও বোধ হচ্ছে প্রচন্ড.. শহীদ মিনারের সামনে রাস্তা থেকে জামাই-বউ চানাচুর দিয়ে বানানো দশ টাকার ঝাল মুড়ি কিনছেন.. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস.. চারদিকে তরুণ যুগল দেখতে দেখতে তাঁর আবার মনে পড়ল ফরিদার কথা..'পরী'.. ব্যাপার টা মনে হলে কিঞ্চিত লজ্জা বোধ হয়.. বিয়ের পর আর কখনো তাকে পরী বলে ডেকেছেন বলে মনে পড়েনা..

প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়েছে.. তবারক সাহেব হাঁটছেন বাসার দিকে.. এখন আবার এশার আজান হবে মনে হচ্ছে.. বাসার চারদিকে অন্ধকার.. ইলেকট্রিসিটি নেই.. বাসার ভেতর থেকে টিমটিমে একটা আলো ঠিকরে আসছে.. আর যত কাছে যাচ্ছেন গোঙানির মত একটা কান্নার আওয়াজ স্পষ্ট হচ্ছে.. নিচতলা বাসা.. দরজা হাট করে খোলা.. বড় দুই মেয়ে মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে বিলাপ করছে.. ধীর লয়ে.. মাঝে গোঙানির মত.. ছোট মেয়েটাকে কোথাও দেখা গেল না.. কয়েকজন পড়শী মহিলা ও তরুণী বাসায়.. পাড়ার ফার্মেসিতে বসে বেনু ডাক্তার.. তিনিও আছেন.. তবারক সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে স্বর নামিয়ে বললেন.. 'ম্যাসিভ স্ট্রোক' পালস্ পাওয়া যাচ্ছেনা.. পড়শী এক ভাবি ফিসফিসিয়ে বললেন সুমনার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে.. এ নিয়ে চিন্তা করবেন না.. গেছে হয়ত কোনো বন্ধুর সাথে..

পরীর মুখটা এখনো চাদর টেনে ঢেকে দেয়া হয়নি.. তবারক সাহেবের মনে হলো অনেকদিন পর বুঝি পরী ঘুমাচ্ছে শান্তিতে .. রাজ্যের অবসন্নতা ভর করেছে তবারক সাহেবের দেহে .. তিনি হাতলওলা পুরনো কাঠের চেয়ারে দেহটাকে ছেড়ে রেখেছেন।

লেখক
আনোয়ার সেলিম
মহাপরিচালক
কাস্টমস এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম

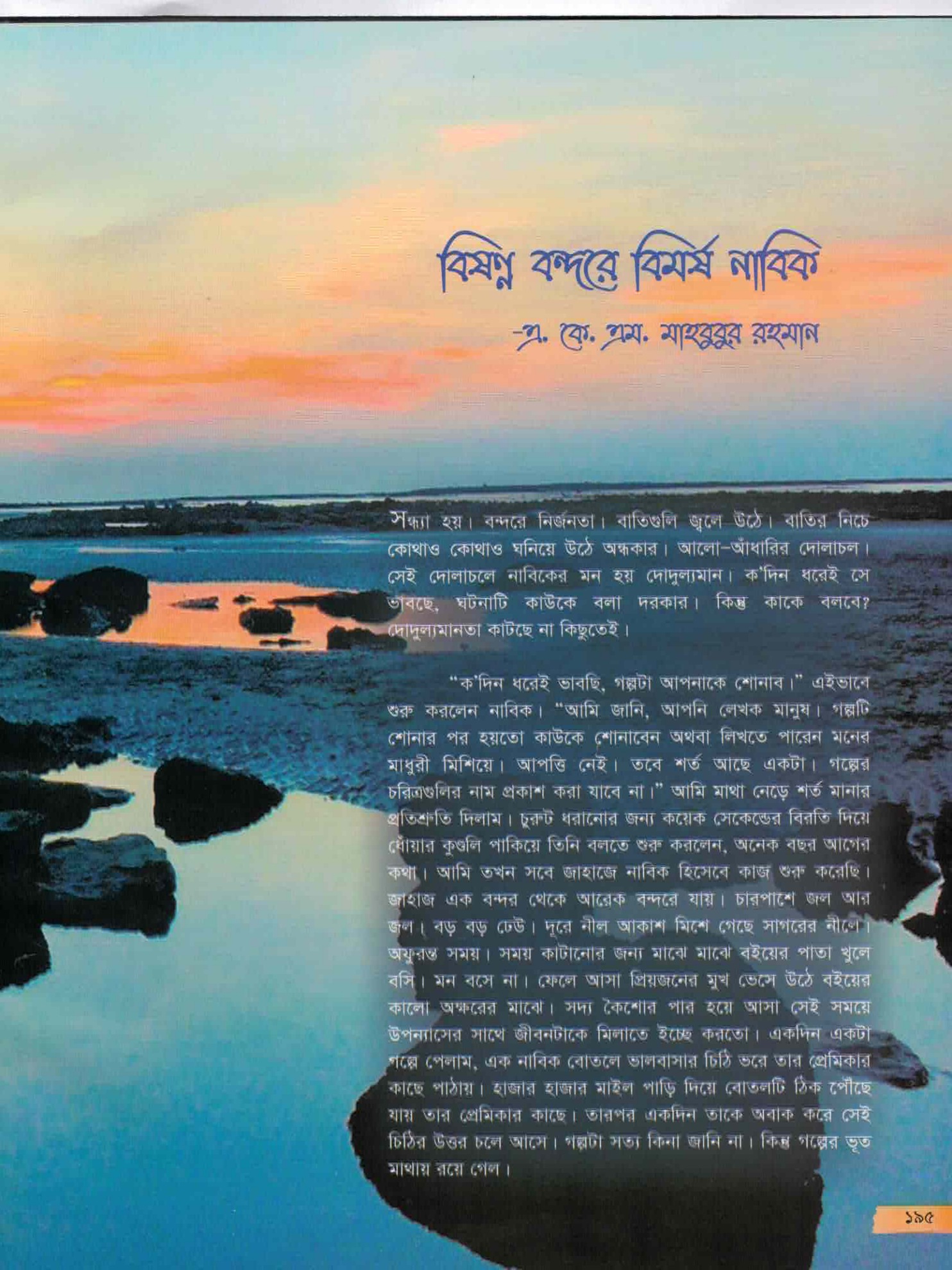

বিষণ্ন বন্দরে বিমর্ষ নাবিক

-প্র. কে. প্রম. মাহবুবুর রহমান

সন্ধ্যা হয়। বন্দরে নির্জনতা। বাতিগুলি জ্বলে উঠে। বাতির নিচে কোথাও কোথাও ঘনিয়ে উঠে অন্ধকার। আলো-আঁধারির দোলাচল। সেই দোলাচলে নাবিকের মন হয় দোদুল্যমান। ক'দিন ধরেই সে ভাবছে, ঘটনাটি কাউকে বলা দরকার। কিন্তু কাকে বলবে? দোদুল্যমানতা কাটছে না কিছুতেই।

"ক'দিন ধরেই ভাবছি, গল্পটা আপনাকে শোনাব।" এইভাবে শুরু করলেন নাবিক। "আমি জানি, আপনি লেখক মানুষ। গল্পটি শোনার পর হয়তো কাউকে শোনাবেন অথবা লিখতে পারেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। আপত্তি নেই। তবে শর্ত আছে একটা। গল্পের চরিত্রগুলির নাম প্রকাশ করা যাবে না।" আমি মাথা নেড়ে শর্ত মানার প্রতিশ্রুতি দিলাম। চুরুট ধরানোর জন্য কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, অনেক বছর আগের কথা। আমি তখন সবে জাহাজে নাবিক হিসেবে কাজ শুরু করেছি। জাহাজ এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যায়। চারপাশে জল আর জল। বড় বড় ঢেউ। দূরে নীল আকাশ মিশে গেছে সাগরের নীলে। অফুরন্ত সময়। সময় কাটানোর জন্য মাঝে মাঝে বইয়ের পাতা খুলে বসি। মন বসে না। ফেলে আসা প্রিয়জনের মুখ ভেসে উঠে বইয়ের কালো অক্ষরের মাঝে। সদ্য কৈশোর পার হয়ে আসা সেই সময়ে উপন্যাসের সাথে জীবনটাকে মিলাতে ইচ্ছে করতো। একদিন একটা গল্পে পেলাম, এক নাবিক বোতলে ভালবাসার চিঠি ভরে তার প্রেমিকার কাছে পাঠায়। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বোতলটি ঠিক পৌঁছে যায় তার প্রেমিকার কাছে। তারপর একদিন তাকে অবাক করে সেই চিঠির উত্তর চলে আসে। গল্পটা সত্য কিনা জানি না। কিন্তু গল্পের ভূত মাথায় রয়ে গেল।

একদিন একটা বোতল যোগাড় করে ফেললাম। পর পর তিন রাত জেগে চিঠি লিখলাম আমার কাল্পনিক প্রেমিকার কাছে । তাতে নিজের ঠিকানা যুক্ত করে ভাসিয়ে দিলাম অজানার উদ্দেশ্যে। খানিকটা উত্তেজনা এবং শঙ্কায়।

যেহেতু খুব বেশী কাজ ছিল না, তাই মাথায় বোতলটা ঘুরতে থাকলো। কার হাতে পড়তে পারে, কোন সুন্দরী নারীর হাতে, মনে মনে এটাই তো চাইছি। আবার ভাবি দুষ্ট কোন বালক বুঝি কুড়িয়ে পেল। সে হয়তো বিক্রি করে দিল কারো কাছে। অথবা নদীর পাড় ঘেঁষে এক সময় গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেল।

সময় পাল্টাতে থাকে। আস্তে আস্তে শুরু হলো সব শিখে নেবার পালা, কারণ জাহাজের নোঙ্গর গোটানোর সময় হয়ে আসছে। বোতলটা সেই সাথে সরে যেতে থাকলো। কাছের সমুদ্রের ঢেউ সেটাকে আরো দূরে পাঠাতে থাকলো। তবে আমার স্মৃতিতে বোতলটাকে মাঝে মাঝে উঁকি দিতে দেখতাম। যেন সে উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে, আরো দূরে।

জাহাজের চিঠি হেড অফিসে আসে। যখন যে সেখানে যায়, সেই চিঠি নিয়ে আসে। আমারই বন্ধু হয়ে উঠা এক সহকর্মী একদিন একটা চিঠি নিয়ে এল, সুন্দর হাতের লেখাটা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। কারণ লেখাটা অপরিচিত। হাতের লেখাটা যেন একটা তাজা হাওয়া বয়ে আনলো। তাতে একটা নোনা গন্ধ আছে, বন্ধুটিও তা উপলব্ধি করছিল। দ্রুত চিঠিটা খুললাম।

বেশ সুন্দর একটা নীল কাগজে সুন্দর হাতের লেখায় একটা চিঠি। ছোট্ট এবং গোছানো লেখা। "বান্ধবীদের সাথে সৈকতে বেড়াতে এসেছিলাম। সেখানেই আপনার বোতলটি কুড়িয়ে পেলাম। যেহেতু আমি কুড়িয়ে পেয়েছি, তাই বান্ধবীরা আমাকে জোর করতে লাগল যেন, আমি এই চিঠির উত্তর দেই। তাই আপনাকে লিখছি, এসব বিষয় গল্প-কাহিনীতে ভালো মানায়, বাস্তবে না, ভাল থাকবেন।"

চিঠিটা পাওয়ার সাথে সাথে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বাকি সব কিছুই যে ধোঁয়াশা, নাম নেই, ঠিকানা নেই। নিজের সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নেই। উপায় বর্ণনা করল আমার বন্ধুটি। সে খামটাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বলল, এটা যে একটা কম বয়েসী নারীর চিঠি এতে কোন সন্দেহ নেই । সম্ভবত সে কলেজে পড়ে এবং চিঠিটা এই শহর থেকেই পোস্ট করা হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি তো দেখি ফেলুদা হয়ে গেছ, কিভাবে বুঝলি?

প্রথমত যদি ছেলে হত, তাহলে সে মেয়ে হিসেবে নিজেকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলত। হাতের লেখা এবং চিন্তা খানিকটা পরিণত হত । ধারণা করা যায়, সে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। যেহেতু সে লিখেছে, বান্ধবী সহকারে সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিল, তাই ধরে নিচ্ছি তার কলেজের ছাত্রী হবার সম্ভাবনা বেশী। আর চিঠিতে প্রেরকের ডাকঘর এবং চিঠি পাওয়ার সময়টা হিসেব করলাম, তার সাথে যোগ করলাম এই শহরের সৈকতকে, তাতে পাওয়া গেল একটা কোমলমতি এবং সুন্দরী নারী।

আমি বললাম, কিন্তু তাকে পাবো কোথায়? সে বলল, কেন এই চিঠির মধ্যে। অস্থির হয়ো না বন্ধু, সে অনেক ভাবনা চিন্তার পর এই চিঠি লিখেছে। নারীর চিত্তে তোমার বোতল খানিকটা নাড়া দিয়েছে, সবুরে মেওয়া ফলে, শীঘ্রই আরেকটি চিঠি না আসলে একটু অবাকই হবো।

যদিও ঘড়ির কাঁটা থমকে যাবার উপক্রম হল প্রায়, তবে বন্ধুর কথা ফলে গেল। সেই নীল কাগজে আরেকটা চিঠি এল।

ছোট্ট কিন্তু একটা বিশাল আশা জাগানিয়া চিঠি।

"আপনার লেখাটায় মাঝে মাঝে উঁকি দেই, বড্ড জানতে ইচ্ছে করে আপনি কি ভালবাসার মানুষটিকে খুঁজে পেলেন"।

আমার বন্ধু বলল, "সবুরে মেওয়া ফলে, তোর জীবনে প্রেম ফলবে"। কিন্ত ঠিকানা তো জানি না, একটা অস্থিরতা ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল। বন্ধুটি বলল, জনাবের হাল তো সুবিধার না, তবে অন্যপ্রান্তে প্রেমের কুসুম ফুটলো বলে। লুকাতে পারবে না।

জাহাজের নোঙ্গর তোলার সময় হয়ে আসছে অথচ জানা হল না, কে সে?

বন্ধুটি যেন প্রেমের বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের সমুদ্র। সে বলল, ঐ মেয়ে তোর সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজ নিয়েছে, কিন্তু এখনই নিজেকে ধরা দিতে চায় না। শেষে উচ্চারণ করল "প্রেমের ফাঁদ পেতে ভুবনে কখন কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে?"

আমি তাকে ব্যাকুল হয়ে শুধালাম, তুই যদি মাথা ঘামাস, তাহলে হয়তো তার পরিচয় বের করে ফেলতে পারবি। বন্ধুটি অট্টহাসি দিয়ে বলল, প্রেমের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর চেয়ে হৃদয় ঘামানো উত্তম। নারীর মনের জাহাজ তোর মনের বন্দরে ভিড়েছে, কাজেই চিন্তা করিস না, চিঠি আসতেই থাকবে।

এক বুক হতাশা নিয়ে বন্দর ছাড়লাম। বন্ধুর কথা ঠিক প্রমাণিত হলো, জাহাজ কোম্পানির হেড অফিসে চিঠি আসতো, কোম্পানি সেই চিঠি পাঠিয়ে দিত বন্দরে। যেখানে আমি খাম খুললেই একটা নীল সমুদ্র পেতাম, যার গভীরতা আমাকে ছুঁয়ে যেত।

আমি তার নাম দিয়েছিলাম অধরা। আমি যেন তার অনেক পরিচিত, চিঠিতে সেই কথা লেখা থাকলেও, সেখানে তার সম্বন্ধে তেমন কিছুই লেখা থাকতো না। তাকে মনের কথা বলবার বা লেখবার কোন উপায় সে রাখেনি, কিন্তু আমি নিজে একটা উপায় বের করে ফেলেছিলাম। তার চিঠি পেলে আমি পড়তাম আর নিজে যেন লিখছি এভাবে নিজেকে উত্তর দিতাম।

একটা চিঠিতে সে লিখেছিল, "তোমাকে আমি দেখেছি, তাতে তোমাকে অনেক মোটাতাজা দেখাচ্ছিল, তুমি অনেক ওজনদার।" অস্ফুট উচ্চারণ করতাম "আমি এখন আমার ওজন অনেক কমিয়ে ফেলেছি।" সে লিখেছিল, তুমি বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াও, আমি খুব ভয়ে থাকি, অচেনা বন্দরে অচেনা সুন্দরীর মুখ দেখে যদি সব ভুলে যাও।

আমি বলতাম, "হায়, তুমি যদি আমার মনটাকে বুঝতে পারতে।" আয়নার সামনে নিজের প্রতিবিম্বকে বলতাম। অথবা অধরা নামের একটি মেয়েকে, যে আমার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠত। আমি জানতাম, সে আসলে একটা শঙ্কায় থাকে। সেই কারণে ঠিকানা দিতে চায় না, কিন্তু আমার সেই বোতলের লেখাটার কথা তার চিঠিতে বারবার ফিরে আসে।

জাহাজ আবার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিল, ঘরে ফেরার তাড়া এবং চিঠি না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে দিনগুলো কাটতে লাগলো। কিন্তু জানতাম না দেশের বন্দরে পা দেবার সাথে সাথে একটা বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

হেড অফিসে একটা প্যাকেট । প্যাকেটে ছিল একটা চিঠি আর একটা বোতল, যে বোতলটায় ভরে আমি সেই লেখাটা পাঠিয়েছিলাম। সেই একই নীল কাগজে একই হাতের লেখা, "যে আমি চিঠি লিখছিলাম, সে আমি এক পুরুষ। আমার মনে হচ্ছে আমি আসলে আরেকজন মানুষের অনুভূতি নিয়ে খেলেছি, তাই সব ফিরিয়ে দিলাম, ক্ষমাপ্রার্থী।"

আমার ছুঁড়ে দেওয়া তীর যেন আমাকেই বিদ্ধ করল। আমার বন্ধু চিঠিটা পড়ে গম্ভীর হয়ে গেল। আমার ভেঙ্গে পড়া চেহারার দিকে তাকিয়ে, সে বলল, আমি এই চিঠির লেখককে খুঁজে বের করব। এদিকে বাসা থেকে ফোন এল বাবা ভীষণ অসুস্থ । আমি বাধ্য হলাম চলে যেতে, আমার বন্ধু অধরাকে খুঁজে বের করার জন্য রয়ে গেল।

বাবা সুস্থ হওয়ার পর যখন ফিরে এলাম, আমার বন্ধু জানালো, সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে, এটা একটা ছেলে। কিন্তু আমি তার চোখ দেখে বুঝলাম, সে মিথ্যা বলছে।

নাবিক চুপ হয়ে গেলেন। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারে বোতলটা যেন জ্বলে উঠছে। একটা অনেক পুরানো বোতল।

গল্পটার শেষটা অধরাই থেকে গেল। তার কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম, তিনি কোন কথা বললেন না। যেন সেই সময়ে তিনি আবার ফিরে গেছেন।

আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, আর গল্পের শেষটা ভাবছিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙল, স্যার কিছু লাগবে নাকি। বুঝলাম সেই এলাকার কাছে চলে এসেছি, যে এলাকায় ভালোবাসা কেনাবেচা হয়। মাথা নাড়তেই একটা ভাবনা বিদ্যুৎ-এর মত মাথায় এসে আঘাত হানল।

আমি এই গল্পের শেষটা সাজানোর চেষ্টা করলাম। একটা মেয়ে যে হয়ত এই অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, হিসাবটা ঠিক মিলল না।

তবে এ রকম হতে পারে যে, এরকম কোন অন্ধ গলিতে জন্ম নেওয়া এক মেয়ে, যাকে তার মা এসবের থেকে দূরে রাখতে চায়, সে-ই কি চিঠিগুলো লিখেছিল? একদিন মেয়েটা আবিষ্কার করল, তার জীবন ইতিহাস। সে বুঝতে পারল, তার জীবনও একদিন হারিয়ে যাবে অন্ধকারে।

এই ভাবনার পর আমি আর গল্পের শেষটা খোঁজার চেষ্টা করলাম না। আমি জানি সেই নাবিকও আর তা খোঁজার চেষ্টা করেনি। কারণ হয়ত সে জানত, তাতে একটা সমুদ্র আবিষ্কার হবে, যার পুরোটাই নোনাজলে লেখা।

লেখক
এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর

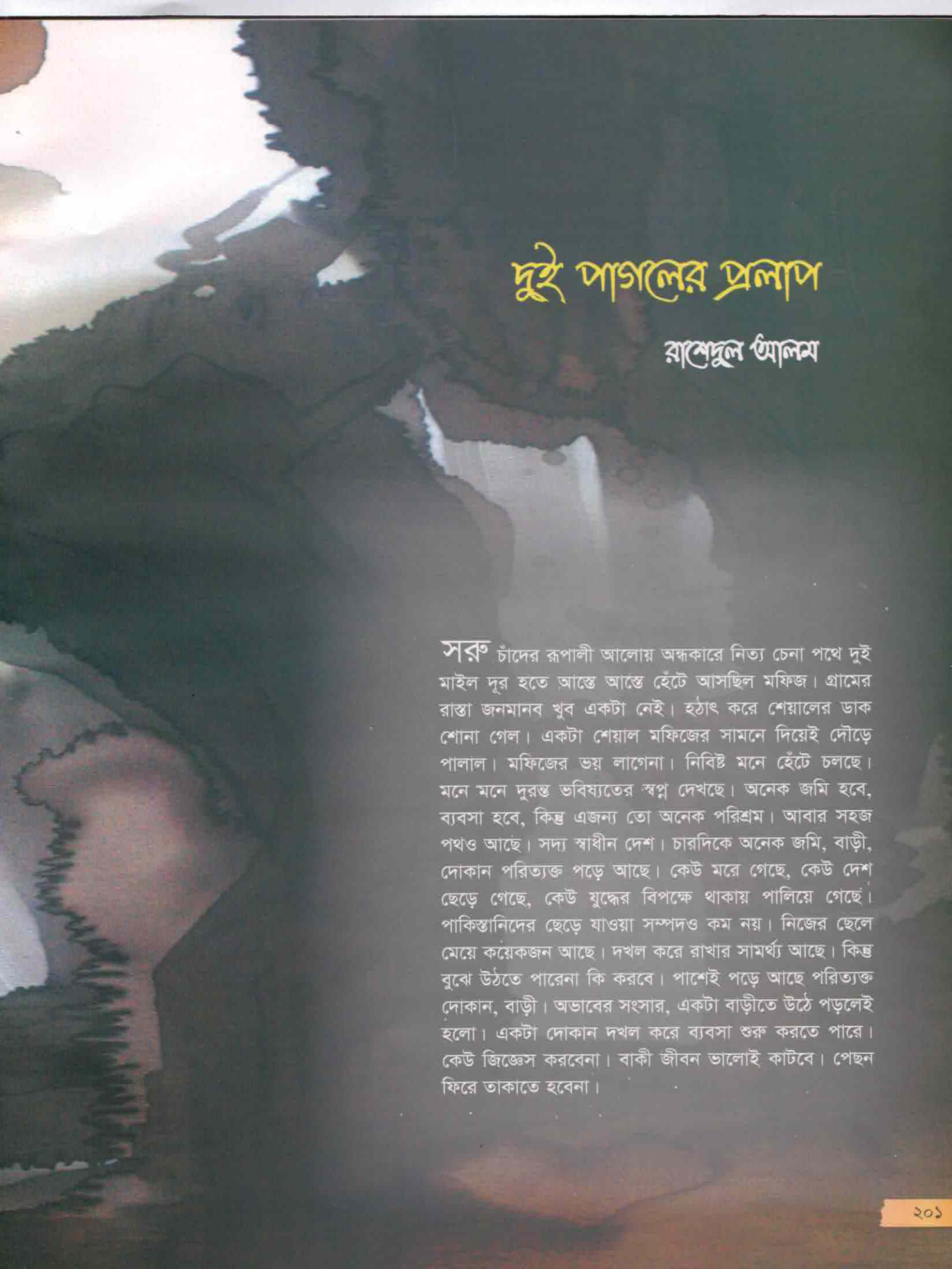

দুই পাগলের প্রলাপ

রাশেদুল আলম

সরু চাঁদের রূপালী আলোয় অন্ধকারে নিত্য চেনা পথে দুই মাইল দূর হতে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল মফিজ। গ্রামের রাস্তা জনমানব খুব একটা নেই। হঠাৎ করে শেয়ালের ডাক শোনা গেল। একটা শেয়াল মফিজের সামনে দিয়েই দৌড়ে পালাল। মফিজের ভয় লাগেনা। নিবিষ্ট মনে হেঁটে চলছে। মনে মনে দুরন্ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। অনেক জমি হবে, ব্যবসা হবে, কিন্তু এজন্য তো অনেক পরিশ্রম। আবার সহজ পথও আছে। সদ্য স্বাধীন দেশ। চারদিকে অনেক জমি, বাড়ী, দোকান পরিত্যক্ত পড়ে আছে। কেউ মরে গেছে, কেউ দেশ ছেড়ে গেছে, কেউ যুদ্ধের বিপক্ষে থাকায় পালিয়ে গেছে। পাকিস্তানিদের ছেড়ে যাওয়া সম্পদও কম নয়। নিজের ছেলে মেয়ে কয়েকজন আছে। দখল করে রাখার সামর্থ্য আছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনা কি করবে। পাশেই পড়ে আছে পরিত্যক্ত দোকান, বাড়ী। অভাবের সংসার, একটা বাড়ীতে উঠে পড়লেই হলো। একটা দোকান দখল করে ব্যবসা শুরু করতে পারে। কেউ জিজ্ঞেস করবেনা। বাকী জীবন ভালোই কাটবে। পেছন ফিরে তাকাতে হবেনা।

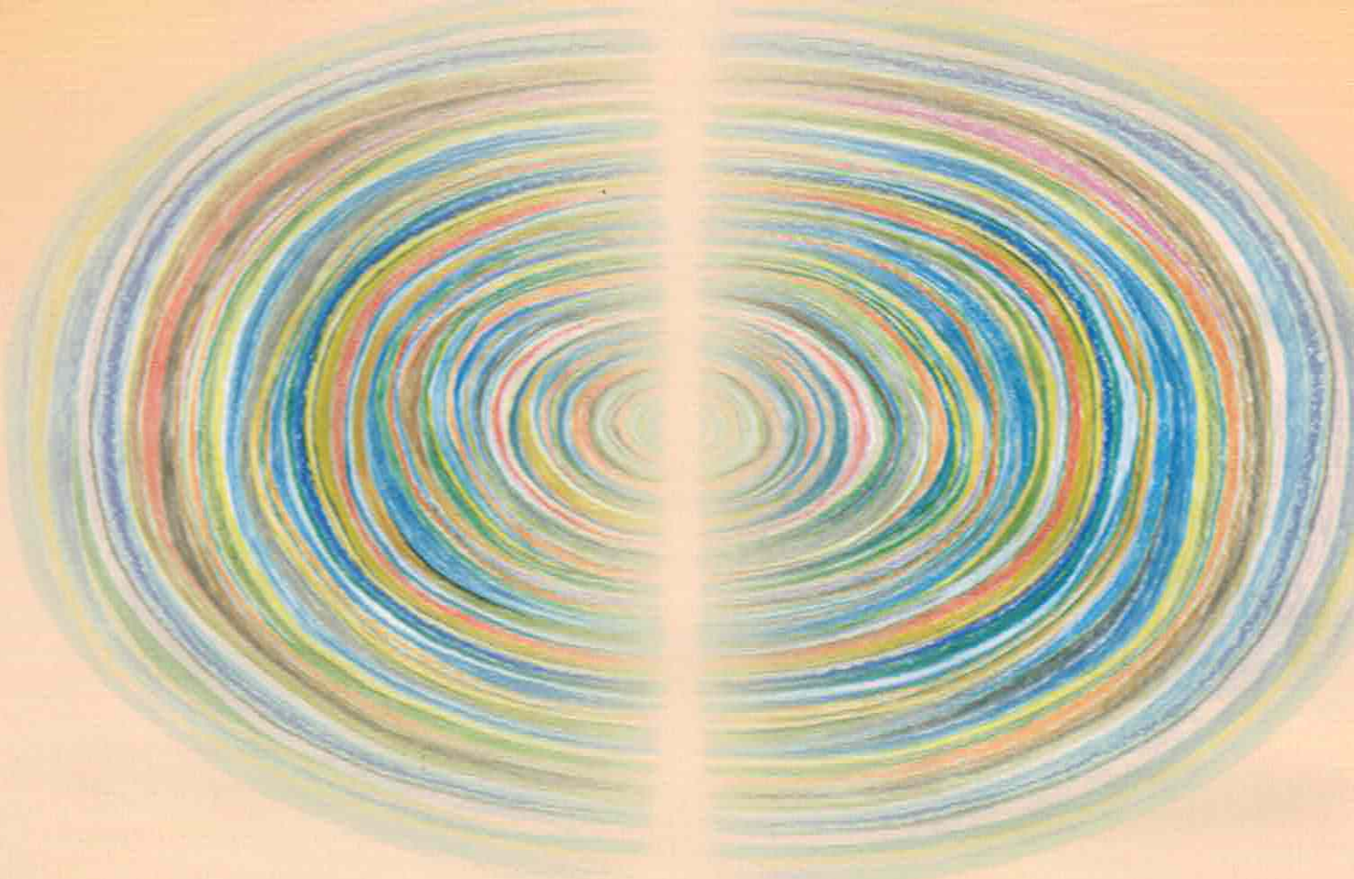

নিজের বংশ নিতান্ত খারাপ নয়। দাদা সুদূর ভারত হতে ফাজেলে দেওবন্দ। বাবা ছিলেন পন্ডিত, সমাজে প্রতিপত্তি কম নয়। ভাল ও ন্যায়নিষ্ঠ বলে গ্রামের দু'একটা সালিশ করে; মানুষ মানেও। মায়ের বংশও ভালো, সম্ভ্রান্ত, সহজলভ্য সম্পদ হৃদয়ে ঝিলিক মারলেও মন সায় দেয় না। একদিকে কষ্টকর দারিদ্র আরেকদিকে সহজলভ্য সম্পদের হাতছানি মফিজের জীবন ও মনের বাস্তবতা।

ভাবতে ভাবতে মফিজ দূরের হাট দেখতে পায়। হাট তো নয় ছোট কয়টা নারকেল পাতার ছাউনি। সন্ধ্যার পরে খুব একটা খোলা থাকেনা। মানুষজনও নেই। মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। হাটের পড়ে থাকা জিনিসের উপর তাদের অশেষ অধিকার। সে খাবার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। কুকুরের সাথে কে লাগবে। সবাই পাশ কাটিয়ে যায়। বেখেয়ালী মফিজ মাঝে মাঝে যুদ্ধ শেষের পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে নতুন যুদ্ধে নামা মানুষের সাথে কুকুরগুলোকে মিলিয়ে ফেলে। কিন্তু সুবোধ মফিজ ভাবে মানুষ কুকুর হতে যাবে কেন ? তার ধারণাই ভুল।

মফিজ জোর কদমে হেঁটে যায়। বাড়ী ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি; নইলে বউয়ের বকুনি খেতে হবে। সাথে ঠাণ্ডা ভাত। আলো খুব একটা নেই। হয়তো দুই চার দিনের নবীন চাঁদ আকাশে উঠেছে। কোন কিছু ঠিকমতো বোঝা যায়না। এ সময়ে চাঁদের যতটা আলো থাকার কথা ততটা আলো নেই। মফিজ একবার ভাবছে চন্দ্র-গ্রহণ লাগলো নাকি। পরে নিজের বোকামির জন্য নিজেই লজ্জিত হয়।

দারুণ একটা শীতের পরে দখিনা বাতাস আসছে। মনে বেশ ভালো লাগছে। বাসায় ফিরছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় নিজের চাদরটা উড়ে গেল। মফিজ ভয় পেয়ে যায়। এ সময়তো ঝড়ো হাওয়া আসার কথা নয়। নির্মল ফাগুন বাতাস থাকার কথা। তবে কী কোন জ্বিন-ভূতের আসর। মফিজ ভয় পেলেও কিছু বলেনা। সদ্য স্বাধীন দেশের ফুরফুরে মেজাজের সাহসী মানুষ।

হঠাৎ কুঁড়েঘরের কোণ থেকে আসা শব্দে চমকে উঠে মফিজ। ভাবে কোন কুকুরে কুকুরে যুদ্ধ। পরমুহূর্তে মানুষের শব্দ শুনতে পায়। চিনতে পারে পাগল দুটোকে। এই হাটে কুকুরদের মতো দুটো পাগলও থাকে। মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। কিন্তু আজ রাতের ঝগড়া মফিজকে চমকিত করে। উৎসুক মফিজ তাদের ঝগড়া মিটাতে যায়। দূর হতে মফিজ শুনে একজন আরেকজনকে পাগল বলে গালি দিচ্ছে। মফিজ হাসে। এক পাগল আরেক পাগলকে পাগল বলে গালি দিচ্ছে। পাগলের কোন বুদ্ধি জ্ঞান নাই।

মফিজ দুই জনকেই চিনে। পাগলামির জন্য বাড়ী হতে বিতাড়িত। জামা নাই, খাবার নাই, হাড়ি পাতিলেরও বালাই নাই। মফিজ মন দিয়ে ঝগড়া শোনে। বড় কোন ঝগড়া নয়। জমি দখল নয়, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল নয়, কোন গাড়ি, বাড়ী, নারী বা অলংকারের দ্বন্দ্ব নয়। নিতান্ত উচ্ছিষ্ট কয়টা ভাত নিয়ে ঝগড়া। যেমন পাগল তেমন তার ঝগড়ার বিষয়ও নিতান্ত তুচ্ছ। না জবরদস্তি করে কেউ কারো জিনিস নিতে চাচ্ছেনা।

ঘটনা খুব বড় নয়। কাসু পাগলার কাছে কিছু উচ্ছিষ্ট ভাত আছে। সন্ধ্যায় খানদের মেয়ের বিয়ে থেকে এনেছে। দাওয়াত খাবার সৌভাগ্য হয়নি। পাগলের সাথে বসে কোন অতিথি খাবার খাবেনা। দেশ স্বাধীন হলেও জাত তো স্বাধীন হয়নি। তারপরেও গিয়েছিলো; সবাই তাড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা বৃদ্ধ খান সাহেবকে কষ্ট দেয়।

তিনি কাশেমকে বললেন, 'সন্ধ্যায় এসো, থাকলে কিছু দিবো'। সন্ধ্যায় গেছিল, কিন্তু কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কলা পাতায় করে উচ্ছিষ্ট ভাতগুলো নিয়ে এসেছে। রাতে খাবে বলে। একটা দুটা মরিচ নিশ্চয়ই হাটে কুড়িয়ে পাওয়া যাবে। সাথে খোদার দেয়া পানি দিয়ে মাখিয়ে নেয়া যাবে। ক্ষুধা থাকলে তরকারি লাগেনা। ভাত পানিতে পেট পুরে যায়। সে নজু পাগলাকে কিছু ভাত দিতে চায় কিন্তু নজু নিতে রাজী নয়। ভাত নিয়ে নজু পাগলার সাথে তার ঝগড়া।

নজু পাগলা একটু চালাক চতুর। দুনিয়াদারী বুঝে। সেও গেছিলো বিয়ে বাড়িতে খাবার তারও জোটেনি। তবে সে কাসুর মতো নয়। সবাই তাড়িয়ে দিলেও সুযোগ বুঝে দুইটা মুরগির রান ঠিকই চুরি করে নিয়ে এসেছে। নজু পাগলা কাসুকে খালি পানি দিয়ে ভাত খেতে দেখে বলে উঠল, 'তোর কাছ থেকে আমাকে অর্ধেক ভাত দে, আর আমার কাছ থেকে একটা মুরগির রান নে, দু'জনেরই মুরগি ভাত খাওয়া হবে।'
কাসু মানতে নারাজ। সে পাল্টা নজুকে বলে, 'তোর মুরগি তুই খা। আমি খাবনা। তোকে আমি এমনিতেই ভাত দিচ্ছি। কিন্তু আমি মুরগি নিবোনা।'

'তুই একটা আস্ত পাগল' - কাসু ক্ষোভের সাথে বলে উঠে। 'নিজের ভালো পাগলেও বুঝে তুই বুঝিসনা।' নজুর কণ্ঠে উপহাসের উত্তাপ।

কাসুও কম যায় না।

সে বলে, 'লোকে এমনি এমনি তোকে পাগল বলে। তুই জাতে মাতাল তালে ঠিক। তুই মুরগি চুরি করে আনচিস। এখন আমাকে দিয়ে হালাল করতে চাস। তোর চালাকি আমি বুঝিনা?' চোর বলাতে নজুর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে; সে কাসুকে মারতে যায়। কাসু বলতেই থাকে,

'আমার ভাই চেয়ারম্যান। কালকে যখন সবাই জানবে আমি চুরি করা মাংস খেয়েছি তখন তার সম্মান কোথায় যাবে।'

নজু পাগলা জবাব দেয়, 'মানুষ কিভাবে জানবে ? ক্ষুধা মিটালে সম্মান কিভাবে যায় ? তোর ভাই চেয়ারম্যান। তোর খাবার নেই। এতে কি তার সম্মান যায়না ?'

কাসু সাফ জানিয়ে দেয়, 'সেটা আমার আর ভাইয়ের ব্যাপার। তোর চুরি করা মুরগি আমি নিবনা।

নজুও কম যায় না, 'আরে পাগল, তুই ভাবলি কি করে, মুরগি না নিলে তোর পঁচা ভাত আমি নিব'

দুই পাগলের কেউ কাউকে বুঝাতে সক্ষম হয়না। ঝগড়া চলতেই থাকে।

হতভম্ভ মফিজ দাড়িয়ে থাকে। দুই পাগলের চেঁচামেচিও চলতে থাকে। মফিজ ভাবে পাগল না হয়ে মানুষ হলে তাদের বাক্য বিনিময় ঝগড়া, বুদ্ধিজীবী হলে বিতর্ক, আর রাজনীতিবিদ হলে বক্তব্য বলা যেতো।

মফিজ চলে আসে; ভাবে কাসু ঠিক কিন্তু নজুই জিতবে। ক্লান্তির ঘুমে কাবু হয়ে যাবে কাসু। ভবিষ্যত নজুর। ভবিষ্যতের অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপে মফিজের।

এক পাগল বদনামের ভয়ে চুরির ভাগ নিতে চায়না। এমনকি চোরের সাথে বিনিময়ও করতে চায়না। আরেক আত্মমর্যাদাবান পাগল চুরির জিনিসের ভাগ না নিলে কোন দান নিতে চায়না। একেই বলে পাগল। মফিজ মনে মনে হাসে-পাগলের ন্যায়যুদ্ধ দেখে।

মফিজ ব্যর্থ। পাগলদের কোন সমাধান সে দিতে পারেনি। লজ্জিত মফিজ বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। স্ত্রী ঘুমিয়ে গেছে। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। প্লেট ধুয়ে খেতে হবে।

আকাশে চাঁদের আলোও বুঝি কমে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে মফিজ ভেবে পায় না; কোন পাগল ঠিক বলছে ? চিন্তার মধ্যে পথও যেনো শেষ হয়না।

লেখক
মুহাম্মদ রাশেদুল আলম
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

ঘোর

বাবুল ইকবাল

এক.

১৯৭১ সালের মে মাস।

ঠিক এখানে থেকে প্রায় এগার মাইল দূরে পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাম্প বসেছে। এদিকটায় এখনো তারা আসেনি। শোনা যাচ্ছে এ গ্রামে একটা সাব-ক্যাম্প বসবে। শহর থেকে আসা লোকজনের আশ্রয় বেড়েছে এখানে। মধুমতি নদীর তীর ঘেঁষে গ্রামটিতে সন্ধ্যার পর থমথম করে। দূরে বহু দূরে কান পাতলে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। পাকহানাদার বাহিনীর চেয়ে আপাতত বড় আতঙ্ক মধুমতির ভাঙ্গন। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নদীটা গ্রাস করে নিচ্ছে সবকিছু। ফসলি জমি, তালগাছের সারি, বাঁশঝাড়, কবরস্থান, টিনেরচালার মসজিদ সবকিছু হুমকির মুখে। ইতোমধ্যে অনেক ফসলি জমি, তালগাছের অর্ধেক, বাঁশঝাড়ের কিছু অংশ নদীতে খেয়েছে। কবরস্থানটি ছুঁই ছুঁই।

গ্রামের কবরস্থান। সর্দারপাড়া, চৌধুরীপাড়া, চরপাড়া, মোলাপাড়া এই চার পাড়ার এক কবরস্থান। এক পাড়ার সাথে অন্য পাড়ার চিরদ্বন্দ্ব থাকলেও এই একটি ব্যাপারে তারা একমত- কবরস্থান পাড়ায় পাড়ায় না হয়ে গ্রামবাসীর জন্য একটি কবরস্থান থাকবে; লোকালয় থেকে একটু দূরে নদীর উত্তর পাড় ঘেঁষে। জীবিত থাকতে লাঠালাঠি হলেও মৃত্যুর পর অন্ততঃ মাটামাটি হয়ে শান্তিতে

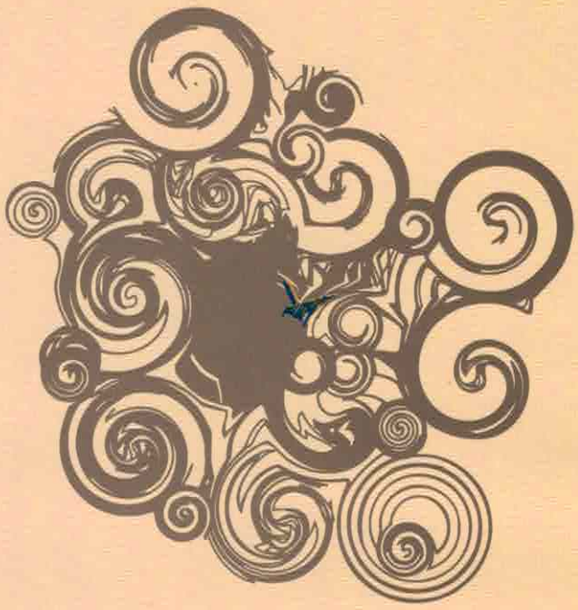

রাত তখন এগারোটা। এত রাতে গ্রামের সকলে ঘুমিয়ে শ্মশান। শহর থেকে যারা এসেছে তারাও ক্লান্ত শ্রান্ত। কেবল পাড়ায় পাড়ায় গঠিত তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের দল খড়ের গাদার পাশে আলো জ্বেলে রাত জাগছে। চার পাড়ার মাতব্বরেরা একটি বিষয়ের সুরাহা করতে জমায়েত হয় ফজল মাস্টারের বাড়ীতে। বৈঠকখানার পাশে খোলা উঠানে মাদুর পাতা হয়েছে একটু আড়াল করে। উঠানে সিঁদুরে আমগাছ, আষাঢ়ে আমগাছের দীর্ঘ ছায়া। সপ্তমীর মরা চাঁদের আলোয় লোকগুলোর আতঙ্কিত মুখ বোঝা যাচ্ছে না। ফসল ফলার খুঁটির দীর্ঘ ছায়া পড়েছে উঠানে। কারোর মুখে কোন কথা নেই। এতগুলো জোয়ানপুরুষ এক উঠানে জমায়েত হওয়া খুব বিপদ। ফজল মাস্টার বারান্দায় জ্বালানো কুপিটা নিভাতে বলে। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। আষাঢ়ে আমগাছের উপর থেকে একটা শুকনো ডাল খসে পড়ে। হঠাৎ যেন আম বাগানটা অন্ধকারের ভিতর কেঁপে উঠে। কেঁপে উঠে উঠানে জমায়েত মানুষগুলো। একটা শুকনো ডাল, একটা শুকনো পাতার পতনের শব্দও মনে হচ্ছে শত্রুর রাইফেলের অতর্কিত আক্রমণ। সবাই মুখ নিচু করে বসে। ফজল মাস্টার চোখ তুলে চারিদিকে একবার চেয়ে নিচ্ছেন।

রহমত খাঁ হু হু করে কেঁদে উঠে–

সর্তক হরিণের মত সবাই তাকায় সেদিকে।

–গাঙ্গের পেটে ফসলি জমি সবটুকু চলে গেছে আমার। এবার ভিটেটুকুও থাকবে না। নদী আর দশ কদম দূরে। আমি কোথায় যাব? বেবাক মুরুব্বির কাছে আমার আর্জি। নদীরে ঠেকাও। তোমরা নদীরে ঠেকাও। নইলে আমার দেশ ছাড়তে হবে। এই যুদ্ধের ডামাডোলে আমি কই যাবো? সাত–আট জনের সংসার নিয়ে আমি কই যাব? তোমরা কও। পাশ থেকে একজন রহমত খাঁ'র মুখ চেপে ধরে। 'আস্তে কথা কও মিয়া। রাত হইছে। আস্তে একটা কাশ দিলে দুই গ্রাম দূরে শোনা যায়। তুমি দেখি কান্নাকাটি শুরু করছো।'

সমবেত মুরুব্বিদের পিছনে বসা এক যুবক হাত তোলে। খুক করে একটা কাঁশি দিয়ে সে নরম কণ্ঠে বলে–আমি কিছু বলতে চাই। ফজল মাস্টার মাথা নেড়ে তাকে সম্মতি দেয়।

–কাল সন্ধ্যার পর আমি নদীর ধার ধরে বাড়ি ফিরছিলাম। রাতের আবছা আলোয় দেখি, কে একজন ভাঙ্গনের উপর বসে আছে। ইয়া বড় চাঁই। লোকটার পিছনে মাটির দীর্ঘ ফাটল দূর থেকে অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নদীতে তখন জোয়ারের পানির তুমুল বেগ। কাছে যেয়ে দেখি রতন মাঝি। ফাটলের একপাশে দাড়িয়ে জোরে জোরে হাকলাম–'ও মাঝি, লাফ দিয়ে উঠে আস এক্ষুণি। মাটির নিচে পড়বা। জোয়ারের জলে ভেসে যাবা। তাড়াতাড়ি উঠে আস।'

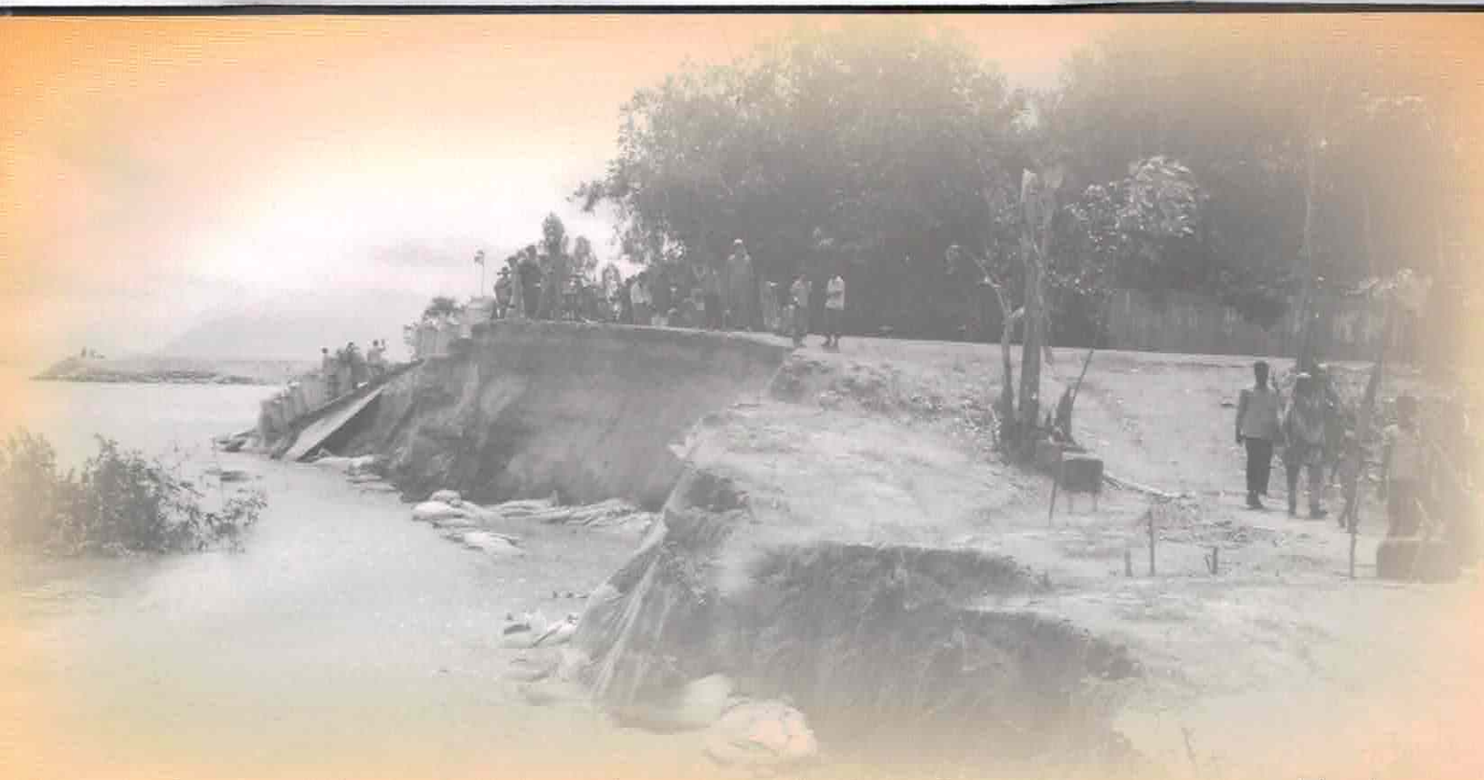

রতন মাঝি তখনো নির্বিকার। আমি এক লাফে ছোঁ মেরে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। বাহু ধরে কোনো রকম পাড়ে উঠাতেই চাঁইটা পা'র নিচ থেকে সরে গেল। বিশাল এক মাটির চাঁই হুড়মুড় করে ঢলে পড়লো কালো জোয়ারের স্রোতের কোলে। আমরা জড়াজড়ি করে ধূলায় লুটায়ে পড়ি। রতন মাঝি মুখ তুলে বলে– 'আমি শঙ্খের ডাকে এখানে আসছি। আমারে উঠালি ক্যান। শঙ্খের ডাক শোন। ঐ যে এক দূর থেকে আমারে ডাকতেছে।' রতন মাঝি মূহুর্তের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে 'শুনতে পাচ্ছিস? দূর থেকে শঙ্খের ডাক' আমি বললাম– 'মাঝি, এ তো গাঙ্গের ফাটলে বাতাসের আওয়াজ। শঙ্খ কোথায়?'

মুরুব্বিগোছের একজন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল– 'দীর্ঘ কথা বাদ দাও। আসল কথাটা বল।' যুবক কথা থামিয়ে আবার কথা শুরু করে। আসল কথাটা হলো রতন মাঝি তারপর থেকে জ্বরে পড়ছে। এখন মর মর অবস্থা।
মুরুব্বিগোছের লোকটি বিজ্ঞের মত বলে– 'জ্বরে পড়বে না... যুদ্ধ লাগার শুরু থেকে তার নাওটি আর জলে ভাসেনি। পানির নিচে ডুবিয়ে রেখেছিল। গতকাল শোনা গেছে নদী ভাঙ্গনে তার নাও জোয়ারে ভেসে গেছে।' উপস্থিত জমায়েতের মধ্যে কে একজন আক্ষেপ করে– আহারে বেচারা...

চৌধুরীপাড়ার একজন দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইছিল। ফজল মাস্টার থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'নদী ভাঙ্গনের দূরদশার কাহিনী শুনতে গেলে হাজার রাতেও শেষ হবে না। আমরা বসছি একটা বিহিত করার জন্য। দূরদশার কাহিনী শোনার জন্য নয়।'

একে একে সকলের মতামত নিয়ে শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হলো নদী ভাঙ্গনের পরও অবশিষ্ট যে বাঁশঝাড় আছে তাই দিয়ে এছাড়া অন্যান্য বাড়ীর আশেপাশের বাঁশ দিয়ে নদীতে বাঁধ দেওয়া হবে। যাদের বাঁশ নেই তারা শরীরে খাটবে, বাঁশের পাশাপাশি মাঝারি আকারের গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করা হবে। আপাতত উপশমের জন্য কোথাও কোথাও কলাগাছের কান্ড আড় করার প্রয়োজন হবে।

বাঁধের ব্যাপারে একমত হলেও বাধ সাধে যুদ্ধ। এ গ্রামের এদিকটায় পাকহানাদার বাহিনী এখনও আসেনি। কিন্তু যে কোনসময় এসে যেতে পারে। শোনা যাচ্ছে এ গ্রামেরই সন্তান পঞ্চাশোর্ধ বয়স ডাঃ বদরুল আমিন পাকমিলিটারীর সাথে হাত মিলিয়েছে।

দুই.

একদিকে দেশ হারানোর ভয় অন্য দিকে ভিটে। দেশের বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আগ্রাসী পাকহানাদার বাহিনী। সর্বগ্রাসী নদীটা একটু একটু করে গিলে ফেলছে ভিটে মাটি সবকিছু। যে নদীর শ্বাস নিয়ে নৌকার পাল প্রাণ পেয়েছে, যে নদীর মাতাল হাওয়ায় হাল ছেড়ে গান গেয়েছে মাঝি; আজ সে নদীর বাতাসে বিষ। সে বাতাসে যেন ক্রন্দনের আহাজারি। দেশ ঠেকাবে নাকি নদী? নদীর এদিকটায় বাঁধ দিলে গতি প্রবাহ অন্য দিকে যাবে তখন রক্ষা পাবে গ্রামটি। নদীর অন্য পাড়ে চর। চরে কোন বসতি নেই।

ডাঃ বদরুল আমিন আর ফজল মাস্টারের বাড়ী এক পাড়া দূরে। দু'জন সমবয়সী। বাল্যকালে দু'জনের ভিতর বন্ধুত্ব ছিল। এখন বিভেদ নেই কিন্তু বিচ্ছেদ আছে। ফজল মাস্টার গ্রামের পাঠশালায় হাতে খড়ি নেয়, বদরুল আমিন যায় মৌলভীর কাছে– মক্তবে। পরে সে কওমী মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। ফজল মাস্টার গ্রামের হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। বদরুল আমিন লেখাপড়ার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চর্চা করে এখন ডাঃ বদরুল আমিন।

ফজরের নামায শেষে বদরুল আমিন কবরস্থানের এদিকটায় সরু পথ ধরে হেঁটে আসছিল। পথের পাশ থেকে নিম গাছের আঙ্গুল সরু ডাল ভেঙ্গে প্রথমে সে পাতাগুলো এক একটা সরায় পরে বিঘত খানিক নিয়ে মাথার দিকে একটু চামড়া ছিলে দাঁত মাজা শুরু করে। কিছু দূর হেঁটে আসে। ওয়াক থু... ওয়াক থু... করে সে দাঁত মাজার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার দু'পাশে থু থু ফেলায়। পথের ওপ্রান্তে ফজল মাস্টার এদিকে আসছিল। দেখা হয়ে গেল দু'জনের।

–এত সকালে মাস্টার যাও কই? বদরুল আমিনের চোখের কোণে সন্দেহের বাণ।
–যাব আর কই? গাঙ্গের ভাঙ্গন দেখতে আসছি।
–দেশ ভাঙ্গতে বসছো মিয়া, আসছো গাঙ্গের ভাঙ্গন ঠেকাতে... বদরুল আমিন মুখ অন্য দিকে নিয়ে বিড় বিড় করে বলে।
–কিছু বললা নাকি?
–না বলতেছি, তোমরা নাকি মুক্তিবাহিনী গড়ার জন্য বৈঠকে বসছো?
এমন প্রশ্ন শুনে ফজল মাস্টারের রাগ শিকেয় চড়ে। নিজেকে সংবরণ করে সে বলে– 'মুক্তিবাহিনী গড়ার জন্য বৈঠকে বসলে ক্ষতি কি? তবে বসছি নদী রক্ষা বাহিনী গড়ার জন্য।' সে বদরুল আমিনের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে– 'নদীর অবস্থা দেখছো? ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কতদূর এসেছে? তোমার তালগাছওয়ালা জমিটাতো শেষ। এখন কবরস্থান ছুঁইছে। নদীটার একপাশে পেট ফুলে উঠেছে। বাঁধ দিয়ে গতি পরিবর্তন করার দরকার। নইলে কবরস্থান, ভিটেমাটি সব যাবে।' একটু থেমে সে আবার বলে– 'মুক্তিবাহিনী গড়ার জন্য বৈঠকে বসলে কি পাপ? দেশ রক্ষার জন্য যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারাইতো দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।'

ফজল মাস্টারের কাছে দেশ হলো পূর্ব পাকিস্তান আর বদরুল আমিনের কাছে দেশ হলো পাকিস্তান। কবরস্থানটি নদী গর্ভে বিলীন হতে চলেছে। ফজল মাস্টারের কাছে মনে হচ্ছে তার দেহের, তার কলিজার একাংশ ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে। কবরে ঘুমিয়ে তার মা, বাবা, আদরের বোনটি। মা, বাবা, বোনকে সে নদীর গহ্বরে চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিতে চায় না। অন্যদিকে ফজল মাস্টারের কাছে কবর নিছক কবরই। মৃত্যুর পর চল্লিশ কদম হেঁটে আসার পর শাস্তি শুরু হবে। ভাল কাজ করলে দীর্ঘ ঘুম শেষে হাশরের ময়দানে জেগে উঠবে। মন্দ কাজের ফল– কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে। যে সাপের এক নিঃশ্বাসে পৃথিবী ছারখার হয় সে সাপের পুনঃপুনঃ ছোবল খেতে হবে।

দু'জনের কারো মুখে কথা নেই। শান্ত সকাল। ডিমের আস্তর ভেদ করে স্নিগ্ধ কুসুমের মত সূর্য উঠেছে পূবে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ফজল মাস্টার বলে– 'বদি, শুনছি তুমি নাকি মিলিটারীর দলে ভিড়ছো? বৈঠকে নদীর বাঁধের কথা উঠেছে কিন্তু সকালের মনে ভয় বাঁধ দেওয়ার সময় মিলিটারী বাহিনী এদিকটায় আক্রমণ করে। মিলিটারী বাহিনী এদিকটায় এখনো আসেনি। কিন্তু তোমাকে নিয়ে সন্দেহ করছে। তুমি কয়েকজনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করছো। পাকিস্তান রক্ষা কমিটি।'

চোখে সুরমা দেওয়া বদরুল আমিনের চক্ষু দু'টি রাগে রক্তময় হয়ে ওঠে। কাঁচাপাকা দাড়ি কেঁপে ওঠে পুনঃপুনঃ। হাজী গামছাটি বুকের এপাশ থেকে ওপাশে সরিয়ে নেয়। 'সন্দেহের কি আছে? নদীতে বাঁধ দিলে বাঁধ দাও। তবে নদীর ভাঙ্গন রক্ষা করবা ঠিক আছে। দেশের ভাঙ্গনে...' বদরুল আমিন কথাটা শেষ না করে অন্য প্রসঙ্গে যায়–

'শুনছি গ্রামের কিছু তরুণ মুক্তিবাহিনী গঠন করতেছে। এটা মিলিটারীদের কানে গেছে। তাছাড়া শহর থেকে অনেক লোক এখানে জড়ো হয়েছে। মিলিটারী বাহিনী অনেক লোক জড়ো হোক এটা পছন্দ করে না। আগামী সপ্তাহে তারা এখানে প্রাইমারী স্কুলে সাব–ক্যাম্প বসাবে।'

ফজল মাস্টার এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বদরুল আমিনের হাত চেপে ধরে– 'পাকহানাদার বাহিনীরে তুমি ঠেকাও ভাই। এ গ্রামে তাদের আসতে দিয়ো না। তুমি বললে তারা আসবে না। আমাদেরকে নদীতে বাঁধ দিতে দাও। তারা আসলে বাঁধ দেওয়া হবে না। নদী ভিটেমাটি, কবরস্থান সবকিছু খেয়ে ফেলবে।'

বদরুল আমিন হাত ছাড়িয়ে বলে– 'ফজল, নদীর কাজ নদী করছে। ভাঙ্গা-গড়া ই তার খেলা। এ পাশে ভাঙ্গতেছে ওপাশে চরে বাড়ি বানাবা। কিন্তু দেশ ভাঙ্গলে আর কি জোড়া দিতে পারবা মিয়া?'

–ভিটের কথা না হয় বাদ দিলাম। কবরস্থানটি যে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তোমার কি এতটুকু দয়া-মায়া নেই বদি? এখানে তোমারও মা, বাবা শুয়ে আছে। দু'বছর আগে তুমি তোমার জোয়ান ভাইটাকে এই কবরে শুইয়েছো। তোমার কাছে এটা কবর। আমাদের কাছে এটা কোষ। দেহের এক একটা কোষ। চিন্তা করো, প্রিয়জন মারা গেলে কবরে শোয়ানোর কিছুদিন পর তার দেহ গলে পঁচে মাটি হয়ে যায়। সেই মাটিই আমাদের স্বদেশ। এই মাটিকে হারানো মানে প্রিয়জনকে হারানো।

এ মাটির সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের মাটির পার্থক্য আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে আমার প্রাণ নেই। এ মাটি ছুঁয়ে আমি আমার পূর্ব পুরুষের স্পর্শ পাই। এ মাটি ছুঁয়ে আমি আমার মায়ের আদর অনুভব করি। এ মাটিতে কান পাতলে আদরের বোনটি কথা বলে ওঠে। কবরস্থানটি তুমি নদী গর্ভে ভাঙ্গতে দিয়োনা ভাই।
বদরুল আমিন এ কথায় কোন কর্ণপাত করে না। কেবল ভাবলেশহীন নিষ্ঠুর চোখে চেয়ে থাকে কবরস্থানটির দিকে।
ফজল মাস্টার ক্ষোভের সাথে আফসোস করে বলে, বদি তুমি ঘোরের মধ্যে আছো। পাকিস্তান ঘোর। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের ঘোর। জানিনা তোমার ঘোর কাটবে কবে!

তিন.

পরিত্যক্ত একটি দোতলা বাড়ির সীমানা পরিষ্কার করে তাঁবু বসিয়েছে পাকহানাদার বাহিনী। দোতলার উপর তলায় পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তের কক্ষটিতে চেয়ারে বসে আছে মেজর নওশাদ। পাকানো গোঁফওয়ালা, ফর্সা, দীর্ঘদেহী যুবক। উচ্চতায় ছয় ফুটের উপরে। বুক টান টান করে বসে আছে। পাকিস্তানি মিলিটারীর খাঁকি পোশাক পরা তার বুকের নেমপ্লেটে ইংরেজীতে লেখা– মোহাম্মদ নওশাদ।

বারান্দায় দু'জন পাকসৈনিক অস্ত্র উঁচিয়ে হেঁটে হেঁটে পাহারা দিচ্ছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে আরো দু'জন সৈনিক। তারাও অস্ত্র হাতে। মেজর নওশাদের সাথে দেখা করতে আসলে তারা পরিচয় নিয়ে ভিতরে ঢোকায়। তারও আগে অনুমতিপত্র নিতে হয় তাঁবু থেকে। অনুমতিপত্র থাকলে সিঁড়ির সৈনিক একজন তাকে নিয়ে আসে মেজর সাহেবের পাশের কক্ষটিতে। এ কক্ষটিতে দু'টো চেয়ার টেবিল আছে। নতুন দর্শনার্থী আসলে এখানে বসানো হয়। চেয়ার-টেবিলের অপর প্রান্তে অন্ধকারময় স্থানটি টর্চার সেল। এখানে মেজর নিজ হাতে টর্চার করে মুক্তিবাহিনীদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করে। টর্চারের চিৎকারের মাঝে মাঝে গুলির শব্দও শোনা যায়। কেউ সত্য কথা না বললে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
জোরে চিৎকার হল– 'দেহের সব রক্ত ঝরালেও আমি তোদের কাছে মুক্তিবাহিনীর গোপন আস্তানার কথা বলব না।' আবারও আ... আ... চিৎকার।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ নয়; পাকিস্তান মুর্দাবাদ। শুয়োরের বাচ্চা তোদের...।'
হঠাৎ গুলির ঠাস করে শব্দ হল। জীর্ণ ভবনের দক্ষিণ পাশের বাগানে একটা বড় কড়ই গাছে বসা কয়েকটা কাক উড়ে গেল কা... কা... ডাকতে ডাকতে।

সিঁড়িতে প্রহরারত একজন সৈনিক দোতলার বারান্দায় এসে মেজর নওশাদের সামনে যেয়ে শব্দ করে স্যালুট দেয়।
–স্যার, রাজাকার বদরুল আমিন এসেছে। আপনার সাথে দেখা করতে চায়।
এইমাত্র খুন করে মেজর নওশাদ তখন মৃদু উত্তেজিত। কপালে কিঞ্চিৎ ঘামের রেখা ফুটে উঠেছে।
–রাজাকার বদরুল আমিন! সে আবার কে?
–স্যার, ডাঃ বদরুল আমিন। পাঁচজন জোয়ান ছেলে নিয়ে এসেছে।
হঠাৎ মেজরের মনে পড়ে– ও আচ্ছা ডাঃ বদরুল আমিন। তাকে ডাকো, জোয়ান ছেলেদের তাবুতে বসতে বলো।

ডাঃ বদরুল আমিন মেজরের টেবিলের অপর প্রান্তে জড়োসড়ো হয়ে বসে। সে কখনও মেজরের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। কথা বলার সময় নীচু হয়ে কথা বলে অথবা অন্যদিকে তাকিয়ে বলে। ভয়ে, শ্রদ্ধায়, নাকি লজ্জায় একথা বদরুল আমিনই জানে।

–কি ডাঃ সাহেব আমাদের জন্য নতুন কী খবর আছে?
ডাঃ সাহেব সম্বোধন করায় বদরুল আমিন গৌরব বোধ করছে। উত্তর দেয়ার উত্তেজনায় তার দু'কানের ধূসর লোম খাড়া হয়।
–স্যার, নদী রক্ষার নামে ওদিকটায় কয়েকটা মুক্তিবাহিনীর দল গড়ে উঠেছে। তারা বৈঠকেও বসেছে। আমার দলে মাত্র পাঁচ-সাত জন। এতগুলো লোকের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের সদয় সাহায্য দরকার, স্যার।

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে বদরুল আমিন চুপচাপ বসে থাকে।
টেবিলের উপর হাত চাপড়ে মেজর বলে– 'অবশ্যই সাহায্য করা হবে।'
হালে পানি পেয়ে বদরুল আমিন চারিদিকে একবার তাকিয়ে নেয়। তার পর বলে–'শুধু গ্রামের যুবকরাই নয়, শহর থেকে অনেক লোকজন আসছে। শোনা গেছে ওদের ভিতর থেকেও দল গঠন হচ্ছে।'
–লোকজন কারা? শহরবাসী?
–শিশু নারীই বেশি। সাথে যুবকরাও আসছে।
নারী আসার কথা শুনে মেজর নওশাদের চোখ চকচক করে ওঠে। গোঁফের নীচে প্রশান্তির হাসি হেসে বলে–'ডাঃ সাহেব বড্ড দেরী করে সংবাদ দিলে। অবশ্যই সেখানে ক্যাম্প বসানো হবে।'
পাকানো গোঁফে ডান হাতের আঙ্গুলের আলতো ছোঁয়া দিয়ে মেজর নওশাদ বলে–'তোমার দলের একজন যুবককে পাঠিয়ে দাও যাকে দিয়ে কাজ হবে।'
জিঃ স্যার, বলে পরম শ্রদ্ধার সাথে সালাম দিয়ে বদরুল আমিন মেজরের কক্ষ ত্যাগ করে। সে কক্ষের বাইরে বের হওয়ার পর চেয়ারটা ঘুরিয়ে মেজর জানালার হাতল শক্ত মুষ্টিতে চেপে ধরে বলে–'শালা বুড়া, পাকিস্তানের ঘোরে নাপাকিস্তানের কথা ভুলতে বসছে।

চার.

পৃথিবীটা একটা ঘোরের জায়গা। একেকজন এক এক ঘোরে আবদ্ধ। ঘরের জানালা দরজা আছে। দরজা দিয়ে বের হয়ে ঘরছাড়া হওয়া যায়। জানালা খুলে একটু পরশ মেলে দক্ষিণ হাওয়ার। কখনও কখনও মন মেঘ হয়ে যায়। মন মেঘ হয়ে ছুটে চলে গন্তব্যহীন। কিন্তু ঘরের মত ঘোরের কোন দরজা জানালা নেই। ঘোরে মানুষের কেটে যায় বেলা-অবেলা-কালবেলা। কখন সকাল গড়িয়ে দুপুর; দুপুরকে নির্জন প্রান্তরে সাপের ব্যাঙাচি গেলার মত গিলে নেয় কালরাত্রি। এসব ভাবার মানুষের অবকাশ নেই, সে নিরন্তর ঘোরে আবদ্ধ। সংসারের ঘোর, সুরের ঘোর, সংগ্রামের ঘোর, নেশার ঘোর, রূপের ঘোর, মোহের ঘোর, অর্থ–সম্পদের ঘোর, না পাওয়ার ঘোর, পাওয়ার ঘোর, পেয়ে হারানোর ঘোর, খ্যাতির ঘোর, কু-চিন্তার ঘোর, অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের ঘোর, ধ্বংসের ঘোর, সৃষ্টির ঘোর এ রকম হাজার রকম ঘোর ঘিরে আছে মানুষকে।

ডাঃ বদরুল আমিনকে পেয়েছে পাকিস্তান ঘোরে। পাকিস্তানের চাঁদতারা খচিত পতাকা তার কাছে বেহেশতের অলৌকিক নিশানের মত। যে নিশানের নীচে কোটি কোটি মানুষের জমায়েতের স্বপ্ন দেখে সে। উর্দু ভাষা তার কাছে নিছক উর্দিপরাদের ভাষা নয়। উর্দুভাষা যেন বেহেশতের গুলবাগিচায় বসা বুলবুলির মিষ্টি বোল। আহা পাকিস্তান, আহা আতর গন্ধের মৌ মৌ ঘ্রাণের পাকিস্তান; আহা আগর বাতির ধূম্রজালে ঘেরা অপার্থিব পাকিস্তান; আহা পৃথিবীর পাক–পবিত্র স্থান। ভূ-খন্ডটি মানসপটে ভেসে উঠলে বদরুল আমিনের চোখ দুটো শ্রদ্ধায় অবনত হয়। মাটিকে মাথায় তুললে পূজা হওয়ার ভয়ে পাকিস্তানের মাটিকে সে চোখে সুরমা করে মাখে।

ফজল মাস্টার জোর গলায় ডাকেন–'বদি, ও বদি, বাড়ীতে আছ নাকি?' ভিতর থেকে কোন সাড়া-শব্দ আসে না। তিনি আবার ডাকেন– 'বদি,ও বদি।'
জানালার ওপাশে এক মেয়ে কণ্ঠ মসৃণ স্বরে বলে– 'বাবা বাড়ীতে নেই। চাচা, আপনি কাছারী ঘরে বসুন। উনি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবেন।'
কোথায় গেছে এই প্রশ্নটি আর ফজল মাস্টার করতে পারলেন না। তার স্বর আটকে গেল। জমি চাষ করা, ধান কাটা, সালিশ করা, ডাক্তারি করার পাশাপাশি বদরুল আমিন যে এখন মিলিটারীর কাছেও যায়। যদি মিলিটারীর কাছে যায় মেয়েটি কি উত্তর দেবে?
ফজল মাস্টার কাছারী ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে বলে–'মা জেসমিন কাছারী ঘরটা খুলে দাও।'

জেসমিন ডাঃ বদরুল আমিনের একমাত্র সন্তান। দীর্ঘদিন সন্তান-সন্ততিহীন থাকায় তার দাম্পত্যজীবন একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। কবিরাজের ঝাড়ফুক, পানিপড়া খেতে খেতে স্ত্রীও একেবারে নিরাশ। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে তার মৌন সম্মতিও প্রকাশিত হচ্ছিল দিন দিন। এদিকে বদরুল আমিন আরেকটি নতুন জীবনের ঈষদুষ্ণ আনন্দে সন্তানহীন শূণ্যতা কিছুটা ভুলেছিল। এ রকম দোলাচলের ভিতর আলাহ্পাকের অশেষ রহমতে তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়। ফুটফুটে বাচ্চার নিষ্পাপ মুখ দেখে ডাঃ বদরুল আমিন আর ওপথে পা বাড়ায়নি। নিকট আত্মীয়রা সবাই বলাবলি করে–'এই তোমার ছেলে, এই তোমার মেয়ে। এ তোমার ঘর আলো করবে।'

সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটি আজ ষোলতে পা দিয়েছে। বিয়ের কথা হচ্ছিল। যুদ্ধের ডামাডোলের কারণে ডাঃ বদরুল আমিন বরপক্ষকে বলে একটু সময় নিয়েছে। দেশ শান্ত হলে মেয়েকে ঘটা করে বিয়ে দিতে চায় সে। চোখের মণি মেয়েকে হারাতে অব্যক্ত বেদনায় তার হৃদয় শূণ্যতায় ভরে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর ডাঃ বদরুল আমিন এলে ফজল মাস্টার জানতে চান, মিলিটারীরা এ গ্রামে সাব-ক্যাম্প বসাচ্ছে কিনা। সে বদরুল আমিনের হাত ধরে অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল। এখন পাকা কথা শুনতে চায়। ইতোমধ্যে নদীর পাড় রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ, কাঠ, বেত, দড়ি, ঝুঁড়ি, কোঁদাল ইত্যাদি সহ লোকজনও যোগাড় করা হয়েছে। টানা তিনদিন বিরতিহীন কাজ করতে হবে। আধা কাজ করলে কোন ফল হবে না। একসাথে ধরে কাজ উঠাতে হবে।

এই আয়োজনে প্রথম দিন থেকেই বদরুল আমিনের কোন সায় ছিল না। তারও ভিটেমাটি, ফসলি জমি নদী গর্ভে যাচ্ছে। ভিটেমাটি, ফসলি জমি, কবরস্থানের চেয়ে দেশ রক্ষাই তার এখন প্রধান কাজ।

ফজল মাস্টারের প্রশ্নের উত্তর সে দেয় না। নীরব থাকে। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। তার মানে ফজল মাস্টার বুঝতে পারেন যে, মিলিটারীরা খুব শীঘ্রই এ গ্রামে আসছে। রাগে-ক্ষোভে-তিক্ততায় তার অন্তরাত্মা ফুঁসে ওঠে। মনে মনে ভাবে, ভিটেমাটি যায় যাক আগে শায়েস্তা করা দরকার এসব মগজ ধোলাই রাজাকারদের। তার হাতের মুষ্টি শক্ত হয়। শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় দ্বিগুণ। চোয়াল শক্ত হয়ে ঘামতে শুরু করে। মনে হয় এক্ষুণি হুংকার দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে বদরুল আমিনের উপর। অনেক ধৈর্যের সাথে নিজেকে শান্ত করে সে বলে– 'বদি, তুমি আমার বাল্যকালের বন্ধু। একসাথে খেলেছি, ঘুরেছি কত সময় কাটিয়েছি। তুমি এমন ছিলে না। মনে আছে, সেই চল্লিশ বছর আগের কথা...। দু'জনে একসাথে নদী পার হয়ে পাশের গ্রামে গেছি। শতবর্ষী বটতলার নীচে পহেলা বৈশাখের মেলাতে। চার আনার বাতাসা কিনে খেয়ে ফূর্তি করে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরেছি। হিন্দু পাড়ায় শারদীয় উৎসবের প্রথম ঢোল-তবলা বাজনা বাজা শুরু হলে আমরা সারি বেঁধে রাস্তায় নেমে আসতাম উদম গায়ে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনই মানুষের ধর্ম। কিন্তু তোমার পরিবর্তন মেনে নেওয়া যায় না। তোমার মনে মক্কা-মদিনাই শুধু আছে মানুষের সেখানে স্থান নেই। মানুষ ছাড়া মক্কা-মদিনা সে তো মক্কা-মদিনাকেই হেয় করার শামিল।' এই কথাগুলো শোনার সময় বদরুল আমিনের ভাবলেশহীন চোখ দুটো পাথরের মত স্থির হয়ে থাকে। ফজল মাস্টার কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু করেন– 'এর সাথে যুক্ত হয়েছে তোমার পাকিস্তান প্রীতি। প্রীতি খারাপ জিনিস না। কিন্তু তুমি আছ ঘোরের মধ্যে। ঘোর কেটে গেলে তবেই বুঝবা নিজেকে, পরিবার পরিজনকে, দেশকে কতটুকু ঠকিয়েছো। শুধু ঠকানো নয়, কতটুকু নীচে নামিয়েছো।'
হায়রে বাঁদরনাচন খেলার দর্শক। ডুগডুগির তালে তালে বাঁদরনাচনের সাথে তোমারও যে বৃত্তাবদ্ধ ঘোরের বেলা কেটে যাচ্ছে খেলা শেষ হলে তবেই বুঝবা কতটা বেলা হারিয়েছ।

কাছারীঘর থেকে চলে যাওয়ার সময় ফজল মাস্টার তার বাল্যকালের বন্ধু ডাঃ বদরুল আমিনকে শাসিয়ে যায়–'শোনা যাচ্ছে তোমার চেলারা বড্ড উৎপাত শুরু করেছে। কারোর জান-মালের ক্ষতি করলে আমরাও ছেড়ে কথা কব না। যারা এ দেশের মাটি চায় না, এদেশের মাটিতে থাকার অধিকার তাদের নেই।'
ফজল মাস্টারের চলে যাবার পর কেবল বাকহীন, নিশ্চুপ বদরুল আমিন শব্দ করে কাছারীঘরের দরজা আটকিয়ে দেয়।

পাঁচ.

প্রায় দু'সপ্তাহ হল পাকহানাদার বাহিনী গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে সাব-ক্যাম্প বসিয়েছে। স্কুলটি নদী থেকে মোটামুটি দূরে। লম্বা সারির টিনের চালার ইটের তৈরি স্কুলটির প্রাঙ্গণের পাশে পুরাতন টিনের একটি জীর্ণঘর। মিলিটারী বাহিনীর সঙ্গে অন্তরঙ্গের কারণে এই জীর্ণ ঘরটিতে বিশেষভাবে আশ্রয় পেয়েছে বদরুল আমিনের পরিবার। গ্রামের অন্যরা যাদের ভিটেমাটি নদীর কাছে ছিল, অধিকাংশ পরিবারই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গেছে। কেউ নদীর ভাঙ্গনে সর্বহারা হয়ে অন্যত্র গেছে। কেউ পালিয়ে গেছে মিলিটারীর ভয়ে।

নদীর ভাঙ্গা রক্ষার জন্য গতি পরিবর্তনের যে চেষ্টা, মিলিটারী বাহিনীর আক্রমণের মুখে তা আর হয়ে উঠেনি। মিলিটারী বাহিনী এ গ্রামে আসার আগেই বদরুল আমিনের সাঙ্গপাঙ্গরা মুক্তিবাহিনীর বাড়ী লুট করে। মালোপাড়ার কয়েকটি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। পাকবাহিনীর মেজরদের লালসা পূরণ করার জন্য তারা গ্রাম থেকে যুবতীদের ধরে নিয়ে যায়। নৃশংস যৌনক্ষুধা মিটিয়ে তাদের কাউকে কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

মেজর নওশাদের নারী লিপ্সার কারণে গ্রামে কোন যুবতী মেয়ে, বউয়ের বাস থাকে না। প্রতি রাতে একেকটা মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা তার রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে।

শহর থেকে যারা এসেছিল তারাও সরে গেছে। ফজল মাস্টারসহ অন্যরা পাশের তিন গ্রাম পরে যেয়ে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কবরস্থান, বাঁশঝাড়, ভিটেমাটি সব গেছে নদীগর্ভে। এখন আর হারাবার ভয় নেই। যা হারাবার তা হারিয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হলে স্বজন হারানোর বেদনা, ভিটে হারানোর বেদনা কিছুই থাকবে না।

আষাঢ়ের মেঘে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই যেন সন্ধ্যা নেমেছে। কালসন্ধ্যা। মাঠের ভিতর উঁচু নারকেল গাছটিতে জমাট অন্ধকার জানিয়ে দিচ্ছে আজ খুব বর্ষণ হবে। চারিদিকে ধু-ধু প্রান্তর। কোন লোকজন নেই। জনবসতি, জনপদ পড়ে আছে শূণ্য। বাতাসে কেবল বারুদের গন্ধ আর ভাঙ্গনের শব্দ। নদী ভাঙ্গনের পর অবশিষ্ট ফসলি জমিতে কোন ফসল নেই, পড়ে আছে খড়ের প্রান্তর। একটি দু'টি সাদা বকের দেখা মিলত আগে এখন চারিদিকে শকুনের আনাগোনা। রক্ত পিপাসু শকুনের পদচারণায় কেঁপে ওঠে সময়ের সাক্ষী পেন্ডুলামটি।

রাত্রি গাঢ় হওয়ার আগেই অসময়ে রাত্রি নেমেছে। সাথে জানালার ওপাশে বড় বড় কচুর পাতার উপর বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ মনে পুলক সৃষ্টি করে। হালকা ঠান্ডা পড়েছে। এতটুকু ঠাণ্ডায় মেজর নওশাদ কাশ্মীরি সোয়েটারটি গায়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। একটু গরম কফি আর সাথে একটা সিগারেট হলেই এ ঠাণ্ডা কেটে যাবে। গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে উত্তুরে হিম ঠাণ্ডায় তার লোমকূপের শিহরণ অনুভব করে। অর্ধেকটা কফি রেখে দিয়েই সে সিগারেট ধরায়। সিগারেটটি ভেজা দু'টি ঠোঁটে চেপে ধরে দীর্ঘটানে সে পেতে চায় কিছুটা উষ্ণতা। মনে মনে সে ভাবে–রাত্রি যখন হয়েছেই আর রাত্রির অপেক্ষা করে লাভ নেই। যুবতীর খোঁজে সৈনিকের মাধ্যমে খবর পাঠায় বদরুল আমিনের কাছে।

বদরুল আমিন স্বীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য সাহায্য নেয় বিশ্বস্ত চেলা মকবুলের। মকবুল এ ব্যাপারে পারঙ্গম। ধরে নিয়ে আসতে বললে সে বেঁধে নিয়ে আসে। যুবতীদের চিৎকার, চেঁচামেচি, আহাজারি তার ভাল লাগে। যুবতীরা যখন আব্রু ভুলে তার দু'পায়ে লুটায়ে পড়ে; প্রাণের সম্ভ্রমের আশায় কাকুতি মিনতি করে মকবুল শক্ত মুষ্টিতে তাদের চুলের গোছা ধরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। চূড়ান্তভাবে সিংহের মুখে হস্তান্তর করার আগে মানুষরূপী শেয়াল মকবুল শুকে নেয় মাংসের ঘ্রাণ।

মেজর নওশাদের মনে মাতাল হাওয়া বইছে। মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। বিলাতি মদের একটি বড় বোতল টেবিলের উপর রেখে এক পেগ, দু' পেগ, তিন পেগ, চার পেগ শেষ...। জ্বলন্ত সিগারেটের মত তার সমস্ত শরীরটা জ্বলে উঠছে পুনঃ পুনঃ। বাইরে বৃষ্টির সাথে প্রচন্ড বজ্রঝড়। মাঝে মাঝে জানালার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়। মেজর নওশাদ আর স্থির থাকতে পারে না। নিজের ভিতর বুনো শুয়োরটা জেগে উঠেছে। লোকালয়ে আসা বন্য হাতির মত সে ছট ফট করে।
–সেন্ট্রি, এদিকে আস, বদরুল আমিনকে খবর পাঠাও।
–স্যার, বদরুল আমিনকে খবর পাঠিয়েছি, সে বাড়িতে নেই, কোথায় যেন গেছে।

–বদরুল আমিন নেই? ঐ রাজাকার জোয়ান ছেলেটা... কী যেন নাম। মাক...
–স্যার, মকবুল।
–হ্যাঁ, মকবুলকে পাঠাও।

মকবুলের কাছে খবরটি আগেই পৌছেছে। মেজর নওশাদের মেয়ে দরকার। বদরুল আমিনের দেখা না পেয়ে বার্তাবাহক মকবুলের কাছে সংবাদটি পৌছে দিয়েছে।
মকবুল আজ খুব চিন্তিত। কারণ যুবতী মেয়ে তো দূরের কথা পাকহানাদার বাহিনী আর রাজাকারদের কবল থেকে বাঁচার জন্য একটি নারীও বোধ হয় এখানে আর নেই। এখন মেয়ে পাবে কোথায়? মনে মনে তার মেজর নওশাদের প্রতি ধিক্কার হলো– 'শালা, যুদ্ধ করতে আসেনি যেন এসেছে রঙ্গ করতে।'
দ্রুত গতিতে আরো দু'জন সৈনিক আসে মকবুলের কাছে। এক্ষুণি চল, মেজর সাহেব ডেকেছেন, তোমার নিস্তার নেই।

মকবুল ভয়ে ভয়ে সৈনিক দু'জনের সাথে চলে এল ক্যাম্পে। ওর হাত পা কাঁপছে। অন্ধকারের ভিতরেও সে চোখে দেখছে ঘোর অন্ধকার। এখন উপায় কি? মেজর সাহেব যেভাবে বুনো শুয়োরের মত মাতাল হয়ে আছে ওর সামনে খাদ্য দিতে না পারলে মকবুলকে গুলি করে মেরে ফেলবে। কী বলবে সে মেজর সাহেবের সামনে যেয়ে? ওর বাক রুদ্ধ হয়ে আছে। অবশ পা কোন রকম চলছে যেন এক একটা সিঁড়ি ভেঙ্গে মৃত্যুকূপের দিকে। হঠাৎ তার মনে আসে যুবতী মেয়ে তো আছে। হ্যাঁ, সম্ভবতঃ একজনই অবশিষ্ট আছে। বদরুল আমিনের মেয়ে জেসমিন। টগবগে ষোড়শী যুবতী। তারাও তো থাকে এই চৌহদ্দিতে। বেশি দূরে যেতে হবে না। শিকারকে শিকারীর সামনে এভাবে ফেলা ছাড়া মকবুলের পালানোর আর কোন উপায় নেই।

মকবুল ভয়ে ভয়ে মেজর সাহেবের সামনে বদরুল আমিনের একমাত্র কন্যা জেসমিনের কথা বলে। মেজরের আর তর সইছে না। স্টুপিড, বলে মকবুলকে গালাগালি দিয়ে বলে–'রূপের বর্ণনা আমার কাছে দিয়ে কি লাভ? কাউকে বিবি বানানোর জন্য আমি এখানে বাসর সাজিয়ে বসে নেই। আমি যুবতী চাই। আমি ফূর্তি চাই। বাতি নিভালে সব রূপই অন্ধকার রূপ। আমার দরকার ফূর্তি।' কথাগুলো সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মাতাল কণ্ঠে বলে।

–'যাও এক্ষুণি, দু'জন সৈনিককে নিয়ে ধরে নিয়ে আস যুবতীকে। হোক সে বদরুল আমিনের মেয়ে। আমার দরকার ফূর্তি।' ধপাস করে গদিওয়ালা পালং এর উপর বসে পড়ে মেজর নওশাদ। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে সে বলে– 'বদরুল আমিন যে ধর্মের চোখে আমাদেরকে দেখে আমরা তাকে সে ধর্মের চোখে দেখি না। আমাদের দরকার জাগতিক সুখ-সম্ভোগ। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই; এই কথার ভিত্তি নাই; শোষণ করে সুখ চাই। হা...হা...হা...করে উচ্চস্বরে হাসিতে ফেটে পড়ে সে।

সে রাতে বদরুল আমিনের একমাত্র আদুরে কন্যা জেসমিনকে জোর করে তুলে এনে রাজাকার মকবুল আর পাকিস্তানি সৈনিক দু'জন রেখে যায় হিংস্র নরপশু মেজর নওশাদের কাছে। পরদিন জেসমিনের ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে থাকে ক্যাম্প সংলগ্ন পুকুরপাড়ের ঝোপের আড়ালে।
মেয়েটিকে সারারাত ধর্ষণ করে মেজর নওশাদ। ভোরের দিকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মেয়েটি মারা যায়।

ছয়.

মেয়ে হারানোর শোকে এর দু'দিন পরে আত্মহত্যা করেন বদরুল আমিনের স্ত্রী। এ ঘটনার পরে বদরুল আমিন আর আসেনি পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে। এমন কি এ গ্রামেও তার দেখা পাওয়া যায়নি। কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়েছে কে জানে।

ঘটনাটি রটে যায় সবার কানে কানে। ফজল মাস্টারের কানে সংবাদটি পৌঁছালে নিষ্পাপ মেয়েটি আর বাল্যকালের বন্ধুর স্ত্রীর জন্য তার চোখ দিয়ে দু'ফোটা তপ্ত জল নিঃসৃত হয়। ধিক্কার জানায় বদরুল আমিনের উপর। আফসোস করে বলে–'হায়রে বেকুপ, এরপরও তোর ঘোর কেটেছে কী না কে জানে!'

লেখক
মোঃ বাবুল ইকবাল
সহকারী কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম

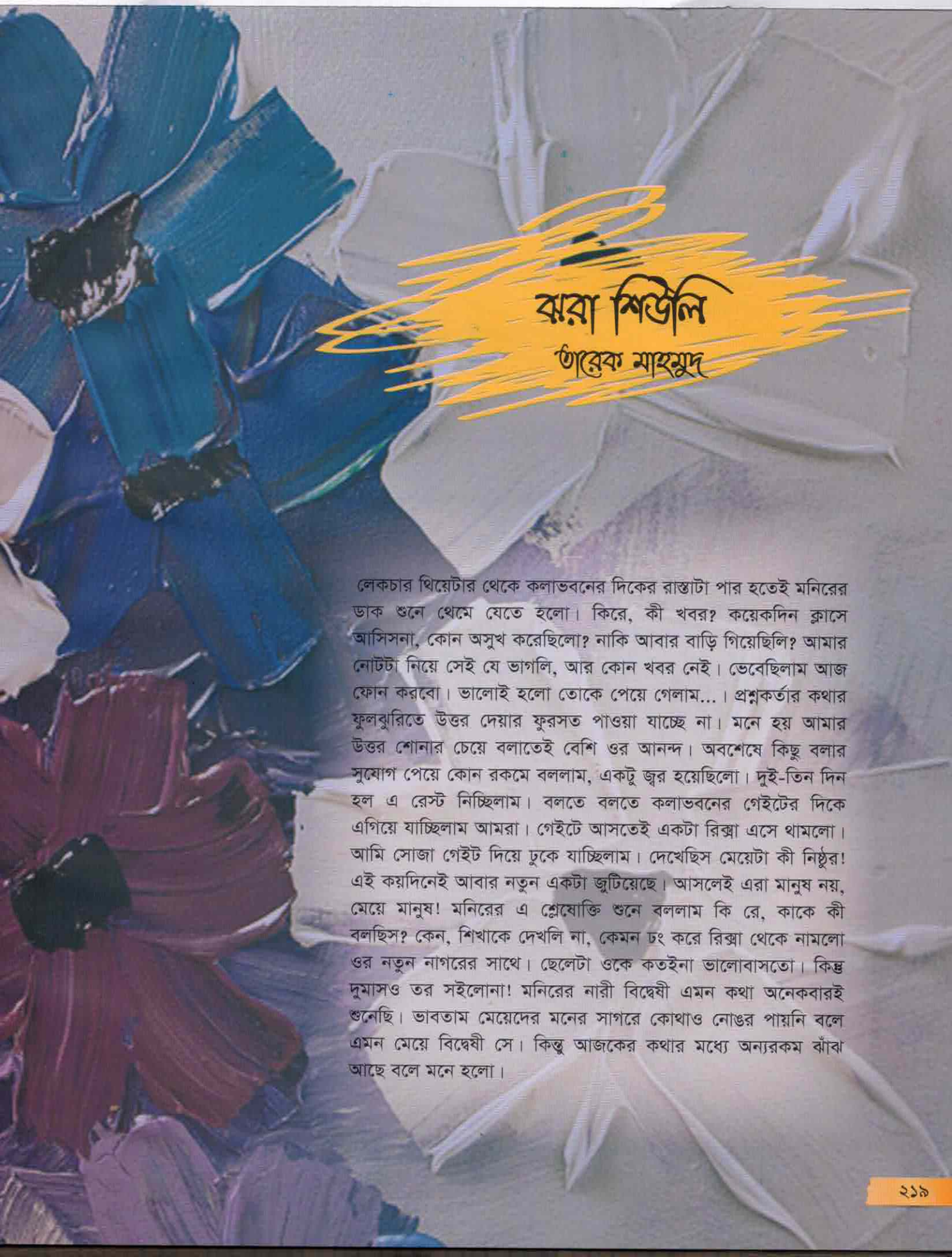

ঝরা শিউলি

তারেক মাহমুদ

লেকচার থিয়েটার থেকে কলাভবনের দিকের রাস্তাটা পার হতেই মনিরের ডাক শুনে থেমে যেতে হলো। কিরে, কী খবর? কয়েকদিন ক্লাসে আসিসনা, কোন অসুখ করেছিলো? নাকি আবার বাড়ি গিয়েছিলি? আমার নোটটা নিয়ে সেই যে ভাগলি, আর কোন খবর নেই। ভেবেছিলাম আজ ফোন করবো। ভালোই হলো তোকে পেয়ে গেলাম...। প্রশ্নকর্তার কথার ফুলঝুরিতে উত্তর দেয়ার ফুরসত পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় আমার উত্তর শোনার চেয়ে বলাতেই বেশি ওর আনন্দ। অবশেষে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে কোন রকমে বললাম, একটু জ্বর হয়েছিলো। দুই-তিন দিন হল এ রেস্ট নিচ্ছিলাম। বলতে বলতে কলাভবনের গেইটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। গেইটে আসতেই একটা রিক্সা এসে থামলো। আমি সোজা গেইট দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিলাম। দেখেছিস মেয়েটা কী নিষ্ঠুর! এই কয়দিনেই আবার নতুন একটা জুটিয়েছে। আসলেই এরা মানুষ নয়, মেয়ে মানুষ! মনিরের এ শ্লেষোক্তি শুনে বললাম কি রে, কাকে কী বলছিস? কেন, শিখাকে দেখলি না, কেমন ঢং করে রিক্সা থেকে নামলো ওর নতুন নাগরের সাথে। ছেলেটা ওকে কতইনা ভালোবাসতো। কিন্তু দুমাসও তর সইলোনা! মনিরের নারী বিদ্বেষী এমন কথা অনেকবারই শুনেছি। ভাবতাম মেয়েদের মনের সাগরে কোথাও নোঙর পায়নি বলে এমন মেয়ে বিদ্বেষী সে। কিন্তু আজকের কথার মধ্যে অন্যরকম ঝাঁঝ আছে বলে মনে হলো।

ওকে তেমন পাত্তা না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ততক্ষণে তিনতলায় পৌঁছে গেছি। ক্লাসে ঢুকতেই স্যার চলে এলো। বেঞ্চে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম শিখা ঢুকছে। শিখা প্রতিদিনের মতো আজও ক্লাসে ঢুকলো। কিন্তু ওকে এমুহূর্তে কেমন অসহ্য লাগছে। সেইসাথে মনের গহীনের অব্যক্ত বেদনার সুতোয় যেন টান পড়লো। মাথাটায় ভর করলো পুরানো স্মৃতি। আজ থেকে প্রায় আড়াই বছর আগে প্রথম যেদিন ক্লাস করতে আসি, খুব ভয় লাগছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাস ছিলো। স্যারেরাই বা কেমন হবে? ভয়ে ভয়ে তাই দু-তিন বেঞ্চ পরে বসলাম। পাশ ফিরে তাকাতেই একটি ছেলে সংকোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমি বকর। তুমি? প্রথম পরিচিত হলাম ক্লাসের কারো সাথে। তারপর আড়াই বছর, ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে বৈকি, কমেনি। প্রায়ই দেখতাম অভিন্ন শার্টজোড়া আর একজোড়া প্যান্টের অদল-বদল। আমি প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলতে পারতাম ও আগামীকাল কোন জোড়া পড়বে। খুব বেশি উচ্চাভিলাষীও হয়তো ছিলোনা সে। স্বপ্ন দেখতো বাবা-মা আর পরিবারের জন্য কিছু করার যেমন আমরা মধ্যবিত্তরা দেখি। একটাই দুর্বলতা ছিলো। কথা বলার সময় নাকের ব্যবহারাধিক্যে 'ঙ' আর 'ঞ' ময়তা। আমাকে প্রায়ই বলতো, আমি মানুষজনের সাথে ভালো করে কথা বলতে পারিনা, কী করি বলতো? আমি বলতাম সহজ ভাষায় একটু একটু করে চেষ্টা করো, হয়ে যাবে। নিয়মিত ক্লাস আর পড়াশোনায় ব্যস্ত থেকে প্রথম বেঞ্চ দখল করলো সে। আমি পিছাতে পিছাতে এমন অবস্থা, যদি দেয়ালটা না থাকত তবে তিনতলার কোণার রুমটা থেকে পড়েই যেতাম! যথারীতি আমার অমনোযোগিতাই একমাত্র কারণ। বেঞ্চের দূরত্ব বাড়লেও ঘনিষ্ঠতায় দূরত্ব বাড়েনি। প্রায়ই আমার খোঁজখবর নিতো সে। কিছুদিন পর ও হল-এ উঠলো। আমিও উঠলাম আমার হল-এ। পরীক্ষার আগে ওর হলে নোট আনতে গিয়ে ডিস্টার্ব করতাম ওকে। কখনোই বিরক্ত হতো না সে। মনে হয় যেন বিরক্ত না হওয়ার অপরিমিত ক্ষমতাই ওর ছিলো। পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। যথারীতি বেঞ্চের দূরত্বের মতোই রেজাল্টেও তেমন দূরত্বই বহাল থাকলো। ওর হয়তো আরো একটু ভালো করার কথা ছিলো। অল্পের জন্য প্রথম হতে পারেনি সে। রেজাল্ট ভালো হওয়ায় অনেকেই ওর পাশে ভীড় জমাতে শুরু করলো। একটু ঢাকাই পড়ে গেলাম আমি। এরই মধ্যে একদিন নীলক্ষেত মোড়ে হঠাৎ দেখি ওকে। আমাকে দেখে বললো, তোমাকে তো আর দেখিই না। অনেক দিন হল-এ আসো না। একটা মোবাইল কিনেছি। আমি আগ্রহ নিয়েই নম্বরটা নিলাম। বুঝতে কষ্ট হলো না যে তিন মাইল হাটা টিউশনির বেতনের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে এর পেছনে। হয়তো মাঝে মাঝে দু-এক বেলা না খেয়েও থাকতে হচ্ছে। কয়েকদিন পর গিয়েছিলাম ওর হল-এ এক কাজে। মনে হলো একবার দেখা করে যাই। ওর রুমে গেলাম। খুশি হয়ে ও বললো, আরে তুমি, অনেকদিন পর এদিকে, কী মনে করে? অনেকক্ষণ গল্প করলাম দুজনে। একটা অন্য রকম খবরও দিল সে। ক্লাসের অনেকেই নাকি ওকে ফোন করে।

এদের মধ্যে আবার দু-তিনটা মেয়ে আছে যারা দিনে দু-তিনবার পর্যন্ত ফোন দেয়। নিজে লাজুক প্রকৃতির বলে চিরদিনই মেয়েদের থেকে একশ গজ দূরে থেকেছি। তাই 'ঘ্রাণেণু অর্ধ ভোজনু 'র মতো জিজ্ঞেস করলাম কে কে রে? ও বললো, আছে, অনেকেই। পরে বলবো। কিছুদিন যেতেই শুনলাম, বকর নাকি শিখার সাথে প্রেম করছে। শুনে ভালোই লাগলো। ওদের ঈর্ষণীয় নিবিষ্টতা দেখে প্রায়ই বিস্মিত হতাম। দারুণ একটা জুটি হয়েছে। ভালোই যাচ্ছিলো দিন। ওদের ভালোবাসার প্রগাঢ়তা বেড়েই চলছিলো। আর ওরা হয়তো ভুলেই যেতে বসেছিলো যে গরমের আধিক্যে ঝড়ের আশঙ্কা ত্বরান্বিত হয়।

বাড়ি গিয়েছিলাম দুদিনের জন্য। দুদিন পর ক্লাসে এসে শুনলাম, বকর হাসপাতালে। গতরাতে ওদের হলে দু-পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছে সে। অবস্থাটাও নাকি সুবিধার নয়। বুঝলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। ক্লাস না করেই গেলাম হাসপাতালে। এখন পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি। মাথার আঘাতটা গুরুতর। আ.সি.ইউতে ভর্তির চেষ্টা চলছে। সবার মুখ থমথমে। তুমুল বর্ষণের আগে আকাশের প্রতিরূপ যেন। বারান্দায় দেখলাম শিখাকে। বর্ষার অবিরত ধারাপাত যেন শিখার দুটি চোখে নেমেছে। তীব্র বেদনায় মুষড়ে পড়ে পালালাম হাসপাতাল থেকে। পরেরদিন আর হাসপাতালমুখো হইনি। এর পরদিন ক্লাসে এসে শুনলাম বকর মারা গেছে। সবাই ছুটছে হাসপাতালে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। আই. সি. ইউ. তে সাদা ব্যান্ডেজে রক্তের লাল আভায় মোড়ানো মাথাটা। নিষ্পলক চোখের চাহনিতে নিথর দেহটা যেন বলতে চাইছে বন্ধু, বিদায়! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। সদাহাস্যোজ্জ্বল ছেলেটির ঠোঁট জোড়া দিয়ে আর হাসির আভা ফুটবে না। বিশ্বাস করতে কার মন চাইবে? বা হাতের কব্জিটা আপনিই চলে গেল চোখে। না! অশ্রু নয়, দুফোঁটা বিশুষ্ক অনল যা দাহ করে দিতে চায় সংঘাতকে, সংহারকে, মৃত্যুকে। ছুটে বেরিয়ে এলাম আই.সি.ইউ থেকে। শিখাকে দেখলাম রাতের ঝড়ে ডানাভাঙ্গা পাখির মতো ছিন্ন-ভিন্ন। রক্তাক্ত অন্তরের দহনজ্বালায় নিঃস্ব, রিক্ত; কিন্তু এ দীনতার কথা যেন প্রকাশ করতে চাচ্ছেনা সে। যেন কোন এক হালাকু খান ওর স্বপ্নবাজ মনটাকে দলিত-মোথিত করে পায়ে পিষে থেতলে দিয়েছে।

দুপুরের পর বকরের মৃতদেহ নিয়ে রওনা হলাম ওর গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। ঝাঁকুনিতে পড়ে যাবার আশঙ্কায় আমার হাতে শক্ত করে ধরা ছিলো ওর কফিন। জীবন্ত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের ভার বহন করাটা অনেক বেশি কষ্টকর-তা আমি সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম। যেন কফিন ভেদ করে ওর মায়াময় চাহনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আমি বকর, তুমি? স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আমি মানুষজনের সাথে ভালো করে কথা বলতে পারিনা, একটা মোবাইল কিনেছি। মনের পর্দায় স্মৃতির অবিরত কুঠারাঘাত বাড়ছিলো। রাত আটটার দিকে ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌছালাম, দেখি লোকারণ্য। পৌছামাত্রই কান্নার রোল উঠলো। যেন নিভু নিভু করে জ্বলা আগুনে কেরোসিন পড়লো। স্বজনের আহাজারিতে প্রকম্পিত বাতাস যেন দমকা হাওয়া হয়ে সপ্ত আকাশ ভেদ করে ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিতে চাইছে। ডালিম গাছের তলায় রাখা কফিনে একনজর চোখ বুলাতে হাজারো লোকের ভীড়। ভাবতেই অবাক লাগে, যে ছেলে ভালো করে কথা বলতে পারতোনা তার এতো সুহৃদ এলো কোথা থেকে। কবর খোঁড়ার কাজ শেষ পর্যায়ে। দ্রুতই জানাজা শেষ করে কবরে লাশ নামানো হচ্ছিলো। না! আমার দৃষ্টি লাশের দিকে নয়। যাদের দৃষ্টি লাশের দিকে তাদের দিকেই আমার দৃষ্টি। আমি যে প্রতিবেশের বকরকে চিনতাম সেটি মৃত। তখনকার যে প্রতিবেশ সে প্রতিবেশে আমি বকরকে চিনিনি। যারা চেনে তারা অসংখ্য লোকের আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লালাহু, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহুর মাঝে বাঁশঝাড়ের ফাঁকে কুপিবাতি হাতে বিশুষ্ক নয়নে তাকিয়ে আছে ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে যেখানে ঝরা পাতার মতো আরো একটি ছিন্ন পাতা মাটির সাথে মিশে যাবে। যে চাহনি আগে বকরের কাছে প্রত্যাশা করতো দারিদ্রমুক্তি, সে চোখ দুটি হয়তো আজো আছে। তবে আজ হয়তো সে চাহনি প্রত্যাশা নয়, ছলছল চোখে ইউক্যালিপটাসের ঝরাপাতা ভেদ করে দেখতে চায় তাদের স্বপ্নের করুণ পরিণতিকে। হয়তো সে চোখ কোন মায়ের, কোন বোনের, ভাইয়ের বা প্রিয়তম পিতার অথবা অন্য কোন প্রিয়জনের কিংবা শিখার।

ক্লাস শেষ করে স্যার কখন চলে গেছে বুঝতেই পারিনি। মনিরের ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম- জীবন কি কারো জন্য থেমে থাকে রে? মনির বললো, কি যা তা বলছিস? কার জন্য কে থেমে থাকবে? আমি বললাম, কেউ না। এমনিই বললাম। মুখে এমনি বললেও অন্তরের উপলব্ধির বিকৃত চাহনি- জগতটা আসলেই বড় নিষ্ঠুর।

(ঢাবি ছাত্র আবু বকর নামের 'নিহত নক্ষত্র'র সাথে কতকটা বাস্তবতা আর কতকটা লেখকীয় সত্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট)

লেখক
তারেক মাহমুদ
সহকারী কমিশনার
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা
(পটুয়াখালী বিভাগ)

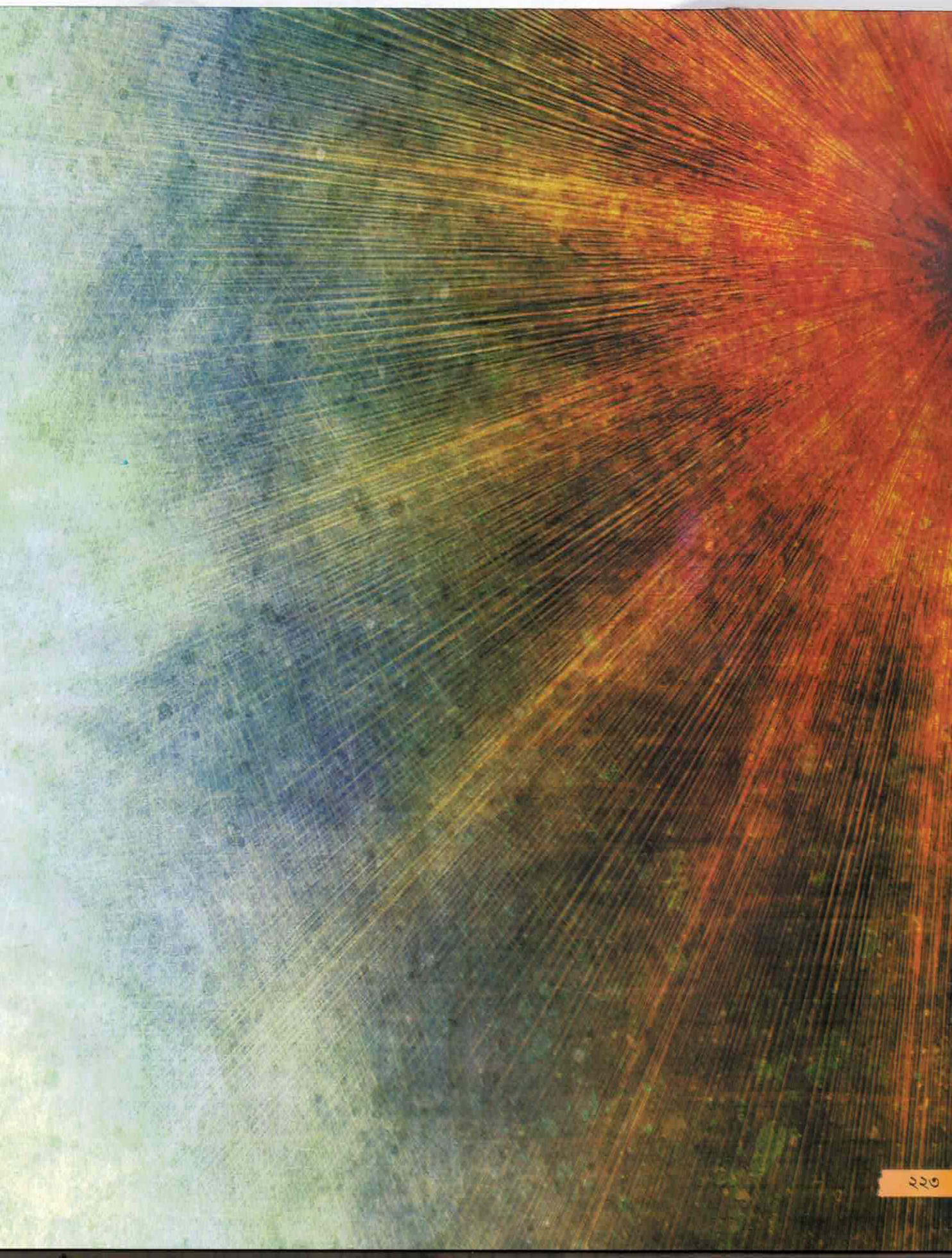

কাব্যকথা

যুগলবন্দী

ডঃ মারুফুল ইসলাম

তুমি সমর্পিতা সঙ্গীতে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথে
বিছানায় শুয়ে আছ চিত্রার্পিতা
সরোদ আর সেতারের যুগলবন্দী মূর্ছনায়
পটভূমিকার নীল আকাশ জুড়ে উড়ে যায়
সাদা সাদা মেঘের পায়রা

আজন্ম তৃষ্ণার্ত তুমি
জলাধার খুঁজে বেড়িয়েছ, পেয়েছো মরুভূমি
মরুদ্যানের হাতছানিতে ছুটে গেছে প্রাণান্ত
পিপাসার এক প্রান্ত থেকে আরেক উপান্তে
কিন্তু নীল জলের ইশারা তোমাকে
সুনীল বেদনা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি উপহার

আর দেখ, আমি এমনই এক খরস্রোতা নদী হয়ে
বয়ে এসেছি তোমার সমতলে
আমার প্রবাহে যদি কোনো বাধা আসে
তবে আমি নতুন বাঁক নিয়ে নতুন পথ
তৈরি করে নিতে পারি
এঁকে যেতে পারি সবুজের ক্যানভাসে
ভালবাসার রূপকথার রোদ-ঝলমল সোনালি নকশা
তুমি যাবে আমার সঙ্গে সাগরে?

কবি
ডঃ মারুফুল ইসলাম
কমিশনার
কাস্টম হাউজ, আই. সি. ডি

তুমি আগের মতই আছ

আব্দুল মান্নান শিকদার

কতকাল পরে দেখা হলো হিসাব করিনি
তুমি আগের চেয়ে আরও সুন্দর হয়েছ
তোমার চোখে আবেগ তাড়িত নন্দিত দৃষ্টি
বাচনভঙ্গী আর হাসি কাছে টানে আজও।

সেই কবে শেষ দেখা হয়েছিল মনে নেই
অনন্ত আকাশের মতন হৃদয়ের কথা
সাগর উত্তাল তরঙ্গের মত অভিব্যক্তি
পরম আবেশে কাছে টানতে যে মনে আছে।

সেদিন গোধূলী লগ্নে তুমি অপেক্ষায় ছিলে
কি কারণে দেরি হয়েছিল গন্তব্যে পৌঁছাতে
কি আস্থায় সুধালে আমায় ভাল আছতো?
কি বিশাল উচ্চতায় নিয়ে গেলে তোমাকে।

সুন্দর পৃথিবী কখন নিষ্ঠুর হয়ে যায়
কালের স্রোতে শুধু স্মৃতিগুলি বেঁচে থাকে
মনে পড়ে যেদিন তুমি ব্যাকুল হয়ে এলে
উল্টো পথে চলার কাহিনী শুনিয়ে গেলে।

নিয়তির তীর্যক তীরে পরাজিত হয়েছি
কিন্তু অনুভূতি আর মমতা কভু মরেনি
জানিনা কিভাবে কেটেছে তোমার দিনগুলি
ভাবছি তুমি ঠিকই আগের মতই আছ।

তোমার ছবি

আব্দুল মান্নান শিকদার

আজ প্রভাতে রবি বাড়িয়ে দু'হাত
যন্ত্রে যন্ত্রে আমায় করেছে আলিঙ্গন
অপেক্ষার তীব্র জ্বালার হয়েছে অবসান
অপার আনন্দে তাই দিশেহারা আজ।

কত রাত নিকষ কালো আঁধারে
নির্ঘুম কী যাতনায় এপাশ ওপাশ
বেদনায় ভিজে যায় কপোলের পাশ
রিক্ত বুক নিয়ে অবিরাম পথচলা।

সবখানে ঘুটঘুটে অন্ধকারের বাসা
কিন্তু তুমি উজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর
আমার কর্মে প্রেরণা আর শক্তির
যোগান দিতে ছবি হয়ে আস যেন।

কালো মেঘ আজ অস্তাচলগামী
দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে ঐ দিগন্তে
সহাস্যে তোমার আগমন ঘটেছে
যন্ত্রের ভেতর থেকে উষ্ণ সম্ভাষণ।

কবি
আব্দুল মান্নান শিকদার
কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম

ত্রিপত্র

মুনিরুস সালেহীন

ক. ছাতার ভেতর ছুরি

যখন গোলাপ নিয়ে আসলে, জানতাম তার ভেতর কিছু কাঁটা থাকবেই।
কাঁটার আঘাতে মূর্ছা যাবো এমনতো নই, সামলে নিলাম ঠিকই।
মাথার উপর খরার সূর্য, তুমি এলে ছাতা হাতে,
আমার চোখে দোলে অশ্বত্থের ছায়া, তোমার চোখটা কি ছিল পাখির নীড়?
মরুভূমির ভেতর এক টুকরো মরুদ্যান খোঁপায় বেঁধে তুমি এলে,
ভাবলাম বেঁচে যাবো, ভুলে যাবো আঘাতের ক্ষত, হয়ে উঠবো সবুজ শ্যামল।
হায় মরীচিকা, ছাতার ভেতর থেকে বেরোল শাণিত ছুরি!
আমার আগেই নিহত হলো আমার বিশ্বাস।
আস্থা রাখতে পারি এমন কেউই ছিল না চারপাশে,
শেষ পযন্ত তুমিও?

খ. নস্টালজিয়া

বলিরেখার মতো ক্রমশ বিস্তৃত রোদ
মুছে দেয় ফুলের গায়ের স্নিগ্ধ শিশির
শিশির-কোমলতা আর সুঘ্রাণ ঝরে গেলে খিঁচিয়ে ওঠা কাঁটারা কি
মনে করায় সুবর্ণ অতীত?
তারচে' ঢের ভাল এই মানবজীবন
ক্রমাগত ফিরে দেখা অতিক্রান্ত সমতল, চড়াই-উতরাই
চোখে দোলে আদিগন্ত সবুজ মায়া
কানে বাজে কুহক বাঁশি।

গ. পরিবর্তন

তুমি বলতে মেঘলা মানুষ তোমার ভাল লাগে না,
তোমার ভাল লাগে রৌদ্র পুরুষ, যার গায়ে জীবনান্দীয় রোদের ঘ্রাণ নয়, থাকে স্বেদের কড়া গন্ধ।
পাঞ্জাবীর পকেটে ক্রমশ অচল হয়ে ওঠা খুচরো পয়সার মত তোমার কথাগুলো এখনো ঝংকার তোলে
কিংবা নৈঃশব্দ ভাঙ্গে কুয়োর তলানীতে থাকা জলের উপর পড়া ঢিলের শব্দের মত।
আমার সামনে বসে তুমি একটু হাসলেই বকুল ফুলের মত তারা ফুটতো আমার বুকে,
তারারা এখন মাথা ব্যথার মত দপদপ করে জ্বলে।

কবি
ড. আহমেদ মুনিরুস সালেহীন
উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ
বিসিএস কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ, নবম ব্যাচ

নদী বাহিত

মুশফিকুর রহমান

ডানে বামে সামনে পেছনে কাছে দূরে তাকাই
ঘুরে-ফিরে একটা নদীর মুখোমুখি
হই আমি
পর পর একরাশ সূর্যপথে হেঁটে
এবং নির্ঘুমে-ঘুমের অঘোরে রাতে।
নদীটির যেন কোন শেষ নাই-শুরু নাই-স্থিতি নাই
এই হাতের কাছে তো পর মুহূর্তেই দৃষ্টির সীমানায়
রোজ দেখা হয়
ছুঁয়ে দিলে সরে যায়; আবার
ফিরে আসে হঠাৎ অযাচিত উচ্ছ্বাসে
একেকবার মুছে দিতে চাই মন থেকে
দেখতে চাই না আর তাকে
চোখ বুজে থাকি-পায়ের পাতায় নিবদ্ধ রাখি চোখ
পায়ের নিচেই এসে পড়ে-মনের ভেতরেও শেষে
নিঃশব্দে নদীটির রেখা
অসীমে অন্ধকার ফুঁড়ে একই নদীটির দেখা
আমি পাই রোজ
গোধূলী-মদির নদী সে; তবু কেমন অন্য রকম
সকালে-দুপুরে; নিত্য নতুন রূপে বিকেলে-রাতে...
বয়ে যেতে দেখি তাকে
ভেতর ও বাহিরে-আকাশে-মাটিতে

উপচে ওঠা ক্ষীণ ধার তার-গহন প্লাবন
দেখে যেতে হবে
জানি আমি-যত দিন দেহে আছে প্রাণ

কবি
মুশফিকুর রহমান
উপ-পরিচালক
সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

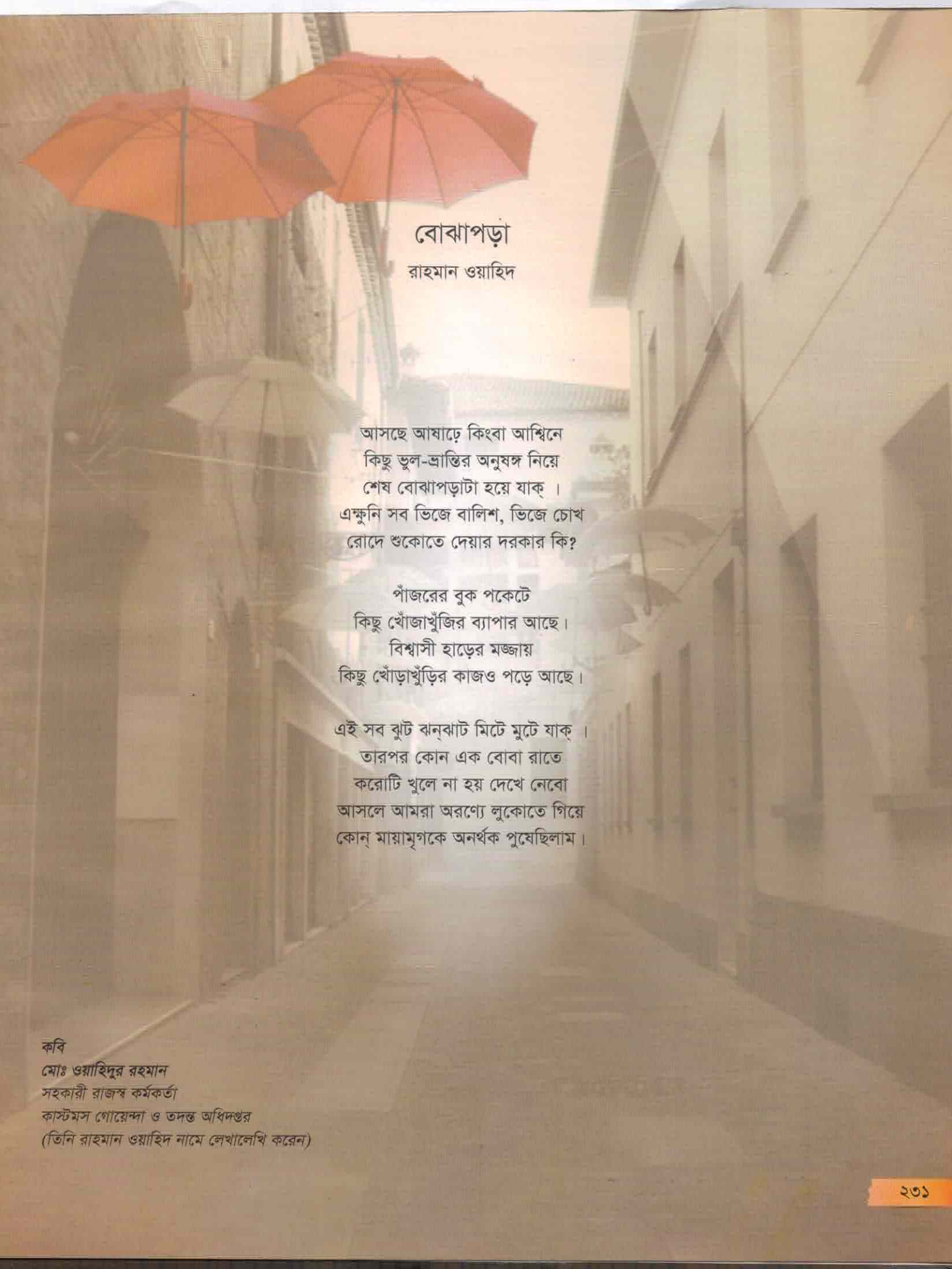

বোঝাপড়া

রাহমান ওয়াহিদ

আসছে আষাঢ়ে কিংবা আশ্বিনে
কিছু ভুল-ভ্রান্তির অনুষঙ্গ নিয়ে
শেষ বোঝাপড়াটা হয়ে যাক্ ।
এক্ষুনি সব ভিজে বালিশ, ভিজে চোখ
রোদে শুকোতে দেয়ার দরকার কি?

পাঁজরের বুক পকেটে
কিছু খোঁজাখুঁজির ব্যাপার আছে।
বিশ্বাসী হাড়ের মজ্জায়
কিছু খোঁড়াখুঁড়ির কাজও পড়ে আছে।

এই সব ঝুট ঝন্‌ঝাট মিটে মুটে যাক্ ।
তারপর কোন এক বোবা রাতে
করোটি খুলে না হয় দেখে নেবো
আসলে আমরা অরণ্যে লুকোতে গিয়ে
কোন্ মায়ামৃগকে অনর্থক পুষেছিলাম।

কবি
মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর
(তিনি রাহমান ওয়াহিদ নামে লেখালেখি করেন)

স্পষ্টতা

মোঃ ইয়ার মেহেদী খাঁন

এই আমি একা আমি
শত অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর,
অবহেলার ফ্রেমে গাঁথা জীবন আমার।
তোমরা জানো কি কেহ?

জীবনের সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে আছি,
কতো সত্য, মিথ্যা আর
স্পষ্ট জীবনের স্বাক্ষী হয়ে।

আমার চারপাশে বয়ে যায়, কতো চাওয়া পাওয়া
আমি ভুলেও দেখিনা তাদের,
একটু ছোয়াও চাইনা কোন সুখের।

সময়ের ফ্রেমে চাপা পড়া হিসাব নিকাশ আর
স্বার্থের দামে কোন কারো নগদ ভালোবাসায়,
বিশ্বাসী নই আমি।

আমি চাইনা কোন বেদনাক্লিষ্ট পরিচয়
যেখানে হবে, মিথ্যে ক্লান্তি আর,
আহাজারির সাথে প্রণয়।

আছে কি তোমার হৃদয়ে লুকানো, স্পষ্টভাষী মন
তবে জাগাও তাকে, বাড়াও দু-হাত,
করবো-নবজাগরণ।

একাকীত্ব আর জাগতিক নির্জনতার ভীড়ে
আমি চাইনা আর নিজেকে ডুবাতে।

ঘটাবো সমস্ত কুহেলিকার ইতি
গড়বো সুখের বাসর,
হবে কি তুমি আমার সাথী।

কবি
মোঃ ইয়ার মেহেদী খাঁন
সিপাহি
কাস্টমস গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর
আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর